বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চিন্তা ঃ
বাংলার সংগ্রহশালা

তারাপদ সাঁতরা



আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা
বাগনান, হাওড়া — ৭১১৩০৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৬ শে জানুয়ারি, ২০০২

প্রকাশক ঃ
আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা
বাগনান, হাওড়া — ৭১১৩০৩

প্রচ্ছদ ঃ
শ্যামল সেন

লেসার কম্পোজ ও অফসেট মুদ্রণ ঃ
সাহিত্যিকা
১৬১/২/১, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ৭০০ ০১৯

উৎসর্গ

পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা চেতনার পথিকৃৎ

অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ

ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার বসু

স্মরণে —

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১. হাওড়া জেলার লোক উৎসব (১৯৬২)
২. শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৯)
৩. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি (১৯৭৬)
৪. বাংলার দারু-ভাস্কর্য (১৯৮০)
৫. ছড়া-প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ (১৯৮১)
৬. মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র (১৯৮৩)
৭. পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ ঃ উত্তর মেদিনীপুর (১৯৮৭)
৮. মেদিনীপুর ঃ সংস্কৃতি ও মানব সমাজ (১৯৮৭)
৯. পুরাকীর্তি সমীক্ষা ঃ মেদিনীপুর (১৯৮৭)
১০. পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য ঃ মন্দির-মসজিদ (১৯৮৯)
১১. হাওড়া (২০০০)
১২. পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ (২০০০)
১৩. মাটির টানে (উপন্যাস) (২০০০)
১৪. কীর্তিবাস কলকাতা (২০০১)
১৫. ইতিহাসের রূপরেখা ঃ গ্রাম জনপদ (২০০১)
১৬. পথের মেয়ে (উপন্যাস) (২০০২)
১৭. কলকাতার মন্দির মসজিদ (২০০২)

নিবেদন

এই গ্রন্থ মধ্যে পরিবেশিত অধিকাংশ রচনাই একসময়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' ও 'সমকালীন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি বর্তমানে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে প্রকাশ করা হল। প্রকাশ থাকে যে, প্রবন্ধগুলি রচনার জন্য একসময়ে আমাকে বিভিন্ন স্থানের মিউজিয়াম সম্পর্কে নানান তথ্য ও আলোকচিত্র সরবরাহ করে তদানীন্তন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর ঋণ প্রথমেই স্বীকার করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম অধিকার-এর অধিকর্তা ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করায় তিনি একান্তই ধন্যবাদার্হ। বর্তমানে 'আনন্দ নিকেতন'-এর সম্পাদক শম্ভুনাথ ঘোষের উদ্যোগে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এছাড়া ডঃ অমূল্যকুমার চক্রবর্তী মহাশয় পুস্তকটি মুদ্রণে যত্নবান হয়ে যেভাবে সদা প্রসারিত বিবিধ সাহায্য করেছেন, সেজন্য তাঁর কাছেও গভীরভাবে ঋণী।

এ গ্রন্থে প্রকাশিত অধিকাংশ আলোকচিত্রই স্বর্গত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ডাঃ সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং এই সহায়তার জন্য একান্তই কৃতজ্ঞ। গ্রন্থ মধ্যে অধ্যায় শুরুর উপরিভাগে মুদ্রিত স্কেচগুলি এঁকে দিয়েছেন শ্রীগোপী দে সরকার এবং অনুক্রমণিকাটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন তপন কর, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পশ্চিমবাংলার এইসব আলোচ্য মিউজিয়াম সংগঠনে বাঙ্গালীর ভূমিকা এবং সেইসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও লোকশিল্পের নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার এই প্রচেষ্টা ছাড়াও, ভবিষ্যতে উৎসাহীরা যদি নিজ নিজ উদ্যোগে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন—কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি যদি সাধারণ পাঠকের আনুকূল্য লাভ করে তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

২৬.০১.২০০২ তারাপদ সাঁতরা

সূচী



অবতরণিকা

আদিতে গ্রীকদেবী 'মিউজ'দের বাসস্থল থেকে গ্রীক শব্দ 'মউসিয়ান'—যা ল্যাটিনে ভাবান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মিউজিয়াম' কথাটি। আমাদের দেশে মিউজিয়াম কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে 'যাদুঘর' কথাটির চলন হয়েছে। কেননা, একদা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে পশুপক্ষী বা জন্তু জানোয়ারদের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে উপযুক্ত সংরক্ষণপূর্বক সেটি জীবন্তভাবে প্রদর্শনের জন্য লোকে তার নামকরণ করেছিল 'যাদুঘর', অর্থাৎ 'ম্যাজিক হাউস'। কিন্তু মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার দিকে দৃষ্টি দিলে, মিউজিয়াম কথাটির প্রতিশব্দ কোন অর্থেই যে যাদুঘর হতে পারে না, তা সংস্কৃতি-বিজ্ঞানী মাত্রই স্বীকার করবেন।

এক্ষেত্রে 'মিউজিয়াম' কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় আমরা সংগ্রহশালা বা প্রদর্শশালা কথাটির প্রতিই বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে পারি। স্থানীয় গ্রামীণ সংগ্রহশালাগুলিও সেজন্য প্রয়োজনবোধে মিউজিয়ামের প্রতিশব্দ হিসাবে সংগ্রহশালা ছাড়াও ব্যবহার করেছেন প্রত্নশালা, বা চিত্রবীথী, বা চিত্রশালা বা পুরাকৃতি ভবন, অথবা মানবসমাজের কীর্তির রক্ষণ হিসাবে কীর্তিশালা প্রভৃতি।

কিন্তু নামে কিবা আসে যায়। পশ্চিমবাংলায় মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা স্থাপনের পিছনে অতীতে যে ভাবধারাটি সচল ছিল, তা হল পুরাসম্পদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। বঙ্গ

সংস্কৃতি ভাণ্ডারের বহুবিধ মূল্যবান সম্পদ যখন হেলায় বিনষ্ট হতে চলেছিল, ঠিক তখনই সেগুলি সংরক্ষণের জন্য যত্নবান হয়ে এবং উপযুক্ত অর্থসাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে বেশ কিছু আগ্রহী পুরুষ নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহশালার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাদের রকমারি সংগ্রহ বাঙ্গালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য কোন না কোন সময়ে যথেষ্ট কাজে লাগবে। তাঁদের এই মহৎ প্রয়াস উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত হবার যোগ্য। এইসব সংগঠক ও তাদের মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার কর্মোদ্যোগের কথাই আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

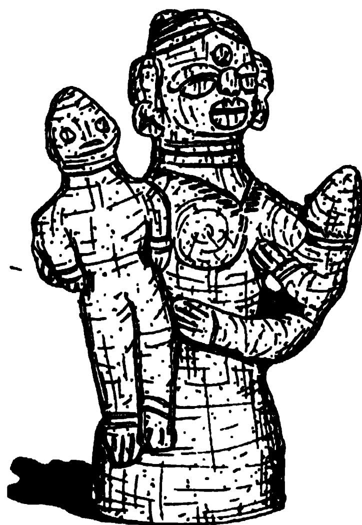
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ছাড়াও, বর্তমানকালে সে সব সংগৃহীত বস্তুগুলি সম্পর্কে সাধারণকে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করার উপায় হবে শ্রুতিদর্শনের মাধ্যমে তাদের মন ও মর্মে যাতে প্রবেশ করে তার দিকে লক্ষ রাখা। এর ফলে সংগ্রহশালাগুলি হয়ে উঠতে পারে চোখে দেখা এবং কানে শোনার মাধ্যমে জনশিক্ষার এক অন্যতম কেন্দ্র।

আমাদের দেশেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে এই ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে উঠবার সুযোগ বেশী। এ বিষয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা স্থানীয় পঞ্চায়েত সংগঠনগুলি এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে তাদের যথাসাধ্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করে দিতে পারেন। প্রয়োজনমত এই কাজের জন্য উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ দু'একটি ঘর ছেড়ে দিতে পারেন। সে সব ঘরের ভিতর থাকবে সংগৃহীত হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি, পুঁথির চিত্রিত পাটা, কাঠের মূর্তি বা পুতুল, মাটির পুতুল, চিত্রিত লক্ষ্মী সরা, নকশী কাঁথা বা পটচিত্র — এমনি যা গ্রামের বহু ব্যক্তির বাড়িতে আজও রাখা আছে বা গ্রামের নানাস্থানে হামেশাই পাওয়া যায়। আরম্ভের প্রথমদিকে কিছু কিছু সস্তায় তৈরি করা কাঠের তাকে এসব সংগ্রহ সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। দেওয়ালে সাজানো থাকবে পটচিত্র, সরা বা নকশী কাঁথা। আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কত উপকরণ, কত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের গ্রামীণ জীবনের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে, যা অতি সহজেই সেগুলির বিবরণ ও আলোকচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা যেতে পারে। আর সেগুলির তলায় থাকবে শক্ত কাগজের উপর লেখা পরিচয়লিপি। ঘরের বারান্দায় রাখা হবে যদি স্থানীয়ভাবে কোন পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য সংগ্রহ করা যায় সে সব মূর্তিগুলি। চেয়ার টেবিল পাওয়া না গেলেও ছোট তক্তাপোষ নিয়ে বসবে অফিস—সেখানে থাকবে কয়েকটি খাতাপত্র। তার মধ্যে একটি খাতায় থাকবে যে সব জিনিস সংগৃহীত হয়েছে তার প্রাপ্তিস্থান ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। গ্রামের সব দর্শনার্থী ও আগ্রহীদের ডেকে সংগৃহীত জিনিষগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাদের ভালভাবে জানিয়ে দিতে হবে সে সব জিনিসের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য। গ্রামের যে সব কারুশিল্পীরা আছেন তাদের তৈরি মাটির পাত্র, পুতুল বা পট প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিতে হবে। এছাড়া কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় পোকা-মাকড়, পশুপক্ষীর বিবরণ থাকবে দেওয়ালে টাঙানো, যাতে সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল হতে পারেন পরিবেশ সচেতনতা

সম্পর্কে। অন্যদিকে আশপাশে কোন ভাল গাইয়ে-বাজিয়ে থাকলে তাদের গান টেপ রেকর্ডারে তুলে রাখতে হবে, যাতে সবাই বসে এই সমস্ত স্থানীয় শিল্পীদের গান বা অন্যান্য মজলিশি গান শোনার সুযোগ পান। মাঝে মাঝে আগ্রহী মানুষদের বিশেষ করে গ্রামের কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমাজকে জড়ো করতে হবে তাদের অভিজ্ঞতা জানার জন্যে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে।

ভবিষ্যতে গ্রাম্য সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য যে সংক্ষিপ্ত পরিকাঠামোটি উল্লেখ করা হল, সেটিকে যথাযোগ্য রূপদানের জন্য কোন উৎসাহী ব্যক্তি, গ্রন্থাগার বা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যদি সচেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন, তবেই উদ্দীপ্ত হবে আপামর জনসাধারণের সংস্কৃতি চেতনা এবং জাগরিত হবে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে এবং সেগুলি সংরক্ষণের বিষয়ে গভীর মমত্ববোধ।





।।১।।

গুরুসদয় মিউজিয়াম

একদা দীনেশচন্দ্র সেন একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'বাংলার প্রকৃত গৌরব কী, তা দেখার চোখ তোমার আছে এবং উপলব্ধি করার মত মনও তোমার আছে। .... তুমি সত্যিই একজন জহুরী এবং যদি এই বাংলায় তোমার মত ডজন খানেক লোক থাকতো, তাহলে আমাদের বাংলার এই ভাবমূর্তি সেই সুজলা-সুফলার ভাগ্য ফিরে পেয়ে আবার আনন্দে হেসে উঠতো ....।'

এ চিঠি যাঁর উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল তিনি হলেন ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক এবং বঙ্গ-সংস্কৃতির হারানো গৌরব প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথপ্রদর্শক গুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস। তাঁর জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবহেলিত বাংলার গৌরব পুনরুদ্ধারের কাহিনী। তাঁর সেদিনের সেই বঙ্গসংস্কৃতির সংগ্রহ আজ বাঙ্গালীর একান্ত গৌরবের এবং একান্তই গর্বের। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত বাংলার লোকশিল্পের এইসব নিদর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছে গুরুসদয় মিউজিয়াম — যেখানে গেলে দেখা যাবে গ্রাম-জীবনের প্রবহমান সংস্কৃতি-ধারা, যা একদা বাঙালীর চিত্তকে প্রভূত পরিমাণে রসসিক্ত করে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছিল।

বঙ্গ-সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ছিলেন উচ্চপদমর্যাদায় আসীন সরকারী চাকুরে আই.সি.এস। উচ্চপদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত সরকারী চাকুরের জীবন কাটে একান্তই নামহীনভাবে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব প্রতিভা, উদ্যম ও দেশপ্রেম

থাকলে, তাঁর জীবনের আর এক প্রকাশ হয়, যা তাঁকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। এখানে গুরুসদয়ের জীবনে তাই ঘটেছিল। ১৯২৯ সালে বিলেতের রয়েল এলবার্ট হলে ইংলন্ডের লোকনৃত্য উৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাকালে তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয় তাঁর গ্রামের পুরোনো দিনের লোকনৃত্য উৎসবের কথা, পুতুল-খেলনা আর মেলা-পার্বণের সেই দিনগুলোর কথা, আর তার ঐতিহ্যময় প্রাণময়তার কথা। তিনি তখনই বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুকরণের মোহ ত্যাগ করে স্বদেশের লোকসংস্কৃতির এইসব অবহেলিত সম্পদগুলিকে পুনরুদ্ধার করার এবং তা যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করেন। তাই বিলেত থেকে দেশে ফিরেই ময়মনসিংহে তিনি লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সমিতি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্যে যখন তিনি যথার্থই মনোনিবেশ করেছেন, ঠিক তখনই তিনি বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হন। বীরভূমে থাকাকালীন ১৯৩১ সালে তিনি লোকশিল্পের সংগ্রহ ও উজ্জীবনের জন্য সেখানে 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি' নামে এক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করেন এবং সেইসঙ্গে তিনি বাংলার লুপ্ত লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের পুনরুজ্জীবনের কাজও শুরু করেন। এইভাবেই একদিন বাংলার গ্রামীণ লোকনৃত্যের নানান অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তিনি 'ব্রতচারী' আন্দোলনের প্রবর্তন করেন।

আর এই সঙ্গেই তিনি সংগ্রহ করতে শুরু করেন হাঁড়ি, সরা, পুতুল, পট, কাঁথা— এমনি সব তুচ্ছ জিনিস, যা এর আগে কেউ এমন করে দরদ দিয়ে সংগ্রহ করে তার মর্যাদা দেয় নি। উচ্চপদে আসীন থাকায় তিনি ঘরে বসে এইসব শিল্প সম্পদ অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। এইসব সংগ্রহের জন্যে তাঁকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এবং তারই ফলে বাংলার লোকশিল্পীদের একান্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও তাঁকে আসতে হয়েছে। আজও পশ্চিমবাংলার অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামের সেইসব প্রবীণ পটুয়া-চিত্রকররা যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁরা এই 'ম্যাজিস্টোর' সাহেবের কথা এবং তাঁর অন্যতম শিষ্য শ্রীসুধাংশু রায়ের কথা স্মরণ করে থাকেন। কৃতজ্ঞতা জানান তাঁদের সেদিনের সেই উদ্যোগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এইভাবেই তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলার লোকশিল্পের নিদর্শন তাঁর তখনকার বাসভবন ১২নং লাউডন স্ট্রিটে সংগৃহীত হয় এবং এরই সঙ্গে বাংলার এইসব মৃতপ্রায় শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্যে তিনি সচেষ্ট হন। শুধু অনুসন্ধান ও সংগ্রহই নয়, সে সময়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলার কাঁথা, পট, কাঠের কাজ ও লোকনৃত্য বিষয়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা আজ সংস্কৃতি সন্ধানীদের একান্তই মূল্যবান উপকরণ। এইভাবেই বাঙালীর মনকে গ্রামমুখী করার আন্দোলনে পল্লীবাংলার এইসব বিচিত্র সাংস্কৃতিক সম্পদের কথা তুলে ধরার যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তিনি ছিলেন অবিসংবাদীরূপে একজন পথিকৃৎ।

তারপর ১৯৩২ সাল নাগাদ তাঁর সংগৃহীত এইসব শিল্পসম্পদ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর সহযোগিতায় যে প্রদর্শনী হয়, তাতে বিদগ্ধ জনের মধ্যে খুবই সাড়া পড়ে। তাই ১৯৪০ সালে একটি লোকসংস্কৃতির বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারী গ্রামের পত্তন করেন। কিন্তু অত্যন্ত

দুর্ভাগ্যের কথা যে, তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ণের পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতির তত্ত্বাবধানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁরই সংগৃহীত বঙ্গ-সংস্কৃতির এইসব উপকরণ দিয়ে একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলার গভর্নর আর. জি. কেসী এবং পশ্চিমবাংলার গভর্নর ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুর আমলে লাটভবনে গুরুসদয়বাবুর সংগৃহীত এইসব উপকরণের কিছু কিছু অংশ নিয়ে দু'দুবার প্রদর্শনী হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর আগ্রহের সঞ্চার হয়। অবশেষে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রহশালা-গৃহের উদ্বোধন করেন তদানীন্তন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ১৯৬৩ সালে এই সংগ্রহশালা সাধারণের প্রদর্শনের জন্যে উন্মুক্ত হয়।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যে গুরুসদয়বাবুকে বলেছিলেন, তুমি সত্যিই একজন জহুরী — এবং একথা যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নয় তা উপলব্ধি করা যাবে, তাঁরই সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারের এই আলোচ্য সংগ্রহশালায় এলে। প্রায় দু'হাজার দ্রব্যের সংগ্রহ রয়েছে এই সংগ্রহশালায় — যা বাংলা ও বাঙালীকে চিনবার ও জানবার পক্ষেই যথেষ্ট। আড়াইশোর বেশি জড়ানো পট, চারশোর কিছু বেশি কালীঘাট ও বীরভূমের পট, দু'শোর মত নক্সী-কাঁথা, শ'দুইয়ের মত কাঠ খোদাইয়ের কাজ, পূর্ববঙ্গ থেকে সংগৃহীত মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত ফলক, যার সংখ্যা দুশোর বেশি আর তিনশোর মত খেলনা-পুতুল, শ'খানেক দশাবতার তাস, সমসংখ্যক অলংকৃত মৃৎপাত্র ও চন্দ্রপুলি আমসত্ত্বের ছাঁচ, চুয়াল্লিশটি পাল-সেন যুগের পাথরের মূর্তি, পনেরটি চিত্রিত পুঁথির পাটা এবং বেশ কিছু সংখ্যক চালচিত্র, দু'শোর মত ঘর-গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, পিতল কাঁসার বস্তু, বাদ্যযন্ত্র, শোলার পুতুল এবং পঞ্চাশটির মত প্রাচীন মৃৎশিল্পের নিদর্শন এই সংগ্রহশালার সম্পদ। একক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত গ্রাম-বাংলার প্রায় দু হাজার নিদর্শনের এই বিরাট লোকশিল্প সংগ্রহের মূল্যবান রত্নভাণ্ডারের কথা ভাবলে মনে হয় গুরুসদয় দত্ত সত্যই বঙ্গসংস্কৃতির একজন সার্থক জহুরী।

সুতরাং সেকালের গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে গেলে ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী গ্রামের এই গুরুসদয় মিউজিয়াম অতি অবশ্যই দেখতে হবে। কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এই সংগ্রহশালায় যেতে গেলে এস্‌প্লানেড্ থেকে ডায়মন্ডহারবারের বাসে বা হাওড়া থেকে ১২সি বাসে এবং শিয়ালদহ থেকে ৩এ বাসে আসতে হয়। স্টেট বাস টারমিনাসের কাছে নেমে দক্ষিণে খানিকটা এগিয়ে গেলেই ডানহাতি পড়বে ব্রতচারী গ্রাম এবং তার সংগ্রহশালা ভবন। বৃহস্পতিবার এই মিউজিয়ম বন্ধ থাকে। অন্যদিন একটা থেকে পাঁচটা এবং রবিবার দশটা থেকে একটা পর্যন্ত এই সংগ্রহশালা খোলা থাকে। সংগ্রহশালায় দর্শনী বাবদ মূল্য লাগে পঁচিশ পয়সা।

এ সংগ্রহশালায় প্রবেশ করা মাত্রই মন চলে যায় সেই প্রদর্শিত নক্সী কাঁথার রাজ্যে। আর সে কাঁথা তো শুধু একটুকরো ছেঁড়া কাপড়ের উপর সেলাই নয়। নারী সমাজের রূপকল্পনার এক বিস্তৃতি সেই আলপনার রাজ্য থেকে চলে এসেছে তার গৃহসজ্জার এই উপকরণ, কাঁথার মধ্যে। জীর্ণ শাড়ীর পাড়ের রঙ্গিন সুতোয় বোনা এই অসামান্য নক্সী-

কাঁথার ব্যবহার যে তার শয্যার আবরণে —তারই সব উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এইজন্যেই এইসব কাঁথার নামকরণ করা হয়েছে সুজনি-কাঁথা। আবার শীতের দিনে গায়ে দেবার জন্যে যে কাঁথা, তার নাম লেপকাঁথা। আর অপরূপ সব নক্সা তোলা হয়েছে সে সব কাঁথায়। সে নক্সায় আছে কাঁথার মধ্যিখানে শতদল পদ্ম, কল্কার বন্ধনী চতুর্দিকে তার; কখনও বা কলস বা শঙ্খের চিত্র সে সব বন্ধনীতে। তারপর কত মানুষ-জন, মেয়ে-পুরুষ, সাহেব-মেম, মাছ, হাতি, ঘোড়া, পাখি, ময়ূর, ফুল লতাপাতা, গাছ-গাছালি ও পালকির চিত্র, কখনও বা শুধু বঙ্গললনাদের গৃহশিল্প সামগ্রীর চিত্র, যাঁতি, কাজললতা, পিলসূজ, আয়না, চিরুনি, ছাতা এইসব — দেখে যেন শেষ করা যায় না। এরই মধ্যে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যশোরের একটি কাঁথার দিকে। এই সুজনি কাঁথাটিতে আছে অষ্টদল পদ্মের চতুর্দিকে লেখা কোন এক মানদাসুন্দরীর উৎসর্গলিপি, যাতে তার সূঁচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন ব্যক্ত হয়েছে। 'মমহস্তে প্রস্তুত' পিতাঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত এই কাঁথায় শিল্পী মানদাসুন্দরীর এই সূঁচের টানের রেখায় সেকালের ভক্তিনম্র সমাজজীবনের এক চিত্র সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে যেন ভেসে ওঠে। আগ্রহশীলদের জন্যে সে লিপির বয়ান তুলে দেওয়া হল, ঠিক যেমনটি আছে ঃ "এই সজনী জঙ্গল বাধাল নিবাসী শ্রীযুত বরদাকান্ত বসুর কন্যা আমি শ্রীমতি মনদাসুন্দরী দাস্যা মোমহস্তে প্রস্তুতপূর্বক শ্রীযুক্ত পীতাঠাকুর মহাশয়কে এই সজনী প্রণামপূর্বক দিলাম। সভ্যগণ মহাশয়েরা যে ত্রীটি হয় মাপ করিবেন।" বঙ্গললনাদের এককালীন সুগভীর স্নেহ ভালবাসার প্রতীক — এই কাঁথা রচনার জন্যে যে নিষ্ঠা ও শ্রম ব্যয় করা হয়েছে, তা দেখে সত্যিই শ্রদ্ধায় নুয়ে আসবে প্রতিটি বাঙ্গালীর মন।

সুজনি কাঁথা বা লেপ কাঁথা ছাড়াও পল্লীবালাদের কুশলী আঙ্গুলের জাদুস্পর্শে সামান্য দীর্ণ কাপড় ও সুতোয় যে অসামান্য কারুকৃতি গড়ে উঠেছিল তা হল, রুমাল কাঁথা—যার ব্যবহার ছিল রুমালের মতই; বেতন কাঁথা — যা চৌকো আকারে হত বাক্স-প্যাটরা ঢেকে রাখার জন্যে বা পুঁথি-পুস্তক মুড়ে রাখার জন্যে। আর আয়না-চিরুনি জড়িয়ে রাখার জন্যে আর্শীলতা কাঁথা, পান-সুপুরি এবং যাঁতি রাখার জন্যে নক্সী কাঁথার থলি যার নাম ছিল দুর্জনী এবং কাঁথার নক্সার বুননে তৈরি বালিশের ওয়াড়। বিভিন্ন ধরনের কাঁথার এইসব মূল্যবান সংগ্রহ দেখতে দেখতে মনে হবে, সমাজজীবনে নারীর এই রূপদৃষ্টির প্রতিফলন কাঁথার জগতে যা পরিদৃশ্যমান করে তোলা হয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন নারী সমাজের মধ্যে অজ্ঞাত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই লিখেছিলেন, *'বিচিত্র গুণে গুণশালিনী বঙ্গীয় কলা-লক্ষ্মীরা ছেঁড়া কাপড়ে, ছেঁড়া সুতোয়, জীর্ণ কাপড়ে তাঁদের লক্ষ টাকা মূল্যের প্রতিভাজাত সম্পদ কড়ার মূল্যে স্বজাতিকে বিলাইয়া দিয়াছেন।'*

নক্সী কাঁথার পর পট চিত্রের সংগ্রহ এই সংগ্রহশালার একটি অন্যতম আকর্ষণ। গত শতাব্দীর শেষ অবধি এবং বর্তমান শতকের প্রথম দিকে যে সব পটুয়া-চিত্রকররা তাঁদের আঁকা পটে যে শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন — সেই সব পট নিদর্শনের সংগ্রহ গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল। গ্রামে গ্রামে যে সব চিত্রকর- পটুয়ারা পট দেখিয়ে গান করে বেড়াতেন — সে সব জড়ানো পটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মনসা

পট, কমলেকামিনী পট, নরমেধযজ্ঞ, কৃষ্ণলীলা ও জগন্নাথ মাহাত্ম্য ইত্যাদি পট। এখানের সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত এইসব পটগুলি আমাদের সেই আবহমানকালের চিত্রধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জড়ানো পট ছাড়াও এই সংগ্রহশালায় উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ চক্ষুদান পট। আদিবাসী সমাজের কাছে এইসব চিত্রকররা পরিচিত ছিলেন 'পাটকিরি' বা 'যাদু পটুয়া' হিসেবে। এই সব পটুয়ারা কোন মৃত ব্যক্তির একটি ছবিতে শুধু তার চোখের তারাটি আঁকা বাকী রেখে তা ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে দেখাতেন চোখের অভাবে স্বর্গে তার কি কষ্ট হচ্ছে! উপযুক্ত দক্ষিণা পেলেই পটুয়ারা চোখের তারাটি এঁকে দিতেন। আদিবাসী সমাজের সৃষ্ট এই ধরনের চক্ষুদান পট এ সংগ্রহশালার যেমন এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ তেমনি সংগ্রহ হলো যমপট। গ্রামবাংলার আবহমানকালের শাশ্বত নীতিবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত যমপটগুলিতে থাকতো নরক যন্ত্রণার ভয়াবহ দৃশ্য এবং পুণ্যকাজের ফললাভ ইত্যাদি। এছাড়া মটরু চিত্রকর এবং অন্যান্য চিত্রকরের আঁকা বীরভূমের চৌকো পটও এই সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়েছে, যে পটে শিল্পীর তুলিতে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামবাংলার সমাজজীবন বাড়ী ঘর,উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান দৃশ্য। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পটের সংগ্রহ হলো, কালীঘাটের পট এবং কালীঘাটের বিভিন্ন ধরনের পটের এমন নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে — যা আর কোন সংগ্রহশালায় নেই। বাংলার লোকচিত্রের এইসব নিদর্শনগুলি অনুশীলন করে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাই একদা লিখেছিলেন, '... বাংলার সুদুর পল্লীতে পল্লীতে দীন-দরিদ্র গ্রাম্য পটুয়া শ্রেণীর মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষদের অঙ্কিত পটের যে কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহাতে বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়া শ্রেণীর চিত্রশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়।'

গুরুসদয় মিউজিয়ামে কাঠের কাজের যে সব অপূর্ব নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে — তা বাংলার সূত্রধর শিল্পীদের গৌরবময় সংস্কৃতি চিন্তারই পরিচায়ক। একদা চণ্ডীমণ্ডপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ও কাঠের মূর্তি নির্মাণে বাঙ্গালী সূত্রধর সমাজ সুনিপুণ সৃষ্টির যে সব নিদর্শন রেখে গিয়েছিলেন সেই সব কাঠের কাজের তক্ষণ শিল্প সম্পর্কে গুরুসদয়বাবু তিন প্রকারের উদাহরণ দিয়ে লিখেছিলেন যে, '(১) কার্নিসের ব্রাকেট বা শুঁড়োগুলিতে, (বেশির ভাগ ব্রাকেটগুলি হাতির শুঁড়ের পরিকল্পনায় নির্মিত বলিয়া এইগুলিকে সাধারণতঃ শুঁড়ো বলিয়া অভিহিত করা হয়।) (২) চালার বরগা ইত্যাদির উপর বোঠে নামক আলঙ্কারিক কাষ্ঠনির্মিত আকৃতিগুলিতে; এবং (৩) দরজার চৌকাঠের পাটায়, ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অনেকগুলি চমৎকার উদাহরণ আমি বীরভূম জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এইগুলিতে শিল্পকৌশল এত সুনিপুণ ও মনোমুগ্ধকর যে, পৃথিবীর কোন দেশের ভাস্কর্যের সঙ্গে নিপুণতার তুলনায় ইহাদের হার হইবে না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।'

চণ্ডীমণ্ডপের কাঠের ভাস্কর্য ছাড়া গুরুসদয় মিউজিয়ামের কাঠের কাজের সংগ্রহের মধ্যে দেখা যায়, মাতার সন্তান প্রসব, নন্দীভৃঙ্গীসহ হরপার্বতী মূর্তি, প্রসাধন পটিয়সী নারীমূর্তি, ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত মেমসাহেব প্রভৃতি কাঠখোদাইয়ের কাজের অপূর্ব নিদর্শন। এছাড়া নাপিতের দাড়িকামানো দৃশ্য বা বধূর পায়ে নাপিতানির আলতা পরানোর

দৃশ্যের এক কাঠের প্যানেল বিশেষ মুগ্ধতা এনে দেয়। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের মত কাঠখোদাইয়ের রিলিফ পদ্ধতিতে নির্মিত ফলক — রাইরাজা বা মহিষমর্দিনী এই সংগ্রহশালায় এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

এবারে দেখতে হয় সেকালের মিষ্টান্ন শিল্পের ছাঁচের নিদর্শন। পল্লী রমণীগণ অতিথিদের যে মিষ্টান্ন পরিবেশন করতেন এবং তার মধ্যে যে শিল্পচেতনার পরিচয় থাকতো তারই নিদর্শন এইসব সন্দেশ, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি এবং আমসত্ত্বের ছাঁচ। বর্গাকার, বরফি, ত্রিকোণ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত বা অর্ধচন্দ্র। এই ধরনের ছাঁচগুলির গায়ে যে সব নক্সা থাকতো তাতে লতাপাতার নক্সা তো ছিলই, এছাড়া ময়ূর, মাছ, পাখি, হাতি-ঘোড়া যুক্ত নক্সা এবং ব্রত আলপনার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এমন অনেক দুর্লভ ছাঁচ এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে আছে।

তারপর আছে বিভিন্ন জেলার নানান ধরনের পুতুলের সমারোহ। এই সঙ্গে শিকে, সরা, হাঁড়ি, কুলো, এয়োসরা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি — এ সবেরও নিদর্শন এতো আছে যে দেখে শেষ করা যায় না।

এছাড়া পাথরের বিভিন্ন দেব-দেবীর সাবেককালের মূর্তি ভাস্কর্য তো আছেই, তাছাড়া আর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল পূর্ববাংলা থেকে সংগৃহীত মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক — যা দেখে পূর্ববাংলার মন্দির-ভাস্কর্য সম্পর্কে একান্তভাবেই অবহিত হওয়া যায়। এই সঙ্গে আছে আর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ — যা হল সুপ্রাচীন যুগের কিছু মৃৎপাত্র, যাব অধিকাংশই গুরুসদয়বাবু সংগ্রহ করেছিলেন তমলুক থেকে। তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রন 'আর্টিবাস এশিয়া'তে বর্তমান তমলুক তথা প্রাচীন তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় পাত্রের আকৃতিগত সাদৃশ্য নিয়ে যে আলোড়নকারী প্রবন্ধ রচনা করেন — সেই সব সংগৃহীত মৃৎপাত্রের অধিকাংশ নিদর্শনই এই মিউজিয়ামে আছে।

গুরুসদয় মিউজিয়াম প্রকাশ করেছে একটি বহুবর্ণে চিত্রিত ফোল্ডার ও ছ'টি ছবি সহ একসেট পোস্টকার্ড।

বঙ্গ-সংস্কৃতির ভাণ্ডার আজ শুষ্ক বলে পরিশেষে আক্ষেপ করতে হয় এই সংগ্রহশালা থেকে ফেরার সময়ে। যে পারিপার্শ্বিক জগৎ সংসার থেকে রস আহরণ করে বাঙ্গালীর সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখবার মত আজ আর হয়ত কোন অবকাশ নেই — আর সে মনও নেই; তাই আজ স্বাভাবিকভাবেই এইসব শিল্পধারার অবসান সূচিত হয়েছে। কিন্তু গুরুসদয় মিউজিয়ামে এলে মনে হয় সেই পুরোনো বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা। গুরুসদয় দত্তের এই মহামূল্যবান সংগ্রহ আজ বাঙ্গালীর সেই অতীতের গৌরব-দর্পণ। এখানে এলে সত্যিই কিছুক্ষণের জন্যে সেই পুরোনো দিনের বাংলায় ফিরে গিয়ে বলতে হয়, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।' □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি লোকশিল্প বিষয়ক পুতুল।]



॥ ২ ॥

আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট

কলেজ স্ট্রিটে গোলদিঘির জলে বহুতল এক অট্টালিকার ছায়া পড়েছে। মৌচাকের মতই অসংখ্য খোপ খোপ সেই অট্টালিকার দেওয়াল; কর্মক্লান্ত অলির মধু সঞ্চয়ের মতই এই অট্টালিকার একধারে সঞ্চিত রয়েছে অগাধ ধন-রত্ন, মণিমাণিক্য — সেই রূপকথায় শোনা গল্পের মতই। কিন্তু এ মণিমাণিক্য সেই রাক্ষসদের অধিকারে তালাবন্ধ ঘরের অন্ধকার কুঠুরিতে রাখা নেই — সবাই এখানে এসে দেখতে পারে আর তা থেকে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়ে নিতে পারে।

আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—এ হল ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত আশুতোষ মিউজিয়াম — বঙ্গ তথা ভারত সংস্কৃতির নানান উপাদানে পূর্ণ অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে তিল তিল করে সঞ্চিত প্রায় পঁচিশ হাজার দ্রব্যের এক বিরাট সংগ্রহ — কত কিছু জানা-অজানা কাহিনীর ইতিহাস এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতির যেন এক প্রবহমান মিছিল। বঙ্গ সংস্কৃতিকে চিনতে হলে, জানতে হলে এখানে আসতে হবে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে। প্রাচীনকালের সভ্যতার নিদর্শন, পোড়ামাটির মূর্তিকা ও ফলক, পাথরের, ব্রোঞ্জের ও কাঠের মূর্তি — এসবই যেমন এখানের সম্পদ, তেমনি এখানের আর এক উল্লেখযোগ্য

সম্পদ বাংলার লোকশিল্পের নিদর্শন — পুতুল, প্রতিমা, পট-চিত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং বৈচিত্রময় শাড়ী ও কাঁথা যেন চিরকালের জন্যেই বসানো এক মুখর মেলা।

বঙ্গ সংস্কৃতির গৌরব রক্ষায় স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও প্রযত্নে, ১৯৩৭ সালে একদিন পাঁচটি দ্রব্যকে সম্বল করেই এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সে যাত্রায় অগ্রণী পথিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, এই সংগ্রহশালার প্রথম 'কিউরেটর' শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। নামকরণ করা হয়েছিল তখনকার কালের মিউজিয়াম আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ স্যার আশুতোষের নামে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সংগ্রহশালা কীভাবে গড়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ' 'The museum may be regarded, first as an adjunct to the class room and the lecture room, secondly, as a bureau of information and thirdly, as an institution for the culture of the people...'

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মিউজিয়াম তাঁর নামে উৎসৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদাই দেওয়া হয়েছে।

আজ যেখানে মিউজিয়ামের এই গৃহ, একদিন সেখানে ছিল গ্রীসীয় স্থাপত্যের অনুকরণে বিরাট থামওয়ালা 'সিনেট হল' এবং এই হলের একধারে ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে উঠেছিল এই সংগ্রহশালা। কিন্তু বেশিদিন সেই গৃহের পক্ষপুটে এই মিউজিয়ামের সংগ্রহ এক নাগাড়ে থাকতে পারেনি। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা আর আতঙ্কের আবহাওয়ায় একান্ত নিরাপত্তার জন্যে এই মিউজিয়ামের সম্পদ সাময়িকভাবে চালান হয়ে যায় মুর্শিদাবাদের ইমামবাড়ায়। ভারী ভারী পাথরের মূর্তিগুলোকে অবশ্য মাটি চাপা দেওয়া হয় আশুতোষ বিল্ডিং-এর চত্বরে — ধ্বংসের সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবার আশায়। যুদ্ধশেষে আবার সব জিনিসপত্র একত্র করে সাজানো হয় সিনেট হলের পিছন দিককার সেই গৃহে। তারপর একদিন যখন সিনেট হল ভেঙ্গে নতুন করে স্থান সঙ্কুলানের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ১৯৬০ সাল নাগাদ এই সংগ্রহশালা প্রায় সাত বছরের জন্যে উঠে যায় ১৪ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে। ১৯৬৭ সালে আবার গৃহপ্রবেশ ঘটে বর্তমানের এই নবনির্মিত ভবনে।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চিন্তায় এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা একান্তই গৌরবের। বাংলার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করে তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার মূলে এই সংগ্রহশালার গুরুত্বপূর্ণ অবদান বাঙ্গালী চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। কারণ একদিন ছিলো, যখন বাঙ্গালী শুনতো তার অতীত ইতিহাস অস্পষ্ট, সে জানতো না কোন্ ঐতিহ্যের সে উত্তরাধিকারী। বাংলার ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে দীর্ঘকাল ধরেই সে ছিল অবজ্ঞাত ও অবহেলিত। কিন্তু এই ধারণার নিরসন ঘটলো একদিন। দিনাজপুরের কাছে দামোদরপুর গ্রামে পাওয়া পাঁচখানি তামার পাতে লেখা ফলক বাংলার অন্ধকার ইতিহাসে এক আলোকসম্পাত করলো। সে আলোকে আমরা চিনতে পারলাম গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে অতীত বাংলার পরিচয়। দামোদরপুরের ঐ তাম্রশাসনে যে 'কোটিবর্ষের' কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, এই সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ সেই 'কোটিবর্ষের' স্থান বলে অনুমান করলেন পশ্চিম দিনাজপুরের

বাণগড়ের সেই মাটির ঢিপিকে। আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে খননকার্য চালানো হল সেখানে এবং বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়ে সেখানে পাওয়া গেল মৌর্য-শুঙ্গ আমলের বহু জিনিসপত্র আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মী হরফে পোড়ামাটির সীলমোহর। এইভাবেই বঙ্গ সভ্যতার আদি বিন্দু গুপ্ত আমলকে অতিক্রম করে মৌর্য-শুঙ্গ যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত করে বাঙ্গালীর ইতিহাসকে মহিমময় করে তুললো আশুতোষ মিউজিয়মের এই খননকার্য। বাণগড়ের পর চন্দ্রকেতুগড়; এখানেও শুরু করা হল খননকার্য। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানা এলাকার বেড়াচাঁপার কাছে চন্দ্রকেতুর গড়ে মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মধ্যবর্তী শহর ও বন্দর আবিষ্কার করে আশুতোষ মিউজিয়াম আবার নতুন করে বাংলার হারানো সভ্যতা আর হারানো ইতিহাসকে খুঁজে বের করে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করলো। আজও বেড়াচাঁপায় গেলে দেখা যাবে গুপ্ত যুগে নির্মিত এক দেউলের ধ্বংসাবশেষ — যা প্রচলিত এক কিংবদন্তীতে উল্লিখিত খনা-মিহিরের ঢিপি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। তারপর দিকে দিকে চললো প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান; তমলুক, তিলদা, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা আর পান্না গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব পুরাবস্তু সংগৃহীত হল, তাতে গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের এক বিস্মৃত প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় উদঘাটিত হল।

আশুতোষ মিউজিয়ামের এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে তার প্রত্নতত্ত্ব দ্রব্যের প্রদর্শন কক্ষে। শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ সেই অপরূপ যক্ষিণী মূর্তি, কুষাণ যুগের ভেড়া ও হাতীর মুখাকৃতি চক্রবাহিত খেলনা পুতুল, মিথুন মূর্তির ফলক, অদ্ভুত রকমের রাক্ষসের মূর্তি, পেট মোটা কুবের, আদিম শিল্পরীতিযুক্ত মাতৃমূর্তি ছাড়াও অসংখ্য পোড়ামাটির নানান ধরনের মূর্তি ফলক এবং সেকালের ব্যবহৃত মাটির হাঁড়িকুড়ি, অগুন্তি নানান রঙের পাথরের পুঁতির মালা এবং ব্রাহ্মী ও প্রাক্ বঙ্গাক্ষরে লেখা অসংখ্য সীলমোহর — এসব দেখতে দেখতে আমাদের ক্ষণেকের জন্য হারিয়ে যেতে হয় সেই অতীতের জগতের সঙ্গে, তার সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে।

প্রদর্শনী কক্ষে দেখতে দেখতে থমকে দাঁড়াতে হয় এক পোড়ামাটির ভগ্ন নারীমূর্তির মুখের দিকে চেয়ে। এমন এক লাবণ্যপূর্ণ মৃদুহাস্যদীপ্ত মুখমণ্ডল — যে কোন দর্শককেই মুগ্ধ করবে। ভাবের গভীরতায় অতুলনীয় এই মূর্তি — প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যশিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন — যা পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলার পান্না গ্রাম থেকে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখার মত এইসব পোড়ামাটির মূর্তি ফলকগুলি। এদের গড়ন, বসবার ও দাঁড়াবার ভঙ্গী, তার পোশাক-পরিচ্ছদ এসব দেখে মনে হয়, এইসব পুতুলের মধ্যেও সেকালের মার্জিত পরিবেশের এক পরিচয় তুলে ধরেছেন শিল্পীরা। পুতুলের গায়ে বস্ত্রের আবরণ ভেদ করে দেহের সুস্পষ্ট রেখা ফুটে ওঠায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রসিদ্ধির কথা, — সেই জগৎ বিখ্যাত মসলিনের কথা, যা হয়ত দু' তিন হাজার বছর আগেও বিদ্যমান ছিল। সংগ্রহশালার পোড়ামাটির দ্রব্য প্রদর্শনীর কক্ষে দাঁড়িয়ে এইসব দেখতে দেখতে অনেক কৌতূহল আর অনেক জিজ্ঞাসার কথা মনে হয়। তাই এই সংগ্রহশালার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারা যায়

না।

পোড়ামাটির প্রাচীন মূর্তি ফলকগুলি ছাড়াও, এই সংগ্রহশালায় রয়েছে মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক সংগ্রহ। মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়ে বাঙ্গালী সূত্রধর-শিল্পীরা পোড়ামাটির ভাস্কর্যে যে সমাজজীবনের চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা গভীরভাবে মনোনিবেশ করে দেখার মতো। পূর্ববাংলা থেকে অধিকাংশই সংগৃহীত এইসব ফলকের পরিচয় লাভ করে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও তার বিস্তার সম্পর্কেও একটা ধারণা করার সুযোগ ঘটে।

পাথরের মূর্তি সংগ্রহের কাছে এলে, অতীত বাংলার শিল্পীদের কারিগরি নৈপুণ্যের এক চরম উৎকর্ষের কথা মনে হয়। বাঙ্গালী তক্ষণ শিল্পীদের ছেনী-বাটালির স্পর্শে শক্ত পাথরের ডেলা কীভাবে রূপ লাবণ্যের এক জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে — তা অবাক বিস্ময়ে দেখতে হয়। প্রদর্শনী কক্ষে রক্ষিত অসংখ্য পাথরের এই মূর্তির মিছিলে এসে পড়লে সত্যিই ধাঁধাঁ লাগে — এর কোন্‌টিকে শ্রেষ্ঠ বলবো বা কোনটিকে উল্লেখযোগ্য বলে গ্রহণ করবো। এর মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুরের অগ্রদিগুণ থেকে পাওয়া এক নারী মূর্তির মুখই বোধ হয় মিউজিয়ামের সুন্দরতম মূর্তির নিদর্শন, করুণা, লাবণ্য ও কোমলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ যেন এর মুখমণ্ডল থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য মূর্তির মধ্যে আছে, ঐ অগ্রদিগুণ থেকে পাওয়া গরুড়ের কাঁধে চাপা অবস্থায় বিষ্ণু মূর্তি, বিহার থেকে সংগৃহীত হরিহর মূর্তি, জটার দেউল থেকে পাওয়া বিষ্ণু মূর্তির মধ্য অংশ, বর্ধমান থেকে পাওয়া বিষ্ণু-লোকেশ্বর, হুগলীর কৈকালা থেকে পাওয়া দত্তাত্রেয় বিষ্ণু, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরিষাদহ থেকে পাওয়া সুর্দশন চক্রের দুধারে খোদিত গরুড়ের উপর নৃত্যরত বিষ্ণুর মূর্তি, রাজশাহীর কালীগ্রামের অপরূপ কার্ত্তিকেয় মূর্তি, পুরুলিয়া থেকে আনা ঋষভনাথের মূর্তি, ভাঙ্গড় থেকে পাওয়া মঞ্জুশ্রী এবং সুন্দরবন থেকে পাওয়া সরস্বতীর মূর্তি প্রভৃতি।

এইসব মূর্তি সংগ্রহের মধ্যে যে কত বৈচিত্র্য, কত কিংবদন্তী আর কত বিষাদময় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তার তুলনা হয় না। একটা উদাহরণ দেওয়া গেলে বুঝতে পারা যাবে সেই সংগ্রহকালীন অভিজ্ঞতা। সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত যশোর থেকে পাঁচ ফুট লম্বা যে কষ্টি পাথরের মূর্তিটি সংগৃহীত হয়েছিল — তা স্থানীয় এক পুষ্করিণী খননের সময় পাওয়া যায়। মাটির ভিতর ঐ মূর্তির নীচে ছিল দুটি নরকঙ্কাল। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের মতে বলা হয়েছিল, বিধর্মীর আক্রমণ থেকে এই মূর্তিটিকে রক্ষার জন্যে এই দুই হতভাগ্যকে হয়ত সে সময় জীবন দিতে হয়েছিল।

মূর্তি বৈচিত্র্যের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় আর একটি মূর্তি হল, কাঠের এক গোপাল মূর্তি। এটি সংগ্রহেরও এক চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। মালদহ জেলার মহানন্দায় কনসটের ঘাটে স্নান করছিলেন ময়মনসিংহের আচার্য চৌধুরী পরিবারের এক জমিদার। নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাঁর গায়ে এসে লাগে এই অপরূপ মূর্তিটি। জলে হাবুডুবু খাওয়া এই হতপ্রায় গোপালের ভবিষ্যৎ ভেবে এটিকে তিনি এই মিউজিয়ামে দান করেন। বাঙ্গালী ভাস্কর কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে কাঠের শিরাগুলিকে দেহের গঠনের কাজে লাগিয়েছেন — তা আশ্চর্য হয়ে দেখার মতো। ১৯৪৮ সালে এই গোপাল লণ্ডনের বার্লিংটন হাউসের

প্রদর্শনীতে যায়। সেখানে এপস্টাইন ও ডবসনের মত বিশ্ববিখ্যাত ভাস্করেরা এটি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। কাঠের গোপাল ছাড়াও কাঠের কাজের অনেক নিদর্শন এখানে আছে, — মন্দিরের দরজার নক্সা করা কপাট, রথের ঘোড়া, সারথি ও অন্যান্য কাঠ খোদাইয়ের কাজ এবং আটচালা চণ্ডীমণ্ডপের নক্সা কাটা কড়ি বরগা, মায় পশু-মানুষের আকৃতি খোদাই করা ব্রাকেট প্রভৃতি। এগুলি শুধু দুর্লভই নয় এইসব সংগ্রহ প্রাণবান বঙ্গ সংস্কৃতির সেই প্রাচীনতম ধারার এক মূর্ত প্রতীক।

এছাড়া অষ্টধাতু, পিতল ও ব্রোঞ্জ নির্মিত দ্রব্যের প্রদর্শন কক্ষে এলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চেতনার কথা ভেবে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ব্রোঞ্জ ও পিতলের পুতুল-খেলনা আর গৃহশিল্প সামগ্রী থেকে শুরু করে ঢোকরাদের নির্মিত আদিমতর রীতি-পদ্ধতির সেই সব ঐতিহ্যবাহী মূর্তিগুলি বাংলার ঐশ্বর্যবহুল জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। হবিবপুরের শিবলোকেশ্বর এবং চট্টগ্রামের জেয়ারীতে পাওয়া ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি এই সংগ্রহশালার এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এছাড়া প্রায় আটশো ন'শো বছর আগে ভূমির দানপত্র কি ধরনের হোত বা তাতে কি লেখা থাকতো সে সম্পর্কে কৌতূহল থাকলে এখানে প্রদর্শিত তামার পাতে খোদিত খাড়িমণ্ডলের অধিপতি ডোম্মলপালের নাম যুক্ত এই তাম্রপট্টটি নিশ্চয়ই দেখতে হবে। সুন্দরবন থেকে পাওয়া এই লিপিযুক্ত তাম্রপট্টটির বৈশিষ্ট্য হল, এর একদিকে দানপত্রের বয়ান আছে আর অন্যদিকে আছে রথের উপর আসীন বিষ্ণুর মূর্তি এবং তার পদতলে রয়েছে হাঁটুমুড়ে নতজানু অবস্থায় তার ভক্ত। সমস্ত পাতটির উপর রুপোর এক আস্তরণ দেওয়া হয়েছে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে।

এই অর্থকরী সমাজের রূপকল্পনার পিছনে মুদ্রার যে ভূমিকা ছিল — তারও সব মূল্যবান নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মুদ্রার সেই বিবর্তন ধারাও প্রদর্শিত হয়েছে সামান্য পরিসরে। প্রদর্শনের আয়োজন ক্ষুদ্র হলেও ভারত ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়ার আর সাম্রাজ্য পতনের কাহিনী যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে মুদ্রার এই সংগ্রহটি দেখলে। এমন ধরনের মুদ্রা এই সংগ্রহশালার সংগ্রহে আছে প্রায় দেড় হাজারের মতো। গুপ্তরাজাদের এবং শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা এই সংগ্রহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আশুতোষ মিউজিয়ামের গৌরব তার লোকশিল্পের মূল্যবান সংগ্রহের জন্যে। লোকশিল্পের এই প্রদর্শন কক্ষে চিত্র বিচিত্রিত বস্তুগুলির মধ্যে এসে দাঁড়ালে ইচ্ছে হবে কবির কথায় বলতে — 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি.....।' সত্যি এমন সব গ্রামীণ শিল্পের অবহেলিত তুচ্ছ নিদর্শন, হাঁড়ি সরা, পুতুল-কাঁথা, পট আর পাটার সামগ্রী আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদর্শন কক্ষে স্থান পেয়েছে। ঠিক তখনই মনে হবে এগুলি আর তুচ্ছ নয় — বঙ্গ সংস্কৃতির গৌরব ঘোষণায় যেন উৎসর্গীকৃত। এই শহরে আমেজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নিত্যকারের জীবন ক্ষণিকের জন্যে স্মরণ করবে বাংলার সুরুচিসম্মত লোকজীবনের তথা উৎসব-পার্বণের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতার কথা। তখনই মনে হবে জীবনযাত্রার তালে তালে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে সাদামাঠা জীবনে বাঙ্গালীর সাধারণ গৃহকোণও অসাধারণ হয়ে উঠেছিল তার রূপসন্ধানী চিত্তের স্পর্শে। বঙ্গ বিভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু বাঙ্গালীর রূপচেতনার এই প্রবহমান সংস্কৃতির ধারা একান্তই উপলব্ধি

করা যেতে প্যারে, আশুতোষ মিউজিয়মের লোকশিল্পের এই প্রদর্শন কক্ষে এলে — যেখানে উভয় বাংলার লোকশিল্পের সংগ্রহ একত্র প্রদর্শিত হয়েছে। বলা যেতে পারে বঙ্গদেশ ভাগ হবার পূর্বেই সংগৃহীত পূর্ববাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পের সংগ্রহ এই মিউজিয়ামের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন ও গুরুসদয় দত্ত পথিকৃৎরূপে লোকশিল্প চর্চার যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন, আশুতোষ মিউজিয়ামের এই লোকশিল্পের সংগ্রহ তারই এক পরিপূর্ণ রূপ।

এই শিল্প সমৃদ্ধ প্রদর্শন কক্ষে সংগৃহীত হয়েছে হাতে টেপা পুতুল থেকে আরম্ভ করে চিত্র-বিচিত্রিত পুতুল, পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, মনসার ঝাড়, চিত্রিত হাঁড়ি, শিকে, সরা আর মনসার ঘট। তারপর শোলার পুতুল, তবে শোলার তৈরি অপরূপ দুর্গার মূর্তি — এখানের একটি বিশেষ আকর্ষণ। এরপর আছে কাঁথা। কাঁথার নক্সায় আর বৈচিত্র্যের মধ্যে মন হারিয়ে যায়। এখানে প্রদর্শিত এসব কাঁথার নানান আকৃতি — তার প্রয়োজনের তাগিদে। এগুলির অধিকাংশই ব্যবহার হত আবরণের জন্যে; অন্যদিকে আর্শী, চিরুনি মুড়ে রাখার জন্যে তৈরি হত ছোট ছোট মাপের কাঁথা। তারপর তোরঙ্গ বাক্স-প্যাটরা ঢাকা দেবার আচ্ছাদন হিসেবে তো কাঁথার ব্যবহার ছিলই। আর দেখা যাবে আলপনার মতই কাঁথার গায়ে পদ্ম ও শঙ্খলতার নক্সা। মানুষ, সাহেব, হাতি-ঘোড়া আর প্রতিদিনের গৃহশিল্প সামগ্রীর নক্সা সুতোয় বোনা এইসব কাঁথার গায়ে। জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের উপর পল্লীবধূর এই চিত্রালঙ্কার এখানে এসে মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো।

কাঁথারই পাশে পাশে রয়েছে প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের সম্ভার। নক্সার পারিপাট্যে আর বয়নের কৌশলে এগুলির চিত্তাকর্ষক অবদান বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে এক সার্থক সৃষ্টি। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বাঙলার ঐতিহ্যবাহী মসলিন, ঢাকাই জামদানী, বিষ্ণুপুরী ময়ূরকণ্ঠী আর মুর্শিদাবাদী বালুচর। আর আছে অগ্নিফুল মসলিনের নিদর্শন। আগুনের হলকার মত রঙ এই কাপড়ের। কিংবদন্তী বলে, অগ্নিফুল এই মসলিনের শাড়ী পরেই নাকি বেহুলা নৃত্য করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন।

আর পাশাপাশি আছে পটুয়ার পটচিত্র, নানান পৌরাণিক দেব-দেবীর আখ্যান নিয়ে রচিত সে সব পটের বিষয়বস্তু।

সাবলীল তুলির টানে চিত্র বিচিত্রিত মনোমুগ্ধকর লোকচিত্র যা পটুয়ারা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের মাধ্যমে তার বর্ণনা দিতেন। আর আছে কালীঘাটের পট এবং চিত্রিত পুঁথির পাটা — যার সুবিপুল সংগ্রহ দেখে যেন শেষ করা যায় না। এছাড়া হাতির দাঁতের থেকে তৈরি ভাস্কর্যের নিদর্শনও রয়েছে, আর সেই সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে রাজপুত, কাঙ্‌ড়া, মোগল ও ওড়িশা রীতির চিত্রকলার নিদর্শন।

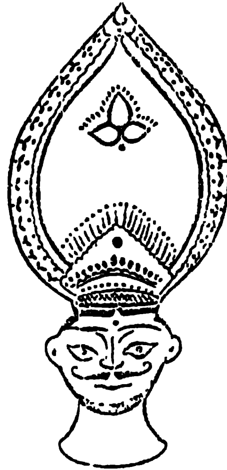
এবারে ফেরার সময় হলো। মিউজিয়ামের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন নিদর্শনের চিত্রিত কার্ডের সেট। এছাড়া এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে,

1. Excavations at Bangar.
2. Asutosh Museum of Indian Art - An Introduction.

3. Catalogue of Paintings of the Asutosh Museum Ms. of the Ramcaritamanasa.
4. Catalogue of Folk Art in the Asutosh Museum.
5. Asutosh Museum of Indian Art : East Indian Sculptures.
6. Catalogue of Early Indian Coins.

প্রদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। কত দর্শক এসেছেন, কত উপলব্ধির, কত জ্ঞান সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা লিখে গেছেন। পাতার পর পাতা উল্টে যেতে যেতে এক জায়গায় নজর পড়ে — যেখানে লেখা আছে, 'বঙ্গ সংস্কৃতির এই জ্ঞানভাণ্ডার বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে যুগের পর যুগ।' এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যেতে পারে, হ্যাঁ এখানে এসে 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' — দেখেছি তার শিল্প, তার শিল্পী তার ইতিহাস আর তার সংস্কৃতি। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি বাণগড় থেকে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি, (আ ঃ খ্রী ঃ ১ম শতক)]





।।৩।।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বিষ্ণুপুর

এবারের প্রসঙ্গ বাঁকুড়া জেলার মিউজিয়াম নিয়ে। বাঁকুড়া জেলার মিউজিয়াম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় , এ জেলাটিতে বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত এত বৈচিত্র্যময় খোলামেলা সব নিদর্শনের সংগ্রহ আছে — পশ্চিমবাংলার আর কোন জেলাতে এমনটি নেই। উদাহরণ প্রসঙ্গে এলে এর তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে গুপ্ত আমলের চন্দ্রবর্মণের লিপিযুক্ত গুহালিপিই তো একটি জীবন্ত সংগ্রহশালা। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগ্রহশালার বদ্ধ খুপরির মধ্যে যে কটা পোড়ামাটির ফলক আহরিত হয়েছে তার চেয়েও বহুগুণ বেশী পোড়ামাটির ফলক ও তার ভাস্কর্য সুষমার নিদর্শন রয়েছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের নির্মিত পোড়ামাটির মন্দিরে, যাকে বলা যেতে পারে বাংলার এক অমরাবতী। শুধু পোড়ামাটির ফলক সজ্জাই বা কেন, বাংলার মন্দির স্থাপত্যের যে কয়টি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায় — তার সব কটিরই অবস্থান তো বাঁকুড়া জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। আর তার সঙ্গে আছে সেকালের অস্ত্রশস্ত্রের এক জীবন্ত নিদর্শন — বিরাটাকার দলমাদল কামান। অন্যদিকে তার লৌকিক শিল্পধারার নিদর্শন সমেত সেই সব চারুকলার পরিচয় হলো পোড়ামাটির হাতীঘোড়ার জন্যে পাঁচমুড়ো, সোনামুখী ও মুরলুর কুম্ভকার পল্লী , ঢোকরাদের পিতলের কাজের, শাঁখারিদের শাঁখার কাজের ও তন্তুবায়দের বস্ত্রশিল্পের কাজের উৎপাদন কেন্দ্র তো আছেই — যা চোখ ভরে দেখার মত। এসবই যেন এক জীবন্ত সংগ্রহশালা — বাঁকুড়া জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে, যা দেখে শেষ করা যায় না।

কিন্তু তবুও বর্তমান কালের 'সংগ্রহশালা'র সংজ্ঞাগত অর্থে যে সংগ্রহশালা বোঝায়, তারও গৌরবের অধিকারী বাঁকুড়া জেলা, — তার একমাত্র সংগ্রহশালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখা কর্তৃক পরিচালিত বিষ্ণুপুরের 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারণ প্রাচীন রাঢ় তথা বঙ্গসংস্কৃতির বহু কিছু নিদর্শনই এই সংগ্রহশালায় সংগৃহীত

হয়েছে। এখানেব মূল্যবান সম্পদগুলি না দেখলে যেমন প্রাচীন মল্লভূমের পরিচয় লাভ করা যাবে না, তেমনি বঙ্গসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য বা প্রবাহের কথাও যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। এই হিসেবেই এই সংগ্রহশালাটি সংস্কৃতিপ্রেমিকদের কাছে একান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে আসতে হলে, বিষ্ণুপুর রেল স্টেশন থেকে রিক্সায় আসা যায়। 'বাসে' এলে মহকুমা আদালতের পাশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির কাছে নেমে সোজা পূর্বদিকে আসতে হবে। বিষ্ণুপুবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য রাসমঞ্চকে বাঁদিকে রেখে এবং ডাইনে সরকারী পর্যটন বিভাগের 'টুরিষ্ট লজ'কে ছাড়িয়ে লালবাঁধের দিকে খানিকদূর এগিয়ে গেলেই বাঁ পাশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-বিষ্ণুপুর শাখা পরিচালিত এই সংগ্রহশালা 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'।

এ সংগ্রহশালাটি হলো কতিপয় সংস্কৃতিপ্রেমী উৎসাহীদের পরিশ্রমের ফল। নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত যেমন এর বস্তুসম্ভার, তেমনি নিজস্ব উদ্যমে ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় নির্মিত এর সংগ্রহশালা ভবন। সরকারী আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় এঁদের কাজ বন্ধ হয়ে থাকেনি; নানান জনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য তুলে এঁরা এই গৃহনির্মাণের কাজে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয ব্যয় নির্বাহে লাগিয়েছেন। এর ফলে তাঁরা যে বিরাট ভবনটি নির্মাণ করেছেন তা থেকে তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্যমের এই দৃষ্টান্ত দেশবাসীর কাছে সত্যিই এক শিক্ষার বস্তু হয়ে থাকবে। তাই সংগ্রহশালার যেমন কোন প্রবেশমূল্য নেই, তেমনি সর্বসময়ের জন্য সংগ্রহশালার দ্বার উন্মুক্ত করে রাখা না গেলেও, অন্ততঃ সকাল ও বিকাল এই সংগ্রহশালা খোলা থাকে।

এই সংগ্রহশালা যাঁর নামে উৎসর্গীকৃত, বাঁকুড়ার সেই সুপরিচিত আচার্য 'যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি' রাঢ় অঞ্চলের বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার সংস্কৃতি সম্পদ সংগ্রহ করে একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্যে যিনি সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের-বিষ্ণুপুর শাখার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহ। (সম্প্রতি তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন)। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টায় সে সময় আচার্য বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কয়েকটি পুরাবস্তু এই উদ্দেশ্যে দান করেন এবং বলতে গেলে সেই থেকেই এই সংগ্রহশালা পত্তনের কাজ শুরু হয়। তারপর থেকেই চেষ্টা চলে সংগ্রহের কাজ। সংগ্রহশালার অন্যতম সংগঠক শ্রীমানিকলাল সিংহ পেশায় ছিলেন যদিও শিক্ষক, তবু শক্তিতে নিরলস ও কষ্টসহিষ্ণু। তাই তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ায় গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সংগ্রহশালার উপযোগী বস্তু সংগ্রহ করা। এর ফলে সংগৃহীত হয় বহু প্রাচীন পুঁথি ও চিত্রিত পুঁথির পাটা, মূর্তি, মুদ্রা, পট, পুতুল-খেলনা, প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তি ফলক, পাঁচমুড়ো ও সোনামুখীর ঘোড়া ও মনসার ঘট এবং বিষ্ণুপুরী শাড়ীর অপূর্ব সব নিদর্শন। এইভাবেই তাঁর ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর চেষ্টায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত এই আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংগৃহীত হয় রাঢ়ের চিরায়ত সংস্কৃতির এই সব অমূল্য সম্পদ।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫১ সাল নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করেন কবিশেখর কালিদাস রায়। বিদ্যানিধি মহাশয় সে সময় জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মিউজিয়ামটির বর্তমান এই নামকরণ করা হয়। প্রথম দিকে সংগৃহীত বস্তুগুলিকে রাখবার জন্যে গৃহের অভাব দেখা দেওয়ায় সে সময় বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সংলগ্ন দুটি ক্ষুদ্র গৃহে এইসব সংগৃহীত বস্তুসম্ভার সংরক্ষিত হয়।

তারপর বিগত কুড়ি-একুশ বছর ধরে বাঁকুড়া জেলার যেসব কৃষ্টিসম্পদ এই সংগ্রহশালায় জমা হয়, তা যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত গৃহনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। কর্মীদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবারের কাছ থেকে দশকাঠা জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং সেই সংগৃহীত ভূমিতে সংগ্রহশালার নিজস্ব গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনায় রূপদানের জন্যে বিষ্ণুপুর কে.জি. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জনৈক সহৃদয় অধ্যাপক প্রস্তাবিত গৃহনির্মাণের নকশা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত ও নির্মাণকার্যের যাবতীয় দায়িত্ব নিঃস্বার্থভাবে পালনের জন্যে এগিয়ে আসেন এবং সভ্যদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে নবনির্মিত গৃহে এই সংগ্রহশালা স্থানান্তরিত হয়।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের সংগ্রহের মধ্যে প্রধান হলো তার পুঁথি সংগ্রহ। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা ভাষারই পুঁথি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথিগুলি সাধারণতঃ সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত। বাংলা পুঁথিগুলির মধ্যে আছে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, লৌকিক পালাগান এবং আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত। এঁদের এই পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি হল, সাল তারিখযুক্ত পাঁচশো বছরের পুরাতন একটি বিষ্ণুপুরাণ। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রায় হাজার বছরের পুরাতন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি এই বাঁকুড়া জেলা থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল।

এইভাবেই গ্রাম গ্রামান্তর থেকে উৎসাহীরা এই সংগ্রহশালায় তাঁদের পূর্বপুরুষের গচ্ছিত পারিবারিক সম্পদ এইসব পুঁথির তাড়া এই সংগ্রহশালায় দান করে গেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই মিউজিয়ামের সুযোগ্য কর্মীরা নানান সূত্রে সন্ধান পেয়ে পুঁথির মালিকদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন পুঁথি সংগ্রহের আশায় এবং সে সংগ্রহের বহু তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে কর্মীদের। সংগ্রহশালার প্রধান সংগঠক শ্রীসিংহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পুত্রের গুরু— এই ভক্তি-শ্রদ্ধায় অনেকে আনন্দের সঙ্গেই তাঁদের সংরক্ষিত পুঁথি এই সংগ্রহশালায় দান করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হৃদয় গৃহস্বামীর মন টলাতে পারেন নি কর্মীরা, কিন্তু ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে তারা ফিরে আসেন নি। এ ক্ষেত্রে প্রধান সংগঠক শ্রীসিংহ অসুস্থ গৃহস্বামীকে তার পুরানো ব্যাধির জন্যে নানান ধরনের ঔষধ বাতলে দিয়েছেন, কখনও বা জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়ে হস্তরেখা বিচার করে তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ বাতলে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করেছেন এবং তারই ফলস্বরূপ গৃহস্বামী একান্তই আনন্দের সঙ্গে দান করেছেন পুঁথির তাড়া— যার মধ্যে অনেক সময় পুঁথির মলাটে ব্যবহৃত চিত্রিত পুঁথির পাটাও সেইসঙ্গে সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাও আছে কর্মীদের।

কোন কোন গৃহস্বামী কীটদ্রষ্ট পুঁথি সংরক্ষণে অক্ষম হয়ে তা কোন নদীর জলে বির্সজন দিয়েছেন। কেউ বা জঞ্জাল মনে করে আঁস্তাকুড়ে সেই সব পুঁথিকে নিক্ষেপ করে তাঁদের মহৎ কর্তব্য সমাপন করেছেন। তবে এসব ক্ষেত্রেও কর্মীরা সেই আঁস্তাকুড় থেকেও যে কিছু কিছু পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন নি— এমন নয়। তা হলেও এই ক্ষয়-ক্ষতির ও অবহেলার হাত এড়িয়ে সংগ্রহশালার কর্মীদের প্রায় পাঁচ হাজার পুঁথি সংগ্রহের এই কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। বিষ্ণুপুরের সংগ্রহশালার এই বিশাল পুঁথি সংগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালে সহজেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের সেই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্র মল্লভূমের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য সংস্কৃতিচর্চার এক গৌরবময় চিত্র— যা আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হলেও তার নিদর্শন রয়ে গেছে সংগ্রহশালার এই বদ্ধ প্রকোষ্ঠে।

এই সংগ্রহশালায় আরও যে সব উল্লেখযোগ্য দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে আছে প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র, প্রাচীনকালের রমণীদের অলঙ্কার। বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলক সজ্জিত এমন ধরনের মন্দির একদা যে নির্মিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে এখানে সংগৃহীত ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগাত্রের ফলকগুলির সংগ্রহ দেখে। বাঁকুড়া জেলার সব কটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সংগ্রহশালার কর্মীরা এইসব পুরাবস্তু সংগ্রহ করেছেন এবং সেই সঙ্গে উৎসাহী গবেষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মিউজিয়ামের পক্ষে ডিহরে অনুসন্ধান কার্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের তদানীন্তন অধীক্ষক স্বর্গত দেবকুমার চক্রবর্তী এ বিষয়ে 'কৌশিকী' পত্রিকায় (শারদীয় ১৩৮৩) 'পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক প্রত্নানুসন্ধান' প্রবন্ধে একদা এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, "বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদের তীরে অবস্থিত ডিহর গ্রামের প্রস্তর নির্মিত খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর ষাঁড়েশ্বর ও সল্লেশ্বর বা শৈলেশ্বর মন্দিরের কথা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু এই মন্দিরদ্বয় যে আরও সুপ্রাচীন ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত তা অনেকেরই অজানা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সুযোগ্য কর্ণধার শ্রীমানিকলাল সিংহ মহাশয় এই ঢিবি থেকে কিছু প্রত্নবস্তু যথা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, তামার চতুষ্কোণ ঢালাই করা মুদ্রা, মসৃণ কুঠার ফলক ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাঁর সংগ্রহশালায় রাখেন। কালক্রমে এই নিদর্শনগুলি সুপরিচিত গবেষক শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান লেখককে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য চালাতে অনুরোধ করেন। গত ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলে ডিহরের প্রাচীনত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী এই স্থানের সুউচ্চ ঢিবি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসারিত ঢিবির বিভিন্ন অংশ থেকে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার সম্পৃক্ত কৃষ্ণ-লোহিত রঙের মৃৎপাত্রের ভগ্ন অংশ (এগুলির মধ্যে কয়েকটি আবার চিত্রিত), ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র, ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ, প্রস্তর নির্মিত পুঁতি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ঢিবির বিস্তীর্ণ অংশে

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করলে বাংলার তাম্র-প্রস্তর যুগকালীন সভ্যতার অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হবে—যা এই সভ্যতার উৎস নির্ণয়ে আলোকপাত করবে বলেই আমাদের ধারণা।"

এরই সঙ্গে সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে পাথরের মূর্তিরাজি। গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী পাল-সেন যুগের পাথরের সূর্যমূর্তি, জৈনমূর্তি, চামুণ্ডা, বিষ্ণুমূর্তি, উমা-মহেশ্বর মূর্তি, বিষ্ণুপট্ট ও শিখর দেউলের আকারে নির্মিত জৈন চৌখুপি প্রভৃতি হলো সেই সংগ্রহের তালিকা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূর্তি হলো ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত একটি অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্তি। প্রায় সাড়ে চার ফুট দীর্ঘ ও দু-ফুট উচ্চতার এই বৃহদাকার মূল্যবান প্রস্তর মূর্তিটি জয়পুর থানার গোকুলনগরে অবহেলিতভাবে পড়ে থাকে দীর্ঘদিন ধরেই। শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই এ এস মহাশয় যখন বাঁকুড়া জেলায় কর্মরত ছিলেন, তিনি এই মূর্তিটি গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাপূর্বক সংগ্রহ করে এই সংগ্রহশালায় দান করেন।

বিষ্ণুপুরের এই সংগ্রহশালায় মন্দির-শিলালিপিরও বহু সংগ্রহ রয়েছে। এইসব শিলালিপিগুলি সংগ্রহের ফলে জানা গেছে বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সাল তারিখের কথা। আবার বহুক্ষেত্রে মন্দির-লিপিতে স্থানের উল্লেখ থাকায় সেখানে মন্দিরের অস্তিত্বের কথা এবং সেই মন্দিরে পূজিত দেবতার পরিচয় জানা গেছে— যা গবেষকদের কাছে একান্তই প্রয়োজনীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হতে পারে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের প্রাচীন মুদ্রার সংগ্রহটিও বেশ সমৃদ্ধ। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত এবং মোগল আমলের বহু মুদ্রা এই সংগ্রহশালার সম্পদ। এইসব মুদ্রা সংগ্রহের কাহিনীও বেশ চমকপ্রদ। তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠিত তুলসীতলায় মুদ্রা দানের রীতি বিদ্যমান ছিল। ঠিক এই রকম এক ভগ্ন তুলসীমঞ্চ থেকে মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় এই সংগ্রহশালার প্রধান সংগঠক শ্রীসিংহ তখন বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মন্দির সংলগ্ন তুলসীমঞ্চে অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার কোন এক সীমান্ত অঞ্চলে মাটি কাটার সময়ে ভূগর্ভে সঞ্চিত গুপ্তধন হিসাবে কিছু মুদ্রা প্রাপ্তির সংবাদ শ্রীসিংহের কাছে এসে পৌঁছায়। এই সংবাদ শোনামাত্রই তিনি সেই অঞ্চলে উপস্থিত হন বটে, কিন্তু সুচতুর গ্রামবাসীরা এই সংবাদের সত্যতা গোপন করেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসার সময় এক জলনালার ক্ষয়িষ্ণু ভূমি-আস্তরণের উপর তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু প্রাচীন মুদ্রার অবস্থান দেখে তা সংগ্রহ করেন এবং ঐ স্থানে একদা ভূগর্ভে যে প্রাচীন মুদ্রা প্রোথিত ছিল — এই ধারণা তাঁর বদ্ধমূল হয়।

পুরাবস্তু ছাড়াও বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের লোকশিল্পেরও বহু নিদর্শন এখানে সংগ্রহ হয়েছে। একদা প্রসিদ্ধ অনেকগুলি বিষ্ণুপুরী শাড়ীর ঐতিহ্যময় নিদর্শনসম্ভার এই সংগ্রহশালার এক বিশেষ আকর্ষণ। বিষ্ণুপুরী শাড়ীর এইসব সংগ্রহ অতীতের বিষ্ণুপুরের রেশমশিল্পের

সেই গৌরবময় দিনগুলির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এছাড়া ঢোকরা-কামারদের তৈরি পিতলের বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্মী-গণেশ পুতুল বা লক্ষ্মীর সাজ, সিঁদুরের কৌটো, কাজললতা, মাপবার কুনকে বা পাই যেমন এ সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তেমনিই সংগ্রহ হয়েছে বিভিন্ন শঙ্খশিল্পের নিদর্শন, পাঁচমুড়োর তৈরি সাবেকী আমলের মনসার চালি ও পোড়ামাটির বৃহদাকার ঘোড়া। এছাড়া সংগ্রহ হয়েছে বাঁকুড়া জেলার চিত্রকর-পটুয়াদের আঁকা নানান ধরনের জড়ানো পট, ফৌজদার পদবীধারী চিত্রশিল্পীদের আঁকা দুর্গা পট ও দশাবতার তাস। তবে সবচেয়ে মূল্যবান পটচিত্র হলো এই সংগ্রহশালার চিত্রিত পুঁথির পাটা। এত উল্লেখযোগ্য মূল্যবান পুঁথির পাটার সংগ্রহ খুব কম সংগ্রহশালাতেই আছে। চিত্রশিল্প নিয়ে যাঁরা গবেষণারত রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই চিত্রিত পুঁথির পাটা একান্তই প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু হিসাবে আদৃত হবে এই কারণে যে, এগুলির রূপভঙ্গী ও বিন্যাসের মধ্যে রাজস্থানী, ওড়িশা ও বাংলার লৌকিক চিত্রকল্প ধারার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও সমস্ত চিত্রিত পাটাগুলির চিত্রাঙ্কন হয়েছে এই রাঢ় ভূমিতেই।

বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় প্রয়াসী এই সংগ্রহশালার কর্মীবৃন্দ শুধু আঞ্চলিক কৃষ্টির নিদর্শন সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হননি — তাঁরা অদ্যাবধি সমস্ত জেলার পক্ষে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব বহন করে এসেছেন। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে তার প্রসিদ্ধি তার শিল্প গৌরবের সঙ্গে তার সঙ্গীত সাধনার ঐতিহ্য এবং এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সঙ্গীত শিল্প পরিচিত হয়েছে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে। সংগ্রহশালা তাই এই ঘরানার সুস্পষ্ট রূপ নির্ণয়ের জন্যে গোপেশ্বর স্মৃতি বক্তৃতামালার আয়োজন করে বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সঙ্গীত সাধক ৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া, বিষ্ণুপুরের আর এক সঙ্গীত সাধক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় জেলার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীদেরও একত্র সমাবেশ ঘটান। তাছাড়া সংগ্রহশালায় যাঁরা তাঁদের বহুমূল্য পুরাবস্তু দান করেছেন তাঁদের প্রতি ঋণ স্বীকারের জন্যে প্রতি বছরই সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ এক সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে প্রশংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেন — যেখানে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রমুখ সুধীজন সভাপতিত্ব করেছেন।

এই মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন পরিচিতি' (১৩৯০) গ্রন্থ।

বিষ্ণুপুরে একদা প্রচলিত ছিল তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উপাদান নিয়ে রচিত এক গ্রাম্য ছড়া — যেখানে বলা হত,

গুলি, খিলি, মতিচুর,

এই তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।

কিন্তু আজ আর বিষ্ণুপুরের সে অম্বুরী তামাক নেই, তার মুখসিদ্ধির পানও নেই,

আর তার ঐতিহ্যময় মিষ্টান্ন মতিচুরের গৌরবও নেই। কিন্তু কালের পরিবর্তনের ধারায় এখন বিষ্ণুপুর নতুন এক গৌরবের অধিকারী হয়েছে এখানের এই সংগ্রহশালা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন প্রতিষ্ঠার জন্যে। সেই বিখ্যাত রাঢ় তথা মল্লভূমির কাব্য-সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের এই কৃষ্টি সম্পদ তিল তিল করে আহরণ করে এই সংগ্রহশালার কর্মীরা বাঙ্গালীর চিরায়ত সংস্কৃতিধারার যে রূপটিকে বিনা অর্থে, বিনা পারিশ্রমিকে এবং বিনা পুরস্কারে আজকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরার ব্রতে অবিচল রয়েছেন — তাঁরা দেশ ও জাতির একান্তই শ্রদ্ধার পাত্র। দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে গেলে বিষ্ণুপুরের এই সংগ্রহশালাটি পরিদর্শন করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য। ❐

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি পাথরের অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্তি (খ্রীঃ ১২শ শতক)]





আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা

হাওড়া জেলার গ্রাম্য সংগ্রহশালা—আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা সম্পর্কে একটি অভিমত ঃ 'নবাসন গ্রামে শতাব্দী ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গিয়াছিলাম। আনন্দ নিকেতনের অন্যান্য কাজেরও পরিচয় পাওয়া গেল। সারাদিন কর্মীদের আতিথেয়তায় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু যাহা বেশি ভাল লাগিল তাহা হইল, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বিশেষ করিয়া কীর্তিশালাটি। বাঙ্গলার এই সুপ্রাচীন অঞ্চলে প্রাচীন কীর্তির অভাব নাই। আনন্দ নিকেতনের কর্মিগণ বর্তমান কালের সংবাদ বা কীর্তিই শুধু সংগ্রহ করেন নাই, পুরাতন যুগের প্রমাণও সংগ্রহ করিতেছেন দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। প্রাচীনকে বাদ দিয়া নূতনকে স্থাপনা করা কঠিন। পুরানো যুগ নূতন দেশের মধ্যে নবজীবন লাভ করিবে, ইহাই সকলে আশা করে। নূতন জীবন নূতন সমস্যা ও নূতন দাবি লইয়া উপস্থিত হয়। সমাজ জীবন্ত অবস্থায় থাকিলে সে প্রাচীনের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। আনন্দ নিকেতনের কর্মী ও কর্মপ্রচেষ্টাগুলিকে দেখিয়া সেই আশ্বাসই লাভ করিলাম। আশা করি কর্মিগণ স্বীয় ব্রতে সিদ্ধিলাভ করিবেন।'

এই মন্তব্য প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর। আজ থেকে অনেকদিন আগে ১৯৬২ সালে যখন তিনি আনন্দ-নিকেতনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন তখন এই আনন্দ নিকেতনেরই পরিচালিত মিউজিয়ামটিকে 'কীর্তিশালা' নামে অভিহিত করেছিলেন। 'মিউজিয়াম' কথাটির সঠিক পরিভাষা করা না গেলেও স্বাধীনোত্তর

যুগে এর ভাবগত দিক বজায় রেখে বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ ভাষায় মনোমত করে তার পবিভাষা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আনন্দ নিকেতনের পরিচালক মণ্ডলী তাঁর প্রস্তাবিত এই নামকরণকেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সেই থেকেই এই সংগ্রহশালাটির নামকরণ হয় 'আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা'। নামকবণেব এই স্রষ্টা আজ পরলোকে। তাই এই কীর্তিশালা সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁব কথাই বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণে আসে। তাঁর মৃত্যুতে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি হল — তা প্রতিটি বাঙ্গালীই উপলব্ধি কবতে পারবেন। বঙ্গ তথা ভারতের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিশেষ করে প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য বিষয়ক সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান বাঙ্গালী চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—এই প্রার্থনা।

আলোচ্য এই আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রাম্য সংগ্রহশালা। হাওড়া স্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাগনান ষ্টেশনের পরেই 'ঘোড়াঘাটা' নামে নবনির্মিত ষ্টেশনে নেমে আসতে হয় উত্তর দিকে, সাত মিনিটেব হাঁটা পথ। ছ'নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই এই কীর্তিশালাটির অবস্থান। এখানে কোন প্রবেশমূল্য নেই, বৃহস্পতিবার বাদে সবদিন খোলা থাকে —এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। জনসাধারণকে এই কীর্তিশালা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য কীর্তিশালার পক্ষ থেকে একটি চিত্রিত পবিচায়কপত্র (ফোল্ডার) প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে গঠিত এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। বিগত ১৯৬০-৬১ সালে মহান সমাজশিল্পী রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাওড়া জেলার বাগনানের কয়েকজন মুষ্টিমেয় দলছুট রাজনৈতিক কর্মী এখানের এই অনুন্নত পল্লী নবাসন গ্রামে একটি ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেদিনের এই আনন্দ নিকেতন গড়ার পিছনে না ছিল কোন আর্থিক সঙ্গতি, না ছিল সরকারী আনুকূল্য। তাই সেদিনের এই অবহেলিত গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় একটি শ্মশান ও তার সংলগ্ন ভাগাড়ে আনন্দ নিকেতনের কর্মকান্ড শুরু করা হয়। সেই থেকে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের এই সংগ্রাম ও সাধনার ফলই হচ্ছে গ্রামের মানুষের লোকশিক্ষা ও আনন্দের এবং গবেষকদের ইতিহাস চর্চা ও অনুসন্ধিৎসার জন্য বাংলার লোকশিল্প ও প্রত্নতত্ত্বের এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা।

খাদ্য-বস্ত্র, অভাব-অনটন ও বেকারী-দারিদ্র্যের এই গ্রামে এই ধরনের একটি গ্রাম্য সংগ্রহশালার কি উপযোগিতা থাকতে পারে তা নিয়ে সে সময়ের কতিপয় রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যে তির্যক সমালোচনা শুরু করেছিলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দ নিকেতনের উদ্বোধনী স্মারক পুস্তিকায় প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সংগঠক শ্রীঅমল গাঙ্গুলী এই কীর্তিশালা বিভাগের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লেখেন —'আমাদের দেশের পুরানো ইতিহাস ও পুরাবস্তু এবং বর্তমান লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচিত করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলাই এই বিভাগটির লক্ষ্য। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের দেশের অতীত সমাজব্যবস্থার মৌলিকত্ব ভুলে যাই, আমাদের দেশের বহু যুগব্যাপী প্রবহমান অর্থনীতির ধারাকে উপেক্ষা করি, গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে

ওঠা কাঠামো লক্ষ্য না করি, ভারতবর্ষের অনুসৃত শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করি, তাহলে ভারতবর্ষকে প্রগতি উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা অসম্ভব। অতীতের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগসূত্র স্থাপন করে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার জন্যে আজ সারাদেশব্যাপী যে আয়োজন চলছে, আমাদের গ্রাম্য কীর্তিশালাগুলি হচ্ছে সেই আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুপ্রাচীন সভ্যতার মহান অথচ অধুনা অনগ্রসর ভারতবর্ষের জনশিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত বিস্তারে এই গ্রাম্য কীর্তিশালাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একখণ্ড মুদ্রা, একটা ভাঙ্গা শিলালিপি, পুরানো দিনের কামার-কুমোরের একটুকরো হাতের কাজ, একটা ছেঁড়া পুঁথির পাতা — একটা জাতির অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের একটা গোটা অধ্যায়কেই উন্মোচন করে দিতে পারে। কীর্তিশালায় সংগৃহীত উপাদানগুলির মাধ্যমে আমরা যে কেবল শিক্ষালাভই করি তা নয়, এইসব সংগ্রহ ও তথ্য আমাদের জানবার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে, আমাদের শিক্ষা ধারায় আনন্দের সঞ্চার করে। এই আনন্দই তো নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দেয়।'

এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করেই আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার যাত্রা শুরু। সরকারী আনুকূল্যে বা ধনীর পৃষ্ঠপোষকতায় নয় — সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েই এবং উৎসাহীদের স্বল্প সাহায্যের উপর নির্ভর করেই এই কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকে। প্রতিষ্ঠানের জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রদত্ত মাত্র চার-পাঁচটি দ্রব্য নিয়েই কীর্তিশালার প্রথম পদক্ষেপ, তারপর গ্রাম-গ্রামান্তরে সন্ধান ও সংগ্রহের পালা। আর এইভাবেই এই সংগ্রহশালার তদানীন্তন স্বেচ্ছাশ্রমী কিউরেটর তাঁর একক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেন বহু পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যের নিদর্শন। প্রতিটি পালপার্বণে অনুষ্ঠিত গ্রাম্য মেলা থেকে ক্রয় করা হয় বিভিন্ন লোকশিল্পের ও হস্তশিল্পের সম্ভার। আগ্রহীরাও অবশ্য পিছিয়ে থাকেন নি। তাঁদের অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু মূল্যবান দ্রব্য এই কীর্তিশালায় দান করেছেন এবং এইভাবেই আজ এই কীর্তিশালায় সংগৃহীত হয়েছে প্রায় আট-দশ হাজার বস্তুর এক মূল্যবান সম্ভার।

কীর্তিশালায় এইসব সংগ্রহের পাশাপাশি চলতে থাকে অনুসন্ধান কার্য। তারই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, এই কীর্তিশালা একদা হাওড়া জেলার রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত এক প্রাচীন জনপদ হরিনারায়ণপুর গ্রামের পুরাতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাছাড়া ঐখানের পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেছে পাল-সেন যুগের বহু পুরাবস্তুর নিদর্শন—যা এই সংগ্রহশালার এক মহামূল্যবান সম্পদ। এ ছাড়া পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকেও যে সব মূল্যবান পুরাবস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে — সেই সব পোড়ামাটির মূর্তিকা ও ফলক, লিপিফলক, মৃৎপাত্র ও সেকালের পুতুল-খেলনা এই কীর্তিশালায় প্রদর্শিত হয়েছে। আর এই সঙ্গেই তুলে ধরা হয়েছে মৌর্য যুগ থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত তার ধারাবাহিকতার ইতিহাস। মানচিত্র দিয়ে দেখানো হয়েছে পশ্চিমবাংলার নদীমাতৃক সভ্যতার প্রাচীন জনপদগুলির অবস্থান ও সেই সঙ্গে প্রাপ্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্যময় নিদর্শন। সাল তারিখের নীরস কচকচির বৃত্তান্ত নয় — বঙ্গ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এইসব প্রাচীনতম নিদর্শন দেখে

গ্রামবাসীরা যাতে তাঁদের অতীত জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পাবেন, শ্রদ্ধাবান হতে পারেন সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে প্রদর্শিত এইসব দ্রব্যের মাধ্যমে।

এছাড়া পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহের মধ্যে কিছু পাথরের মূর্তিও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে পশ্চিম বাংলা থেকে পাওয়া গেছে নবম-দশম শতকের ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্তি, জৈনমূর্তি, মহিষমর্দিনী মূর্তি, সূর্য মূর্তি, দ্বাদশ শতকের উমালিঙ্গন মূর্তি ও বিষ্ণুপট্ট এবং বিহার থেকে পাওয়া গেছে দশম শতকের তিনটি বুদ্ধমূর্তি।

কীর্তিশালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক। আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দিরগুলি আজ অবহেলিত। তাই অনাদরে ও অযত্নে এগুলির অধিকাংশই আজ ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান। আর কত যে মন্দির এরই মধ্যে ভগ্নদশায় থেকে মৃত্যুবরণ করেছে — তার সংখ্যাও জানা নেই। সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রতিষ্ঠিত এমন সব বহু মন্দিরেই অপূর্ব পোড়ামাটির ফলক-সজ্জা বর্তমান ছিল। কালের গতিতে যে সব মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে — সেখান থেকেই এইসব পোড়ামাটির ফলক সংগ্রহ করা হয়েছে। আর এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে তদানীন্তন বাংলার জীবন-ধারার চিত্র, বৃত্তিময় জীবনের অধিকারী মানুষদের পরিশ্রমের স্বাক্ষরযুক্ত ও বিদেশী সাহেবদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনধারার চিত্র। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনীর চিত্রায়িত ফলকও এই কীর্তিশালার এক বিশেষ আকর্ষণ।

এতো গেল মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত ফলক সংগ্রহের কথা। অন্যদিকে আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় এমন কত মন্দির ছিল বা বর্তমানে কতগুলি মন্দিরই বা অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে কোন আদমশুমার কেউ করেনি। তাই ভবিষ্যতে যাতে গবেষকরা এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে গবেষণার সুযোগ পান, সেজন্য এই কীর্তিশালার পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলার যাবতীয় মন্দির-মসজিদের বিবরণ নথিবদ্ধ করার এক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেই প্রকল্প অনুসারে মন্দির-মসজিদের বিবরণ জেলাওয়ারীভাবে কার্ড-ক্যাটালগ পদ্ধতিতে প্রতিটি পুরাকীর্তি সম্পর্কে পৃথক কার্ডে সংক্ষেপে যাবতীয় তথ্য ও একটি ছোট আলোকচিত্র রাখা হচ্ছে। এই বিষয়ে কীর্তিশালা, পরলোকগত ডেভিড ম্যাককাচ্চন ও অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছেন। আর এরই ফলে পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাগুলির মন্দির-মসজিদের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ তালিকা শেষ করা হয়েছে বা বাকীগুলিরও যথসম্ভব দ্রুত শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে। আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা কর্তৃক সংগৃহীত এই বিশদ তথ্যপঞ্জীটি যে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে একটি মহামূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে আদৃত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন মুদ্রার সংগ্রহও এই কীর্তিশালার এক সম্পদ। মৌর্য-শুঙ্গ যুগের এবং পরবর্তী মোগল ও ব্রিটিশ আমলের বহু মুদ্রা এই মিউজিয়ামের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

কাঠের কাজের নিদর্শনও সংগৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে রথসজ্জায় ব্যবহৃত কাঠের মূর্তি, হয়ত তা একদিন সারথির কাজ করতো; চণ্ডীমণ্ডপে ব্যবহৃত লতাপাতার খোদাই যুক্ত বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন আকারের তিন-চারটি ব্রাকেট, কাঠের সিংহাসনে ব্যবহৃত শার্দূলমুখী রেলিং এবং সেই সঙ্গে রেলিংয়ে ব্যবহৃত যৌবনদীপ্ত নারীর শারীরিক ক্রীড়ারত

মূর্তি ও শিব মন্দিরে উৎসর্গীকৃত কাঠের বৃষমূর্তি। এ সবই বাংলার সূত্রধর সমাজের সেই সূক্ষ্ম তক্ষণ নৈপুণ্যের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা একান্তই স্মরণ করিয়ে দেয়। কাঠের কাজের সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর এক সংগ্রহ হল কাঠের বুদ্ধমূর্তি। এটি হাওড়ার গোন্দলপাড়ার এক জোড়বাংলা মন্দিরে রাখা ছিল। মূর্তিটি এদেশীয় নয়। সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন স্থান থেকে আনা হয়ে থাকবে; কারণ ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের মধ্যে কোন একজন বহুদিন আগে কাঠের ব্যবসা সূত্রে এটি পেয়ে ঐভাবেই মন্দিরে রেখে দেন। বর্তমানে এই মূর্তিটি সংগ্রহ করে কীর্তিশালায় দান করে একান্তই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহের পরেই এই কীর্তিশালায় সংগৃহীত হয়েছে লোকশিল্পের অনবদ্য সম্ভার। বিভিন্ন জেলায় কুম্ভকার সম্প্রদায়ের তৈরি বিভিন্ন ধরনের যে সব খেলনা-পুতুল সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের একান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের মনসার ঘট, লক্ষ্মী-গণেশের ঘট, প্রদীপ, খেলনা — এইসব বস্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় আমাদের প্রাচীনকালে ব্যবহৃত পোড়ামাটির বিভিন্ন দ্রব্যের সেই ধারাবাহিকতার এক স্পষ্ট নিদর্শন। এছাড়া আঞ্চলিক বিশিষ্টতার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ যা এই কীর্তিশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তা হল তুলসীমঞ্চ। আটকোনা বা চারকোনা ধরনে তৈরি এই তুলসীমঞ্চ — যার ভিতরটি ফাঁপা এবং গায়ে লাগান থাকে নানান ধরনের পুতুল। গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনাগ্রহের মধ্যেই কুম্ভকার সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এই শিল্পটি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়।

কুম্ভকারদের পুতুলের মত সংগ্রহ হয়েছে চিত্রকর-পটুয়াদের তৈরি চিত্র-বিচিত্রিত নানান ধরনের পুতুল। এই সব পটুয়া-চিত্রকরদের তৈরি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট খানি জড়ানো পটও পাওয়া গেছে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এছাড়া দু'খানি প্রাচীন চক্ষুদান পটও এই মিউজিয়ামের সংগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় সন্দেশ ও আমসত্ত্বের ছাঁচের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। এই ছাঁচগুলির নক্সার মধ্যে আমাদের গ্রাম্য ব্রত-পার্বণে ব্যবহৃত আলপনার যেমন প্রভাব বিদ্যমান, তেমনিই প্রাচীন বালুচরী শাড়ীর গায়ে প্রথাগত নক্সায় উৎকীর্ণ তাম্রকূট সেবনরত মানুষের চিত্রের সঙ্গে সংগৃহীত এই সব ছাঁচের খোদাই চিত্রও তুলনীয় হতে পারে।

এছাড়া লোকশিল্পের আর এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নক্সী কাঁথা — যা এই কীর্তিশালাতেও কয়েকটি সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির প্রাপ্তিস্থান যেমন পূর্ববাংলার যশোর-খুলনা ও ফরিদপুর, তেমনি পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগনা ও হাওড়া জেলাও আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, বঙ্গ সংস্কৃতির আর এক অনাদৃত উপকরণ সংগ্রহ সম্পর্কে। পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলার বঙ্গললনারা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে ও বিবাহাদিতে সজ্জার কাজে নরুণ দিয়ে সূক্ষ্মভাবে কাগজ কেটে যে চিত্র প্রস্তুত করতেন — তার দু একটি নিদর্শন এই কীর্তিশালায় পাওয়া গেছে — যা বঙ্গ সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে গণ্য হতে পারে।

পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির বহু

উপকরণই আজ লুপ্ত হতে চলেছে। তবুও এরই মধ্যে পিতল ও কাঁসার কাজ এবং ঢোকরাদের কাজ — বহু মূর্তি, খেলনা এবং গৃহশিল্প সামগ্রীর উপকরণ এই কীর্তিশালা সংগ্রহ করেছে। তাছাড়া দেড়শোর বেশি বাংলা পুঁথি (এর মধ্যে গোটা দুই অপ্রকাশিত) এবং দুটি চিত্রিত পুঁথির পাটাও এই কীর্তিশালার এক সম্পদ। মানুষ কেনা-বেচার দলিল, একশত বৎসরের পুরোনো দুর্গোৎসবের হিসেবের কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি যা এই কীর্তিশালার সংগ্রহে আছে — তা সেই পুরানো বাংলার এক জীবন্ত সমাজচিত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সংগ্রহশালায় প্রথমদিকে বেতনভূক কোন কর্মী ছিলেন না। পূর্বে একজন অভিজ্ঞ কিউরেটর ছিলেন। স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে এবং চাঁদা তুলেই প্রথমদিকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হত, কিন্তু তুলনায় তা সামান্যই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যে অনুদান পাওয়া যায়, তা পর্যাপ্ত নয়। ১৯৬৯-৭০ সালে গৃহনির্মাণ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার২৩, ৫০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন। সেইমত প্রায় ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কীর্তিশালার নতুন গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং বিগত ২৩শে এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় কর্তৃক এই ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হযেছে। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে কীর্তিশালা গৃহ দ্বিতলে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। খুবই আনন্দের কথা যে, সম্প্রতি এই কীর্তিশালাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে জেলা সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কীর্তিশালার পক্ষ থেকে এযাবৎ যেসব মূল্যবান গ্রন্থ ও স্মারক পত্র প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা হল ঃ

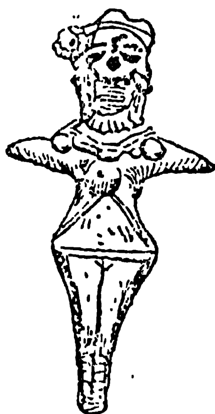
(১) একটি দ্বিভাষিক চিত্রিত ফোল্ডার
(২) বাংলার দারু ভাস্কর্য
(৩) আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা প্রদর্শিকা
(৪) জাদুঘরের ঘরানায়
(৫) Howrah In Perspective : Tradition & Culture.
(৬) Call to A House of Treasures : Ananda Niketan Kirtishala.
(৭) Ananda Niketan Kirtishala : A Rural museum.

রবীন্দ্রনাথ একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন বিদেশের বিভিন্ন ধরনের মিউজিয়ামের কার্যকলাপ দেখে। মিউজিয়াম কীভাবে দেশের যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, '*বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথি পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বার আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই একথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড় বড় শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচর।*' প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার সার্বজনীন অবদানকে সংগ্রহশালার মাধ্যমে

তুলে ধরে আপামর জনসাধারণের জীবনকে দৈন্যের তলা থেকে মুক্ত ও সুন্দর করে তোলার এই প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন — তার দিকে আজও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পৌঁছয়নি (দ্রঃ পরিশিষ্ট ঘ, 'রবীন্দ্রনাথ ও জনশিক্ষায় মিউজিয়াম')।

সেক্ষেত্রে আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার কর্মীরা বঙ্গ সংস্কৃতির মহামূল্য সম্ভারের এই নিদর্শন নিয়ে যে জনশিক্ষার আয়োজন করেছেন — তা আজ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনারই এক সফল রূপায়ণ। বাংলার সংস্কৃতি সাধনায় আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার অবদান বাঙ্গালীর ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। ☐

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ কর্মকারের মূর্তি (খ্রীঃ ১৮শ শতক)]





॥ ৫ ॥

অমূল্য প্রত্নশালা ঃ রাজবলহাট

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার ইতিহাস রচনায় উদাসীনতার অভিযোগে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব মাটির উপরিভাগে পড়িয়া আছে। অনায়াসেই খুঁজিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু খুঁজিবার লোক কই? অনেকের আগ্রহ আছে শক্তি নাই, অনেকের শক্তি আছে আগ্রহ নাই, অনেকে ঘরে বসিয়া কাজ করেন, বাহিরে ঘুরিতে পারেন না; অনেকে বাহিরে ঘুরিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের চোখ পরিস্ফুট হয় নাই। আবার একদল আছেন, তাঁহারা কাজ করুন বা না করুন নিজের জয়ধ্বনি নিজে করিয়া লোকের কান কালা করিয়া দেন; বিদ্যা থাকুক বা নাই থাকুক, বিদ্যার পুরস্কারগুলির দিকে লোলুপ নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন।'

বহুদিন পূর্বে শাস্ত্রী মহাশয় যে আক্ষেপ করে গেছেন, আজ একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও যে একান্তভাবেই তা প্রযোজ্য হতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজও দেশের ইতিহাস রচনায় গবেষক সংখ্যার যে অনুপাতে বৃদ্ধি ঘটেছে সে অনুপাতে সরজমিন সন্ধান ও সংগ্রহের দিকে কিছুমাত্র নজর পড়েনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান ও সংগ্রহের ইচ্ছায় একান্তভাবেই কিছু কিছু সংস্কৃতিবান কর্মী গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে

বেড়িয়েছেন এবং বাংলার অবহেলিত কৃষ্টি সম্পদগুলি উদ্ধার করে তা একটি মিউজিয়ামে রূপ দেবার যে চেষ্টা করেছেন — এমন উদাহরণও বিরল নয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে হয়ত তাঁদের 'চোখ পরিস্ফুট হয় নাই', কিন্তু তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গেই যে তাঁদের দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে সংগৃহীত বঙ্গ সংস্কৃতির নিদর্শনের বহুমূল্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন — যা আজ পশ্চিম বাংলার একান্তই গৌরবের বলে বিবেচিত হতে পারে। এইসব উদ্যোগী ব্যক্তিদের একজন হলেন স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার; যাঁর উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় বঙ্গ সংস্কৃতির এমন অনেক অমূল্য উপাদানে সংগঠিত হয়েছে রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালা। অত্যন্ত দুঃখের কথা, কয়েক বছর পূর্বে গুরুতরভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু স্বর্গত মজুমদার তাঁর সৃষ্ট এই অমূল্য প্রত্নশালার যে অবদান রেখে গেলেন তার মধ্যেই তিনি বাঙ্গালীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সামাজিক কৌলিন্য বা পদ মর্যাদার অভাব যে বঙ্গ সংস্কৃতি অনুসন্ধানের কিছুমাত্র অন্তরায় নয়, স্বর্গত ধীরেনবাবুর প্রচেষ্টাই তার বড়ো প্রমাণ এবং এ সম্পর্কে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবন কাহিনীর বিশ্লেষণ করে যা লিখেছেন তা একান্তই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "ধীরেনবাবুর শৈশব অতিবাহিত হয় বিহারের বিভিন্ন স্থানে, যেখানে তাঁর বাবা চুণ ইত্যাদির কারবারে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসা পড়ে যাওয়ায় রাজবলহাট থেকে তিন-চার মাইল দূরে, মার্টিন রেলের হাওয়াখানা স্টেশনের অদূরে, জয়রামপুর গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাড়ীতে তাঁরা ফিরে আসেন। দারুণ দারিদ্রের জন্যে, ধীরেনবাবু স্কুলের দশম শ্রেণীর বেশী পড়াশুনা করতে পারেন নি, অর্থাভাবই তাঁকে যে কোন চাকুরি নিতে বাধ্য করে এবং তাঁর প্রথম চাকুরি জোটে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ লাইব্রেরীর দপ্তরীর কাজ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে স্বর্গীয় মেঘনাদ সাহা তাঁকে বসু বিজ্ঞান মন্দির গ্রন্থাগারের ক্যাটালগিং-এর ভার দেন। আজ অবসর গ্রহণের কয়েকমাস আগে, তিনি সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক মাত্র। আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত অর্থে তিনি সাধারণ মানুষ হলেও অসাধারণ অধ্যবসায়ে সৃষ্ট তাঁর 'অমূল্য প্রত্নশালা'র পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহতো মহীয়ান। প্রতিষ্ঠানটির বিবরণ থেকেই সে কথা প্রমাণিত হবে।" (দেশ, ৪ চৈত্র ১৩৭৮, পৃঃ ৬৭৬)।

ধীরেনবাবু হঠাৎই কেন এই পুরাতত্ত্বের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠলেন সে সম্পর্কে জানা গেছে, 'বিহারে থাকাকালীন তিনি নাকি একবার বুদ্ধগয়ার কাছে দু তিন সের পুরনো মুদ্রা সস্তায় সের দরে খরিদ করেন। বিক্রেতা ধুলোবালি মাখা সে ঐশ্বর্যের মূল্য কিছুই জানত না।' সুতরাং এই ভাবেই ধীরেনবাবু তাঁর প্রথম সংগ্রহের মূল্য সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে, বঙ্গ সংস্কৃতির অবহেলিত সম্পদের অন্বেষণ ও প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেন এবং গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে এইসব সম্পদ সংগ্রহের কাজে ব্রতী হন।

অমূল্য প্রত্নশালায় এইভাবেই সংগৃহীত হয় বঙ্গ সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ, কিন্তু তার নামকরণের এক ইতিহাস আছে। এটির নামকরণের মূলে আছে স্বনামধন্য পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণের স্মৃতি। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের সময়ে কলকাতা ছেড়ে বিদ্যাভূষণ মশাই যখন

এখানে সাময়িকভাবে বসবাসের জন্যে আসেন — তখন এখানের কর্মিবৃন্দের সঙ্গে একদিকে যেমন তাঁর মধুর পরিচয় গড়ে ওঠে, অন্যদিকে তাঁরই উৎসাহে এখানকার কর্মীরা একান্তভাবেই স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েন। রাজবলহাটের পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিটায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বিধায় যেমন এখানে একদিন তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে হেমচন্দ্র পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি পরবর্তীকালে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতিরক্ষার্থে এই পাঠাগার ভবনের একাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় অমূল্য প্রত্নশালা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধীরেনবাবু প্রথমদিকে বুদ্ধগয়ায় মূল্যবান মুদ্রা সংগ্রহ করার মধ্য দিয়েই পুরাতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন — তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো মুদ্রা সংগ্রহের দিকে এবং এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায় এই সংগ্রহশালাতেও বিশেষভাবে সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন আমলের বহুতর মুদ্রার সম্ভার। এর মধ্যে পাঞ্চমার্ক মুদ্রাই আছে পঁচিশটি, কুষাণ যুগের মুদ্রা আটটি, মোগল বাদশাহ ও দিল্লীর সুলতানদের আমলের মুদ্রা একশটি ও সেই সঙ্গে আরও অনেক প্রাচীন মুদ্রা — যার সর্বমোট সংখ্যা হবে প্রায় তিনশো। এছাড়া আছে ব্রিটিশ যুগের এবং দেশীয় রাজাদের মুদ্রা — যার সর্বসাকুল্য সংখ্যা হবে বারোশোর মত। অমূল্য প্রত্নশালায় মুদ্রার এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহে ধীরেনবাবুর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

পাল-সেন আমলের ভগ্ন-অভগ্ন আট-দশটি পাথরের মূর্তি ভাস্কর্য এবং পাথরের লিপি ফলক এই সংগ্রহশালার এক উল্লেখযোগ সম্পদ। এখানে সংগৃহীত পাথরের এক নবগ্রহ ফলকের প্রাপ্তিস্থান হলো হাওড়ার দাশনগরের কাছাকাছি বাঁকড়া গ্রাম। এই গ্রামের শেঠের পুকুর খনন কালে এই নবগ্রহ মূর্তি খোদিত ফলকটি পাওয়া যায়। স্বভাবতই এই মূর্তি-ফলক প্রাচীন মন্দিরের দ্বারশীর্ষে ব্যবহৃত হত। সুতরাং একথা অনুমান করে নিতে কোন কষ্টই হয় না যে, এই ফলক প্রাপ্তিস্থানের কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান ছিল। বাঁকড়ার কাছাকাছি কোন প্রাচীন মন্দিরের অবস্থানের কথা চিন্তা করে হাওড়ার গ্রামীণ সংগ্রহশালা আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার পক্ষ থেকে এক অনুসন্ধান চালানো হয়। এর ফলে দেখা যায়, এই গ্রামটির আশপাশে বহু বিষ্ণু ও সূর্য মূর্তি মন্দিরে পূজিত হচ্ছে। একদা প্রাচীন সরস্বতী নদী এইসব স্থান দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্যে এরই তীরভূমিতে যে সব জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং সেই সূত্রে তথায় যে সব বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরাদি গড়ে উঠেছিল—বর্তমানের এই পুরাবস্তু সেইসব ধারণার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালায় এই নবগ্রহ ফলকের সংগ্রহ তাই হাওড়া জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধিতে একান্তই সহায়ক হয়েছে।

রাজবলহাটের এই সংগ্রহশালায় কাঠের কাজের যে সব নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে তা দেখে আঞ্চলিক সূত্রধর সমাজের কারিগরী নৈপুণ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নৈপুণ্যের এক বড়ো উদাহরণ হলো, কাছাকাছি আঁটপুর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের কাঠখোদাইয়ের অপূর্ব সব নিদর্শন। এঁদের এই সংগ্রহশালায় কাঠের কাজের সংগ্রহের মধ্যে আছে আরামবাগের কাছাকাছি ভেলে গ্রামের মন্দির-দরজার একাংশ। ঐ মন্দির দরজায় অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে খোদিত হয়েছে বিষ্ণু, বিশালাক্ষী, কালী ও মহিষমর্দিনীর প্যানেল। কাঠের

দরজা ছাড়াও আরও যে সব কাঠের কাজের নিদর্শন সংগ্রহ হয়েছে তা হল, কাঠের রথসজ্জায় ব্যবহৃত পুতুল। বাংলার এইসব রথের গায়ে ব্যবহৃত কাঠের কাজের এমন কত অপূর্ব সব নিদর্শনই যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ঠিক এমনভাবেই রাজবলহাটের অদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর তীরবর্তী পলিয়াড়া গ্রামের ছত্রেশ্বরী দেবীর বিখ্যাত রথটি যখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়, তখন এই সংগ্রহশালার কর্মীরা এখান থেকে কাঠের সারথি মূর্তি এবং কাঠের পরীমূর্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। তবে এই সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রথের গায়ে কাঠের ওপর তেলরঙে আঁকা চিত্র — যা রথসজ্জায় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। এইসব চিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো হলো, রাধাকৃষ্ণ ও বাদ্যযন্ত্র বাদিকাদের চিত্র প্রভৃতি। এইসব চিত্রবিদ্যার যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরাই হলেন কাঠের রথ ও পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণের কারিগর বাংলার সূত্রধর সম্প্রদায়। বাংলার চিত্রশিল্পের জগতে যে সব শিল্পীরা চিত্রবিদ্যায় তাঁদের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁরা হলেন বাংলার চিত্রকর-পটুয়া সম্প্রদায়, যাঁদের সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন জড়ানো পটের নমুনা এই সংগ্রহশালায় রয়েছে এবং অন্যদিকে পুঁথির পাটায় ও রথের গায়ে চিত্রাঙ্কনে অংশগ্রহণকারী শিল্পী হিসেবে ছিলেন এইসব সূত্রধর সম্প্রদায়। সুতরাং অমূল্য প্রত্নশালায় রথের গায়ে অঙ্কিত চিত্রের এই সংগ্রহ নিঃসন্দেহে চিত্রবিদ্যার গবেষণায় একান্ত উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আঁটপুর যেমন কাঠের কাজের নিদর্শনের জন্যে বিখ্যাত, তেমনিই বিখ্যাত তার পোড়ামাটির মন্দির ঐতিহ্যের জন্যে। অমূল্য প্রত্নশালায় আসতে গেলে এ'দুটিও স্বচ্ছন্দে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া অমূল্য প্রত্নশালার গ্রাম রাজবলহাটেও এমন দু'একটি পোড়ামাটির ফলকসজ্জিত মন্দিরও আছে যা একান্তই দর্শনীয় এবং সেইসঙ্গে এই সংগ্রহশালাতেও সংগৃহীত হয়েছে এতদঞ্চলের ভগ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক। বোঝা যায়, হুগলী জেলার এই প্রান্তেও একদা বিত্তবানেরা যে সব মন্দির-দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন তারই স্মৃতিচিহ্ন এইসব ফলকগুলি সেই প্রাচীন গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গ্রাম-শহরের এইসব ছোট-বড় সংগ্রহশালায় মন্দির-গাত্রে ব্যবহৃত পোড়ামাটির যে সব ফলক সংগ্রহ হয়েছে তার এক বিবরণপূর্ণ তালিকা কোনদিন প্রকাশিত হলে বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য বিবরণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে — যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

পরিশেষে এই সংগ্রহশালার সংগ্রহে আছে ঢোকরা কামারদের তৈরি পিতলের প্রায় পঞ্চাশটি শিল্প নিদর্শন, তিরিশটির মত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি এবং লোকশিল্পের নিদর্শন বহু রকমের পুতুল-সরা প্রভৃতি। এছাড়া বিখ্যাত ব্যক্তিদের ডায়েরী, চিঠি ও হাতের লেখার নিদর্শনগুলিও এই সংগ্রহশালার আর এক সম্পদ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ডায়েরী এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আর্চায প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও পুরাতাত্ত্বিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখের চিঠিপত্র ও হস্তাক্ষর প্রভৃতি এখানে সংগৃহীত হয়েছে।

একদা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে এই সংগ্রহশালার কর্মীরা এতই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন

যে, একদা তারা গড়-ভবানীপুর অঞ্চলে বেসরকারী খননকার্যও সংগঠিত করেন। খননকার্যের নীতিগত কলাকৌশলের পটুত্ব অর্জন না করেও, তাঁরা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাকে স্বাগত না জানালেও তাঁদের উদ্যমের একান্ত প্রশংসা করতে হয়। এই খননকার্যে তাঁরা যে সব পুরাবস্তু প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিগত দিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি সচিত্র প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন।

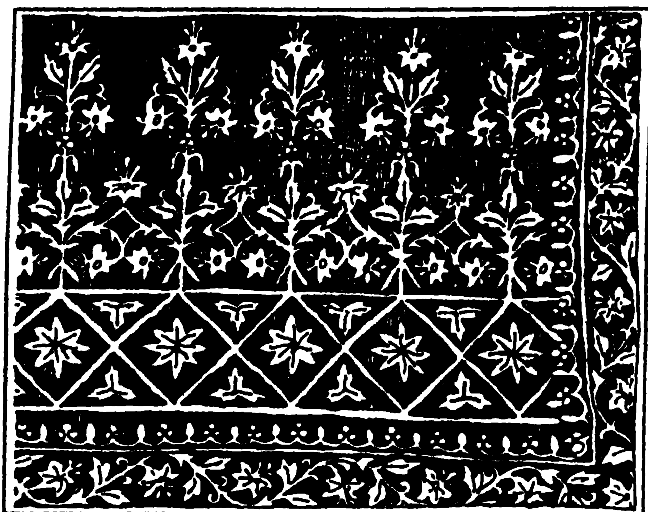
রাজবলহাটের অমূল্য প্রত্নশালা দেখতে আসার আরও যে বিশেষ এক আকর্ষণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল আঁটপুরের পোড়ামাটির ভাস্কর্যখচিত মন্দির আর কাঠের কাজের নক্সায় বিভূষিত চণ্ডীমণ্ডপ। কিন্তু এখানের আরও একটা আকর্ষণীয় জিনিস ছিল যা দর্শনার্থী ভ্রমণ পথিকের ভ্রমণতৃষ্ণা নিবারণে সাহায্য করতো তা হল, তার ছোট রেলের দুলুনি তোলা রেলগাড়ী, খাল-খন্দর, জলা-মাঠ, লোকের উঠোন, খামার বাড়ি আর মন্দির-দেবালয়ের উপর দিয়ে একান্ত গ্রাম্যভাবেই এঁকে বেঁকে চলে আসতো। কিন্তু হাওড়ার মার্টিন রেলের সেই ছোটগাড়ী আজ বন্ধ। নাগরিক সভ্যতা আণবিক ও পারমাণবিক যুগ থেকে মহাকাশ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে তার দুর্মদ অগ্রগতির তালে তালে পা ফেলে। সুতরাং সেখানে তার এই দুলকি তালের যাত্রায় কর্মব্যস্ত মানুষের মন ভরে না। কিন্তু ভ্রমণ রসিকদের যে তাতেই তৃপ্তি ছিল, তাতে চেপেই গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আঁটপুরে আসা যেত, তারপর সেখান থেকে যাওয়া যেতে পারতো রাজবলহাটে।

কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই এখানে আসার। রাজবলহাটে আসতে হলে ইস্টার্ন রেলের তারকেশ্বরের ট্রেনে হরিপাল, তারপর বাসে আঁটপুরের উপর দিয়ে পৌঁছুতে হয়, গ্রাম চলতি ছড়ায় বর্ণিত সেই 'চার চক, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট, এই নিয়ে হয় রাজবলহাট।'

একদা রাজবলহাট শিল্প সংস্কৃতির এবং সমৃদ্ধির অনেক গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু সহায় সম্বলহীন অবস্থায়, সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আজ প্রায় ষাট বছর ধরে বঙ্গ সংস্কৃতির গৌরব রক্ষায় অমূল্য প্রত্নশালার কর্মীরা যে সাধনা করে এসেছেন তার গৌরব কি কম? এই সংগ্রহশালার অন্যতম উদ্যোগী স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার দক্ষিণ রাঢ়ের পুরাকীর্তি রক্ষার জন্যে অমূল্য প্রত্নশালার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তা বাস্তবের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করার দায়িত্ব বর্তেছে ভাবীকালের সমাজের উপর। সেই ভাবীকালের মানুষ তাঁর আরব্ধ কাজটিকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়ে গড়ে তুলবেন অমূল্য প্রত্নশালা, তার অমূল্য বিষয়বস্তু নিয়ে — দেশবাসীর তাই একান্ত কামনা। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি কাঠখোদাই বিশালাক্ষীর মূর্তি ফলক (খ্রী ঃ ১৮শ শতক)]





।।৬।।

সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা ঃ পশ্চিমবঙ্গ

আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে ২১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এব বাড়ীটির সামনে একটি দেওয়াল পত্রে (পোস্টার) লেখা থাকতো ঃ 'বঙ্গদেশ সরকারের শিল্প যাদুঘর — শিক্ষা, তথ্য, অনুপ্রেরণা, সেবা, প্রগতি, অর্থনীতি এবং জনসাধারণকে যাদুঘরমুখী করার জন্যে।' সে সময়ে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামের এই অভিনব উদ্যোগ যে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা করতো — তা বোঝা যায় উদ্বোধনের দু'মাসের মধ্যেই এই সংগ্রহশালায় প্রায় লক্ষাধিক জনসমাগমের হিসেব থেকে। সংগ্রহশালার মাধ্যমে বঙ্গদেশের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির বিবরণ জনসমক্ষে তুলে ধরার এই কৃতিত্বের জন্যে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেকালের প্রতিটি সংবাদপত্রই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

এ সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হয় বিগত ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে, ২১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ের ভাড়া বাড়ীতে। উদ্বোধন দিবসের অনুষ্ঠানে তৎকালীন অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব ঘোষণা করলেন যে, বঙ্গভূমির শিল্প-সম্পদ কি আছে বা না আছে তা সবাই জানুক এখানে এসে, আর তার সঙ্গে কীভাবে এই শিল্পকে পুনর্গঠিত করে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির বনিয়াদ রচনা করা যায় — তার সুযোগ লাভ করুক এই মিউজিয়াম দেখে আর সেই সঙ্গে বাঁচুক বাংলার শিল্প ও শিল্পী। সে সময়ের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গের মধ্যে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারও এই সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেন, এই মিউজিয়াম বাংলার একটি

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হবে, যেখানে তার শিল্প ও গ্রামীণ কারুকলার ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিচয় থাকবে, যেখানে শুধু বাজার সম্পর্কে তার ধারণাই দেবে না, তুলে ধরবে সেইসব দেশী-বিদেশী উৎপাদকের ও বিক্রেতাদের প্রকৃত অবস্থা ও পরিচয়। সুতরাং আমাদের দেশের যাবতীয় কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতির যথার্থ উন্নতি এইভাবেই ও এই পথেই সূচিত হতে পারে এবং অন্যদিকে এরই মধ্যে দিয়ে এই সংগ্রহশালা লোকশিক্ষার এবং কল্পনার ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

মূলতঃ এই আদর্শকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল তদানীন্তন বঙ্গদেশ সরকারের এই শিল্প সংগ্রহশালা। তাই আমাদের আবহমান কালের কুটিরশিল্পের নিদর্শন এবং বর্তমান কালের হস্তশিল্পের নিদর্শন এবং সেইসঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পেরও বহু নিদর্শন এখানে সংগ্রহ করা হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা এইসব শিল্পসম্ভার এই সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়ে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যকে নতুন করে উপলব্ধি করার সুযোগ এনে দেয়। বাংলার শিল্প ও শিল্পীর শিল্পকৃতি সংগৃহীত হয়ে ক্রমেই এই সংগ্রহশালা পরিপুষ্ট হতে থাকে।

এইজন্যই সেদিন এই সংগ্রহশালায় এত দর্শকের সমাগম ঘটেছে। শুধু দেশের সাধারণ নাগরিকই নয়, দেশের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষেরাও এই সংগ্রহশালা পরিদর্শনে এসেছেন। এইসব উল্লেখযোগ্য দর্শকের মধ্যে আছেন, সরোজিনী নাইডু, যিনি এই সংগ্রহশালার প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'Versatile Range' (অমৃতবাজার পত্রিকা ১০-৫-৩৯)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে মন্তব্য করে বলেছিলেন যে, আমাদের দেশে খুব কম যুবকই আছেন যাঁরা ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার শিল্প সম্পদের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খবরাখবর রাখেন এবং তাঁদের আমি এই সংগ্রহশালা পরিদর্শন করে কীভাবে আমাদের দেশের শিল্প সম্পদের সম্ভাবনাকে গড়ে তুলতে পারা যায় তার একটা সঠিক ধারণা করার জন্যে এই সংগ্রহশালায় আসতে বলি এবং এই শিল্পোদ্যম ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার এবং দেশকে সমৃদ্ধিশালী করার অন্য কোন উপায় নেই' (অমৃতবাজার পত্রিকা ২৮-৫-৩৯)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দর্শকদের মধ্যে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, ১৯৩৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে। তাঁর সেদিনের এই পরিদর্শনের বর্ণনা দিয়ে সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এইদিন কবিগুরুকে স্বাগত জানালেন বঙ্গদেশ সরকারের শিল্প অধিকারের সুযোগ্য আধিকারিক সতীশচন্দ্র মিত্র। তারপর কবিগুরুকে সংগ্রহশালার গ্যালারীতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি বিশেষভাবে হাতে ও যন্ত্রে তৈরি প্রদর্শিত বস্তুর উপর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পরিদর্শন শেষে দ্বিপ্রহরে মিউজিয়াম হলে এক সভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন বঙ্গদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। কবিগুরুর আগমন উপলক্ষে এইদিন এই সভায় যে সব সাংবাদিক ও বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁরা হলেন, শিল্পমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর, অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এন. সি. সেন, আর্থার মুর, এ. এইচ. কুরেশী (সস্ত্রীক), স্যার বি. পি সিংহরায়, হাসান শহীদ সুরাবর্দী, কাশিমবাজারের মহারাজা, তুষারকান্তি ঘোষ, বি. সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, জানকীজীবন ঘোষ, এল. পি. এ্যাটকিনসন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়,

প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খগেন্দ্রনাথ সেন, অমল হোম, অনিলকুমার চন্দ এবং গুরুসদয় দত্ত আই.সি এস. প্রমুখ। এই মিউজিয়ম পরিদর্শন শেষে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে বলিষ্ঠ ভিত্তি স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে।'

এর পরের পর্যায়ে সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ সংগ্রহশালার কাজের ধারাকে প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেরা কজনই বা আসেন নগরের এই সংগ্রহশালায়, অথচ তাঁদের কাছে দেশের গৌরব তুলে ধরে উৎসাহিত করার একান্ত প্রয়োজন আছে। তাই সংগ্রহশালার পক্ষে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে — গ্রাম-গ্রামান্তরে বাংলার শিল্প সম্পদকে দেখাবার জন্যে, উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে। এখনকার মত রাস্তাঘাট সেকালে ছিল না, না ছিল পারাপারের উপযুক্ত সেতু — তবুও এইসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বাংলার শিল্পগৌরবকে গ্রামের মানুষের কাছে তুলে ধরার যে প্রচেষ্টা সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ করেছিলেন — তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে হয়।

শিল্প সংগ্রহশালার এ ইতিহাস একান্তই পরাধীনতা যুগের। তারপর একদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এ সংগ্রহশালা এখন হয়েছে, 'সরকারী শিল্প বাণিজ্য সংগ্রহশালা ঃ পশ্চিমবঙ্গ।' ১৯৫৯ সাল নাগাদ সংগ্রহশালা উঠে এসেছে ৪৫নং গণেশ চন্দ্র এভিনিউয়ের বাড়ীর তিনতলায়। এখানে আসতে হলে কোন প্রবেশ মূল্য লাগে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যকালীন সময়মত খোলা থাকে এবং ঘোষিত ছুটিছাটায় বন্ধ থাকে। শিল্প বাণিজ্যের জগতে এই সংগ্রহশালা যে সব কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে, তা হল ঃ কোন্ শিল্পের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে তার পরিচয় তুলে ধরা, উৎপাদিত পণ্যের দেশী ও বিদেশী বাজারে কাটতির সম্ভাবনার কথা জ্ঞাত করান, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি করা এবং লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা। সুতরাং এই উদ্যোগের পূর্ণ রূপদানের জন্যে সংগ্রহশালায় যেমন তার প্রদর্শিত শিল্পদ্রব্যের নমুনা রাখা হয়েছে, অন্যদিকে আছে তথ্য সরবরাহের বিভাগ, গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ।

এ সংগ্রহশালায় যে সব জিনিস সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, উভয় বাংলার হস্তশিল্পের ও কুটিরশিল্পের বহু নমুনা। আজকের এই কারিগরী অগ্রগতির যুগে প্রদর্শিত দ্রব্যের হয়ত অনেক কিছুই আজ আর তৈরি হয় না, কিন্তু সেগুলি আজ সংগ্রহশালায় ঠাঁই পেয়ে আমাদের সামনে লুপ্ত গৌরব তুলে ধরেছে। সেদিক থেকে এখানে এলে আমরা বুঝতে পারি — আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় কি কি ছোট-বড় শিল্প আছে, কি কি হস্তশিল্প আছে, আর কি কি লোকশিল্প আছে। শুধু আছেই নয় — সেইসব শিল্পের মূলধন কিভাবে যোগান হয় এবং কতজন কর্মী সেই শিল্পে নিযুক্ত আছেন — তার পরিচয় এখানে এলে পাওয়া যেতে পারে। যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, তাঁরা দেশের এইসব সম্পদ, এইসব শিল্পের সৃষ্টি ও শিল্পীর জীবনের কথা জানবার জন্যে একান্তই উদ্যোগী হয়ে এখানে নিশ্চয়ই আসবেন। সেজন্যেই এই সংগ্রহশালার গ্যালারী বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিষয় দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল, বস্ত্র, কুটির ও হস্তশিল্প, নানাবিধ শিল্প দ্রব্যের মডেল, বাণিজ্যিক পণ্যের নমুনা এবং দেওয়ালে টাঙ্গানো তথ্যলিপি

ও প্রাচীর পত্র। এ সংগ্রহশালাকে সংগ্রহ ও বিতরণ দুই-ই করতে হয় বলেই এই বিস্তৃত আয়োজন করতে হয়েছে দর্শকদেব জন্যে।

গ্যালারীর মধ্যে পুতুল-খেলনার বিভাগে এসে পৌঁছুলে রীতিমত চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কত রকমেরই না পুতুল, কত বিভিন্ন বকম উপাদানেই না তৈরি সেগুলি, আর কত জায়গা থেকেই না সংগৃহীত। দেখে বেশ বোঝা যায়, সেই সুদীর্ঘ কালেব বঙ্গ সভ্যতার ইতিহাসে তার শিল্প দ্রব্যের বিবর্তনে উপাদান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং কীভাবে তার কারিগরী দক্ষতার উন্নতি হয়েছে। তারই সব প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে এখানে সেই সাবেককালের পোড়ামাটির পাশাপাশি কাঠ, ধাতু, গালা, ন্যাকড়া, কাগজের মণ্ড প্রভৃতি দিয়ে তৈরি অজস্র ধরনের পুতুল-খেলনা। বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির পুতুলের সেই বিখ্যাত কেন্দ্রগুলি ও সে সব জায়গায় তৈরি পুতুলগুলি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে তাদের উৎপাদন স্থানগুলির ঠিকানা যথা, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, ২৪ পরগণার জয়নগর, বীরভূমের রাজনগর, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো, মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়া, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, হুগলির উত্তরপাড়া, মালদার হরিশচন্দ্রপুর। এরই পাশাপাশি রয়েছে শান্তিনিকেতনের আর কলকাতার ন্যাকড়ার পুতুল, পুরুলিয়া আর শ্রীরামপুরের কাগজের মণ্ডথেকে তৈরি পুতুল, বর্ধমানের নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল, শান্তিনিকেতনের গালার পুতুল। যাঁরা শিল্প ও অর্থনীতি নিয়ে গবেষণারত আছেন, তাঁদের কাছে এই খেলনা পুতুল তৈরির কেন্দ্র ও তাদের মূলধন, শ্রম ও কারিগরী ঘরানার ইতিবৃত্ত খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলার পটুয়াদের আঁকা লোকশিল্পাশ্রয়ী পটচিত্র ও চিত্রিত সরাও এই সঙ্গে দেখা যেতে পারে। এগুলির সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। বীরভূম, ২৪ পরগণা, কলকাতা প্রভৃতি এলাকা থেকে আহৃত এ নিদর্শনগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নানাবর্ণে চিত্রিত ঘট, কুলো, পিঁড়ি, প্রভৃতির সংগ্রহটিও দর্শনীয়।

প্রথাগত শিল্পের সঙ্গে তাল রেখে, আধুনিক রুচিসম্মত পুতুল-খেলনা তৈরির যে প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছে একালে — তারও সব বিভিন্ন উপকরণ যথা, বাঁশ, বেত, ঝিনুক, কাঠ ও কাগজ থেকে তৈরি, এই সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, প্রাচীন ও নবীন রীতির এই সুন্দর সংমিশ্রণে সৃষ্ট দ্রব্যগুলি আজকালকার রুচিসম্মত পরিবারের গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে আদৃত হয়ে উঠেছে।

এই সংগ্রহশালায় আর এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হলো, তার বস্ত্রশিল্পের সম্ভার। বাংলার ঐতিহ্যময় বস্ত্রশিল্পের শতাধিক নিদর্শন এই সংগ্রহশালার এক গৌরব। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত কেন্দ্রগুলি থেকে সংগৃহীত অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে আছে প্রাচীন মসলিন, জামদানী, বালুচরী, নীলাম্বরী ও কশিদা। এছাড়া রেশম ও সূতোয় বোনা টাঙ্গাইল, শান্তিপুর ও ধনেখালির নানান রঙের এবং নানান নক্সার শাড়ী তো আছেই। আর তার সঙ্গে আছে 'বাটিক' প্রিন্টের নয়নমুগ্ধকর নমুনা। এই বিভাগে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হলো, তিনশো বছরের পুরানো সোনার সূতোয় বোনা শাড়ী — যা একান্তই চোখ ধাঁধানো ব্যাপার। শাড়ী-রসিকারা নিশ্চয়ই তৎপর হবেন এহেন দুর্লভবস্তুটি দর্শনের জন্যে।

বস্ত্রশিল্পের পাশাপাশি রয়েছে বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সূচীশিল্পের নমুনা — বঙ্গবালাদের সৃষ্ট নক্সী কাঁথার নিদর্শন। এরই পাশাপাশি পাওয়া যাবে এমব্রয়ডারির সুন্দব নিদর্শন। এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এমব্রয়ডারিতে প্রস্তুত দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি — যা একান্তই মুগ্ধ হয়ে তারিফ করার মতো। সত্যিই এগুলি অভিনব, কেননা এ জাতীয় শিল্পকর্ম খুব কম মিউজিয়ামেই সংগৃহীত হয়েছে।

এবারে হস্তশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গের কাঁসা-পিতল শিল্পের একটা চিত্র এখানে এলে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। এখানে খাগড়া, নবদ্বীপ, গঙ্গাজলঘাটি, ইংলিশবাজার, সিউড়ি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর-খড়ার মোকামের কাঁসা-পিতল শিল্পের ঘর-গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত শিল্প-সুষমা সমন্বিত কাঁসা-পিতলের পূজার্চনার দ্রব্যাদিও আছে। এ ছাড়াও আছে ঢোকরা-কামারদের তৈরি শিল্পসম্ভার। বলতে গেলে এ সংগ্রহশালায় ঢোকরা শিল্পের সংগ্রহটি বেশ সমৃদ্ধ। সাবেক ও নতুন — এই দুই রীতিই এখানে স্থান পেয়েছে। আর এরই সঙ্গে আছে লৌহশিল্পের নানান সাজসরঞ্জাম যা দেখে আমাদের আধুনিক সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারাটিকে একান্তই উপলব্ধি করা যায়।

মুর্শিদাবাদের গজদন্তের কারিগরী নৈপুণ্যের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই সংগ্রহশালার এক সম্পদ। অন্যদিকে শঙ্খশিল্পীদের তৈরি শিল্পের নমুনাও সংগৃহীত হয়েছে সেই বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, হাটগ্রাম আর রায়বাঘিনী থেকে। তারপর মোষের শিঙের জিনিসপত্র। এতদিন শুধু চিরুনিই তৈরি হতো মোষের শিঙ থেকে। কিন্তু বর্তমানকালে এইসব শিঙ থেকে তৈরি হচ্ছে ঘর সাজানোর দ্রব্য, পাখি, ময়ূর, বক ও চিংড়ি মাছ প্রভৃতি। এসব কাজের নিদর্শন মূলতঃ সংগ্রহ হয়েছে মেদিনীপুরের বৈষ্ণবচক ও জোত্‌ঘনশ্যাম এলাকা থেকে। মোট কথা, গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের প্রতিভা যে কত অসংখ্য দিকে নিয়োজিত — তা এই সংগ্রহশালায় না এলে বোঝা যাবে না। হস্তশিল্প বিভাগে রঙিন ঘাসের শিল্পকর্ম থেকে শুরু করে বাঁশ, বেত, পাট, শোলা, নারকোল পাতা, তালপাতা, নারকোল ছোবড়া ও নারকোল খোলার নানান রকম জিনিস; পুরুলিয়া ও উত্তরবঙ্গের মুখোশ এবং নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি বহু শিল্প সম্ভার এখানে স্থান পেয়েছে। একথা সত্যি যে, পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্পের এতবড় সংগ্রহ অন্য কোন সংগ্রহশালায় নেই বললেই চলে।

বহুদিন ধরেই আমাদের দেশ থেকে পোলো বল চালান যায় দেশ বিদেশে এবং যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয় এই শিল্পটি থেকে। অথচ এই পোলো বল তৈরি হয় বাঁশের গোড়া দিয়ে এবং তা চালান আসে পশ্চিমবাংলার একমাত্র উৎপাদন কেন্দ্র হাওড়া জেলার দেউলপুর থেকে। সুদৃশ্য-মসৃণ এই বলগুলিকে দেখে কে বলবে যে এগুলি বাঁশের গোড়া থেকে তৈরি। সরকারী শিল্প বাণিজ্য সংগ্রহশালায় এই সব খেলাধূলার ও বাদ্যযন্ত্রের সম্ভার যেমন রয়েছে, তেমনি পাশাপাশি রয়েছে বাঙ্গালীর অবসর বিনোদনের উপকরণ — সেকালের বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস। বাঙ্গালীর জীবন যাপন প্রণালীর অভিনবত্বের এক বিশেষ দিক এই বিভাগের সংগ্রহের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে।

হস্তশিল্প ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রশিল্পের অগ্রগতির বিবরণও এখানে এলে যেমনটি

পরিষ্কারভাবে জানা যাবে এমন আর কোথাও নেই। পশ্চিমবাংলার সাবান শিল্প, চর্মশিল্প, তালাচাবি প্রস্তুত শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্যের বিভিন্ন শিল্প, প্লাস্টিক-সেলুলয়েড শিল্প, রবার ও কাঁচশিল্প, হোসিয়ারী, বেকারী ও লৌহশিল্প প্রভৃতির সব রকম উল্লেখযোগ্য তথ্য ও নিদর্শন এখানে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা না উল্লেখ করলে একান্তই অপূর্ণ থেকে যাবে এবং তা হল এখানের একদা সুযোগ্য মিউজিয়াম কিউরেটর শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল শুধু তত্ত্বাবধান ও সংগঠনের মধ্যেই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, অফিসের চার দেওয়ালের বাইরে গ্রাম-গ্রামান্তরে সরজমিন তদন্ত করে বেড়িয়েছেন — বাংলার অবহেলিত শিল্পকৃতির সন্ধানে। তাঁর পরিশ্রমের একটি উল্লেখযোগ্য ফসল হল, পুরুলিয়ার ঝালদার কাটলারি শিল্প সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য পুস্তক। অন্যদিকে তাঁর সহকর্মীদের উদ্যম ও নিষ্ঠাই আজ সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংগ্রহশালার ক্রমোন্নতির সোপান রচনা করতে যে সাহায্য করেছে একথা অনস্বীকার্য।

মিউজিয়ামের মূলতঃ ভূমিকা হল সন্ধান, সংগ্রহ ও জনশিক্ষা। এই সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে মিউজিয়াম স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে একদা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — " সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।" পরবর্তীকালে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহু কারণে বাংলার শিল্পধারার অবলুপ্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যথিত হয়ে নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন এগুলি সংগ্রহের জন্যে। তাই তিনি একদা উৎকণ্ঠিত হয়ে কবি-সমালোচক মোহিতলালকে লিখেছিলেন, "..কিছুকাল যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি, বাংলার নিজস্ব আর্ট, আইডিয়া ক্রমেই বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

সেদিক থেকে সরকারী শিল্প বাণিজ্য সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতারা বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব রক্ষায় এবং শিল্পোদ্যমের বাসনায় পরাধীন দেশের বিদেশী শাসনের নিগড়ে বাঁধা থেকেও যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছিলেন, আজ প্রায় সত্তর বছর পরে হিসেব-নিকেশ করতে বসে দেখা গেল তা কিন্তু কোনক্রমেই ব্যর্থ হয়নি। ৪৫নং গণেশচন্দ্র এভেনিউএর এই সরকারী শিল্প বাণিজ্য সংগ্রহশালা বাংলা ও বাঙ্গালীর ঐতিহ্য রক্ষায় যে আত্মনিয়োগ করেছে — তা সরকারী উদ্যোগ হলেও দেশবাসীর একান্ত শ্রদ্ধার্হ। □

[অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি শাড়ীর আঁচলায় ফুললতাপাতার অলংকরণ (খ্রীঃ ১৯শ শতক।)]*





।।৭।।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহশালা

একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন ঃ "সেদিন একজন প্রসিদ্ধ আইকনোগ্রাফিস্ট এক সভায় বলিয়াছেন যে মূর্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বাস্তবিকই হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছিল, আর কত মূর্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি অনেক মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদেও অনেক মূর্তি সংগ্রহ হইয়াছে। সকল মিউজিয়ামেই কিছু কিছু মূর্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে-জঙ্গলে পুরানো গ্রামে পুরানো নগরে এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্তি পাওয়া যাইতে পারে।" শাস্ত্রী মহাশয় বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করেননি। এখনও পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির নানা স্থানে বহু মূর্তি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং বহু মূর্তি প্রত্নব্যবসায়ীদের করতলগত হয়ে দেশ-বিদেশে চালান হয়ে গেছে। সংগ্রহশালার কর্মীরা এরই মধ্যে কিছু কিছু যে সংগ্রহ করতে সমর্থ হননি এমন নয়, কিন্তু এমন বেওয়ারিশ বহু মূর্তিতে গ্রামের মানুষেরা ফুল-বিল্বপত্র ছুঁইয়ে দিয়ে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন। অন্য দিকে, মূর্তি সংগ্রহ করে সংগ্রহশালায় প্রদান সম্পর্কে উৎসাহী জনসাধারণ এবং সরকারী অফিসাররা যে করণীয় কর্তব্য হিসেবে তাঁদের ভূমিকা পালন

করেননি এমন নয়, তবে তা একান্তই অনুল্লেখ্য। সুতরাং বিগত বহু বৎসর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সংগ্রহের প্রতি এবং প্রাচীন পুরাকীর্তি সংরক্ষণের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবহেলার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগের অধীনে একটি প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সৃষ্টি হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। এইসঙ্গে তাঁর সহযোগী অধীক্ষক হিসাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারে যোগদান করেন, সুযোগ্য দেবকুমার চক্রবর্তী ও শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্বে আছেন, ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত মহাশয়। ১৯৬২ সালের ২৫শে জুন এই অধিকারের সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর এক সংগ্রহশালার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। আর সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ঘোষিত হয় প্রাচীন ভারতের শিল্প-সভ্যতায় বঙ্গসংস্কৃতির অবদান যে কি, তারই এক তাৎপর্যময় ইতিহাস অনুধাবনের জন্যেই এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যে সব পুরাবস্তু পাওয়া যাবে তা সরকারী প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের এই সংগ্রহশালায় রাখা হবে — এই ছিল উদ্দেশ্য। এইভাবেই উদ্বোধনের দিন থেকে জনসাধারণের দানে এই সংগ্রহশালাটি যেমন পরিপুষ্ট হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষরাও প্রত্নবস্তু সংগ্রহে সহায়তা করে এই সংগ্রহশালাটির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। সেজন্য এখানে সংগৃহীত বস্তুর সমাবেশে দেখা যায় আমাদের আদিম সভ্যতার পরিচয় থেকে তার সভ্যতা বিস্তারের ক্রমোন্নতির পর্ব—যার একান্ত প্রকাশ হয়েছে তার শিল্পে ও সংস্কৃতিতে আর তার প্রত্নতত্ত্বে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ, ইতিহাসপূর্ব যুগ এবং মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল-সেন আমলের যে সব নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হয়েছে তা বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব রচনার বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া শেষ-মধ্যযুগের মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক, কাঠের কাজ, সুতী ও রেশমবস্ত্রের বয়নশিল্প, চিত্রশিল্প, পটচিত্র ও গজদন্তের কাজ — এ সবেরই এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ এখানে যেন বাঙ্গালীর সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনকার কলকাতার ৩৩নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর (মিশন রো'র সংযোগস্থলে) দোতলায় অবস্থিত এই প্রত্নবস্তুর সংগ্রহশালা সত্যই আজ বাঙ্গালীর গর্বের, চিন্তার এবং ধ্যান ধারণার বস্তু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই সংগ্রহশালা বেহালার ১নং সত্যেন রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪-এর এক ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখানকার সংরক্ষক হিসাবে দায়িত্বে আছেন শ্রীপ্রতীপকুমার মিত্র। দর্শকদের প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয়েছে পঁচিশ পয়সা। সরকারী ছুটির তালিকামত দিনগুলিতে এই সংগ্রহশালা বন্ধ থাকে।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও রূপান্তরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ইতিহাসের পটভূমিকা। এরই মধ্যে আছে মানব সমাজের জীবন সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী। আর সে কাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস ও তার উপাদান, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে, যদি কেউ দেখার ও গবেষণা করার ইচ্ছে করেন, তাহলে তাঁকে আসতে হবে এই প্রত্নশালায়। সেই সুদুর অতীতের মানুষ জীবনযাত্রার সংগ্রামে কি ভাবে তার পাথরের সাদামাটা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এবং তারও পরে কিভাবে ধারালো পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল — তার বিবরণ এখানে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে তাদের সেই পুরানো প্রস্তর

যুগের আর নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রের আর হাতিয়ারের অজস্র সব নিদর্শন। পশ্চিমবাংলার সুপ্রাচীন নদী উপত্যকায় আর পাহাড়-পর্বতের সানুদেশে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের গবেষকরা প্রাগৈতিহাসিক মানবের ব্যবহৃত এইসব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। সে সংগ্রহের প্রাপ্তিস্থানের তালিকা খুঁজলে দেখা যাবে প্রধানতঃ সুবর্ণরেখা, ভাগীরথী, অজয়, কুনুর, কোপাই, শিলাবতী, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী, তারাফেনি প্রভৃতি নদ নদীর তটভূমি এবং বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের মালভূমি। এই সংগ্রহশালার সংগৃহীত এইসব রাশিকৃত পাথুরে হাতিয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালে — প্রাগৈতিহাসিক বাংলার সেই সমাজচিত্র যেন এক নিমেষেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যা এই সংগ্রহশালায় এলে দেখা যেতে পারে, তা হল পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্ত সেই প্রায় চার হাজার বছর আগেকার হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন। ভাবতে অবাক লাগে — বাংলার মাটিতে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা তাহলে এতদিন লুকিয়ে ছিল। সুদূর সিন্ধু উপত্যকা, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিশর, আনাতোলিয়া এবং ক্রীট দ্বীপের ধ্বংসাবশেষের চেয়ে বাংলার মাটিতে প্রাপ্ত এই বিচিত্র উপাদানও কি কম চিত্তাকর্ষক! হরপ্পা-মহেনজোদড়োর সমকক্ষ বাংলার এই হারানো সভ্যতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার। বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত অজয় নদের তীরে আউষগ্রাম থানায় পাণ্ডুক ও দীননাথপুর গ্রামের সীমান্তে অবস্থিত এক বিশাল ধ্বংসস্তূপকে লোকে বলে পাণ্ডুরাজার ঢিবি। সে যে কোন্ পাণ্ডুরাজা তা জানা নেই শুধু তার পরিচয় গ্রামীণ লোকশ্রুতিতে। বৃষ্টি বাদলের ফলে ভূমি ক্ষয়ে যাওয়ার মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্রত্নবস্তুও যে এখানে দেখা যায় না — এমন নয়, তবে একদা দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষরা এখান দিয়ে যখন একটা খাল খননের কাজ শুরু করেন, সেই সময়ই পাওয়া যায় অসংখ্য অমূল্য প্রত্নবস্তু — যা দেখে তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের ধারণা বদ্ধমূল হয় এবং তার ফলেই শুরু হয় উপযুক্ত খননকার্য; আবিষ্কৃত হয় তাম্রপ্রস্তর যুগের এক বিলুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন। অতীতের স্তরসমূহ থেকে এখানকার যে সব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়ে এই সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল, নানা ধরনের চিত্রিত মৃৎভাণ্ড, পাথরের ছোট ছোট অস্ত্র, তামার বলয়, আঙটি, বঁড়শি, হাতল, শীলমোহর, হাড়ের তীরের ফলা এবং পোড়ামাটির মূর্তিকা প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল চিত্রিত মৃৎপাত্রের নমুনা। এইসব চিত্রিত মৃৎপাত্রের মধ্যে মসৃণ ও উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের এক শ্রেণীর পাত্র খুবই উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের পাত্রের গায়ে যে সব আকর্ষণীয় নকশা খোদিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় মই, দাঁড়ী, ঢেউ খেলানো রেখা, বরফি, কৌণিক চিহ্ন এবং বেষ্টনকারী গোল রেখা প্রভৃতির ছড়াছড়ি। অন্যদিকে এই লাল কালো রঙের মৃৎপাত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বস্তু পাওয়া গেছে তা হল কোশীপাত্র। এই ধরনের পাত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় 'চ্যানেল স্পাউট' এবং ইতিপূর্বে ভারত সভ্যতার সন্ধানে অন্য যে সব স্থানে খননকার্য হয়েছে সেই তাম্র-প্রস্তর যুগের নর্মদা ও গোদাবরী উপত্যকায় এবং মধ্য ভারতের নাভদাটোলীতে যে সব কোশীপাত্র পাওয়া গেছে, পশ্চিমবাংলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও প্রাপ্ত এই

কোশীপাত্রগুলিও প্রায় একই রকমের। ঠিক একইভাবে হরপ্পা-মহেনজোদড়োর মত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতেও পাওয়া গেছে একাধিক ছিদ্রযুক্ত কলস ও মৃৎভাণ্ডের অংশ। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খনন করে পাওয়া এই সমস্ত পুরাবস্তু—যা প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হয়েছে, তা দেখে সেগুলি যেমন গভীর রহস্যময় বলে মনে হয় তেমনি কম চিত্তাকর্ষকও নয়। এই ধরনের আর একটি পুরাবস্তু হল মৃৎপাত্রের গায়ে খোদিত চিত্র। এই সব চিত্রিত মৃৎপাত্রের গায়ে খোদাই করে আঁকা হয়েছে সর্পধৃত ময়ূর আর মাছের সারি। তাছাড়া অনেক উল্লেখযোগ্য শীলমোহরও পাওয়া গেছে — যার সঙ্গে সেই সুদূর ক্রীট দ্বীপের মিনোয়া সভ্যতার লিপিচিহ্নের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আরও কত জিনিসই যে পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে পাওয়া গেছে — তার সবই দেখা যেতে পারে এখানে এলে। তাই সবকিছু মিলিয়েই এখানে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক বাংলার বিস্মৃত তাম্রযুগের ইতিবৃত্ত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনিই সাধারণ দর্শকদের কাছেও এ সংগ্রহটি একান্ত গৌরবের ও বিস্ময়ের।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির খননকার্যের পর, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার আবার এক খনন কাজ শুরু করেন সুদূর জলপাইগুড়ির এক গভীর অরণ্যে। সেখানের চিলাপাতা বনভূমির অন্তর্গত মেন্দাবাড়ী অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত নলরাজার গড় খনন করে এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের এই সংগ্রহশালায় এলে নলরাজার গড় এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত পুরাবস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে মালদহ জেলার হবিবপুর থানার এলাকাধীন জগজ্জীবনপুর গ্রামের তুলাভিটায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আকস্মিকভাবে নবম শতকের একটি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়। সেটি পাঠোদ্ধার করে জানা যায়, পাল বংশের দেবপালের পুত্র মহেন্দ্রপাল তার সেনাপতি বজ্রদেবের অনুরোধে একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য যে ভূমি দান করেন, সেটিই এই তাম্রপট্টটিতে খোদিত হয়েছে। জগজ্জীবনপুরের এই তাম্রশাসন আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার হওয়ার পর প্রত্নতত্ত্ব অধিকার এখানে উৎখনন কার্য শুরু করেন এবং তার ফলে তাম্রপট্রে উল্লিখিত সেই বৌদ্ধ বিহারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। মঠের দেওয়ালে নিবদ্ধ যেসব পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে সেগুলিতে উৎকীর্ণ হয়েছে বোধিসত্ত্ব, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, ভারবাহক, বরাহ, সিংহ, হরিণ, ময়ূর ও হাঁস প্রভৃতির মূর্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলির তুলনা করা যেতে পারে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর ও কুমিল্লা জেলার ময়নামতী মন্দিরগাত্রে খোদিত মূর্তি ফলকের ভাস্কর্যের সঙ্গে।

খননকার্য থেকে পাওয়া পুরাবস্তু ছাড়াও এখানে অন্যান্য যা পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে তাও বেশ চমকপ্রদ। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ যুগের পোড়ামাটির মৃত্তিকা-ফলক, মুদ্রা আর হাঁড়িকুড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে ২৪ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়, গোপালপুর-হাটখোলা আর হরিনারায়ণপুর থেকে। পশ্চিম দিনাজপুরের পুনর্ভবা নদীতটে অবস্থিত প্রাচীন বাণগড় থেকে সংগৃহীত হয়েছে কুষাণ যুগের মাতৃমূর্তি, যার গঠন সুষমায় রয়েছে প্রাচীন লোকশিল্পের সেই আদিমতর রূপ। শশাঙ্কের রাজধানী প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে চুন বালি দিয়ে তৈরি গুপ্ত শৈলীর কোন এক দেবতার লাবণ্যময় মুখ আর সেই সঙ্গে মেদিনীপুর

জেলার শিলাবতী উপত্যকার পান্না গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির ভগ্ন বরাহ মূর্তির মস্তক এবং একটি ক্ষুদ্র নারীমূর্তি—যা গুপ্ত যুগের শিল্পশৈলীর অপূর্ব নিদর্শনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাছাড়া পাল-সেন যুগ পর্বের পাথরের মূর্তিভাস্কর্যের বহু নিদর্শনও সংগৃহীত হয়েছে এই সংগ্রহশালায়। বঙ্গসংস্কৃতির রূপরেখায় কত ধর্মের ও কত রকমেরই যে মূর্তি নির্মিত হয়েছিল — তা বলে শেষ করা যায় না। তাই এখানে এলে দেখা যাবে বীরভূমের লোহাপুরে পাওয়া হাজার বছরের বজ্রতারা মূর্তি, বালুরঘাট থেকে পাওয়া ন'শ বছরের মারীচি আর এগারোশ বছরের পুরানো সূর্য, নদীয়ার তেহট্ট থেকে পাওয়া একাদশ শতকের ধ্যানী বুদ্ধ আর মুর্শিদাবাদের মণিগ্রাম থেকে পাওয়া হাজার বছরের বিষ্ণু মূর্তি। অন্যান্য মূর্তি যথা, মহিষমর্দিনী, গণেশ, উমা, মহেশ্বর, চণ্ডী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, তারা, লোকেশ্বর, হেবজ্র, আর জৈন তীর্থঙ্কর — এ সবই এই সংগ্রহশালার সম্পদ। এছাড়া আছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থেকে পাওয়া একাদশ শতকের অপূর্ব সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন—বিষ্ণুপট্ট, কোচবিহার থেকে পাওয়া পাথরের নবগ্রহ ফলক ইত্যাদি। প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রের শিল্পীদের ভাস্কর্য আর তার তুলনামূলক শিল্প-সৌকর্য অনুভব করতে হলে এ সংগ্রহশালায় অবশ্যই আসতে হবে শিল্প রসিকদের।

ব্রোঞ্জ ও ধাতুনির্মিত মূর্তির মধ্যে সেকালের শিল্পীরা যে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে গেছেন তা উপলব্ধি করা যেতে পারে এখানকার ধাতুমূর্তিগুলি দেখলে। এর মধ্যে ব্রোঞ্জের তারা মূর্তি, বিষ্ণু এবং মহিষমর্দিনী একান্তই উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রার সংগ্রহে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের এই সংগ্রহশালা এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের দাবী করতে পারে। রৌপ্য নির্মিত মৌর্য-শুঙ্গ যুগের 'পাঞ্চমার্ক' মুদ্রা এবং সমুদ্রগুপ্ত, ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, নরসিংহগুপ্ত-বলাদিত্য এবং গঙ্গারাজাদের স্বর্ণমুদ্রার এক মূল্যবান সংগ্রহ এখানে আছে। এছাড়া মোগল ও সুলতানী আমলের বহু মুদ্রাও এখানে সংগৃহীত হয়েছে। শুধু মুদ্রা সংগ্রহই নয়, মুদ্রা প্রাপ্তিরও যে কত চমকপ্রদ বিবরণ আছে তা বলে শেষ করা যায় না। সেকালের গুপ্তধন যে শুধু কল্পনাই ছিল তা নয়, বাস্তবেও তা দেখা যাচ্ছে। এই কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের লালবাগের কাছে এলাহিগঞ্জে একদল শ্রমিক মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটি স্বর্ণমুদ্রা বোঝাই পাত্র দেখতে পায়। পরে সরকারী হস্তক্ষেপে এখানের ৬৫টি স্বর্ণমুদ্রাই এই সংগ্রহশালায় জমা হয়।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার চণ্ডীঝাড় গ্রামে বহুসংখ্যক মোগল-পাঠান আমলের এবং ত্রিপুরার প্রাচীন মুদ্রার এক গুপ্তভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় ৭৬৭টি মুদ্রা এই অধিকারের সংগ্রহে এসেছে। উল্লেখ্য যে, মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত এমন একটি মুদ্রার বিশাল রত্নভাণ্ডার ইতিপূর্বে পূর্বভারতে কোথাও পাওয়া যায়নি।

এই সংগ্রহশালার অন্য এক বিভাগে আছে বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির ফলক এবং কাঠের কাজের সুদৃশ্য নিদর্শন। তাছাড়া এখানকার চিত্রশালাটিও বেশ সমৃদ্ধ। নেপাল থেকে পাওয়া খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের তালপত্রে অঙ্কিত অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগ্রহ এই সংগ্রহশালার গৌরব। এছাড়া বাংলার

রথের গায়ে অঙ্কিত ভিত্তিচিত্র, পটুয়া-চিত্রকরদের প্রাচীন জড়ানো পট ও জাদুপট এবং কালীঘাটের পট প্রভৃতি পটচিত্র, চিত্রিত দশাবতার তাস, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের উপর চিত্রিত ক্ষুদ্রাকার চিত্রাবলী এবং মুর্শিদাবাদী ঘরানার চিত্রাবলীও এখানে সংগৃহীত হয়েছে।

এছাড়া সংগৃহীত নকশী কাঁথা, বালুচর শাড়ী আর মুর্শিদাবাদের গজদন্তের বিশিষ্ট নিদর্শন — এ সবই অতীত বাংলার শিল্পকলার এক জীবন্ত চিত্র — যা এই সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার শুধু নিদর্শনই সংগ্রহ করেন নি, সাধারণ দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে কিছু কিছু পুস্তকাদিও প্রকাশ করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১. Archaeological Discovery in West Bengal.
২. An Introduction to the State Archaeological Gallary of West Bengal.
৩. Excavations at Pandu Rajar Dhibi.
৪. Album on The Terracottas of Hetampur.
৫. Album on The Terracottas of Antpur.
৬. প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া।
৭. অরণ্য ছায়ার দুর্গে।
৮. Nalrajar Garh.
৯. আটটি চিত্র সম্বলিত একটি পোস্টকার্ডের সেট
১০. The Changing face of Calcutta : An architectural approach Calcutta.: 300.
১১. Memoirs of Gour and Pandua.
১২. Treasures of the State Archaeological Museum, W.Bengal VOL, 1, II & III.
১৩. Explorations in Art and Archacology of South Asia: Essays Dedicated to N.G.Majumdar.
১৪. Pre-History of the Susunia Hill Complex and the Suvarna Rekha Valley.
১৫. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি।
১৬. নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি।
১৭. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি।
১৮. মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ।
১৯. পুরাকীর্তি সমীক্ষা ঃ মেদিনীপুর।
২০. বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি।
২১. কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি।
২২. হুগলী জেলার পুরাকীর্তি।

২৩. মালদহ জেলার পুরাকীর্তি।

২৪. পুরাবৃত্ত ১ (বার্ষিক সংকলন) ১৪০৭

২৫. Pratna Samiksha VOL, II & III, IV & V, VI-VIII প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার পুরাতত্ত্ব আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কর্তা কালিদাস দত্ত তাঁর সারাজীবনের প্রত্নসংগ্রহের এবং পুস্তক-পত্রিকার এক অমূল্য সম্ভার দিয়ে গেছেন এই প্রত্নতত্ত্ব অধিকারকে। নিম্নবঙ্গ থেকে সংগৃহীত তাঁর এই অমূল্য সংগ্রহের নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়ে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। একদা আমাদের দেশের অবহেলিত পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কালিদাস দত্ত মহাশয় লিখেছিলেন যে, "আমাদের বিশ্বাস ২৪ পরগণা জেলার প্রাচীন স্থানসমূহে রীতিমত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য হইলে নিশ্চয়ই এখানকার প্রাগৈতিহাসিক মানব সভ্যতারও নিদর্শনাদি পাওয়া যাইবে। ঐ প্রকার অনুসন্ধানের অভাবে এখনও কেবলমাত্র ২৪ পরগণা কেন সমগ্র বাংলা দেশেরই ঐ সময়ের পুরাবৃত্ত অবিদিত হইয়া আছে।" স্বর্গত দত্ত মহাশয় সেদিন যে বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সেই সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে অদ্যাবধি যতটুকু অগ্রসর হয়েছেন তাও প্রশংসার দাবী রাখে। তবে এ জাতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে জনসাধারণের দাবী ও আশা অনেক। আশা করি, সে দাবী পূরণের জন্য এ সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষ আরও যত্নবান হবেন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন জেলার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খননকার্য পরিচালিত করবেন। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত খ্রী. পূ. ১ম ঃ খ্রী. ১ম শতক-এর পোড়ামাটির ফলক।]





।।৮।।

মালদহ জেলা মিউজিয়াম

একদা স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী ছিল গৌড়। মুসলমান বিজয়ের পর সেখানে যে সব মসজিদ আর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল, আজও সেগুলি সেই অতীতের সাক্ষী হিসেবে পরিচয় দিয়ে চলেছে। সে আজ বহুদিনের কথা; চারপাঁচশো বছরের সেই পুরোনো ইতিহাস। সেদিনের নির্মিত সেই পুরোনো দিনের মুসলিম রীতির স্থাপত্য আর ভাস্কর্য মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখতে হয়। মালদা শহরে তাই ভ্রমণরসিকদের এত ভীড় জমে। এই জন্যেই গৌড় আর পাণ্ডুয়ার সেই স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ, মিনার আর সমাধির কীর্তি-স্তম্ভগুলি একটা বড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠে ভ্রমণবিলাসীদের কাছে আর উৎসাহী গবেষকদের কাছে।

কিন্তু মালদহ শহরে অনেক দেখার মধ্যে আর একটি আকর্ষণীয় দেখার জিনিস হলো এখানের মালদহ জেলা মিউজিয়াম। মালদহে এলে মালদহের এই সংগ্রহশালাটি দেখা একান্তই প্রয়োজন এই জন্যে যে, এখানে এলে দেখা যেতে পারে স্বাধীন হিন্দু আমলের স্মৃতি বিজড়িত মূর্তি-ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন। সেকালের গৌড় ও বরেন্দ্রের গৌরববাহী শিল্প-ভাস্কর্যের বহু মূল্যবান সম্ভার এই সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে যা দেখে আমরা বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী সভ্যতার পরিচয় একান্তই পেতে পারি এবং প্রাচীন বাংলার শিল্পসম্পদের ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে পারি; সেই প্রাচীন বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করে আমরা ধন্য হতে পারি। বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব রক্ষায় নিবেদিত এই মিউজিয়ামটি সেজন্যে দর্শন করা প্রতিটি স্বদেশবাসীরই কর্তব্য।

মালদহের ইংলিশ বাজারের প্রান্তরে বৃন্দাবনী আমগাছের বিশালকায় ছত্রশোভিত পল্লব-ছায়া পার হয়ে মহানন্দার তীর ঘেঁষে দক্ষিণে একটু এগোলেই মালদহ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন আর ঠিক তার পাশেই আলোচ্য মালদহ জেলা মিউজিয়াম।

বিগত প্রায় পঞ্চাশটি বছর পেরিয়ে এসে এই মিউজিয়াম আজ যে রূপ গ্রহণ করেছে, তার পিছনেও আছে ফেলে আসা দিনের ভাঙ্গাগড়ার এক ইতিহাস। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ইতালি ও যুগোশ্লাভিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন আই. সি. এস. তখন ছিলেন মালদহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্গের আঞ্চলিক কৃষ্টি সম্পদের তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। তাই জেলার বিভিন্ন স্থানে সরকারী কাজে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি প্রচুর মূর্তি-ভাস্কর্যের সন্ধান পান এবং সেগুলি যে অবহেলাভরে ছড়িয়ে থেকে রোদে জলে নষ্ট হতে চলেছে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। এ বিষয়ে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সচেষ্ট হন। ইতিমধ্যে তাঁর উদ্যোগে আর মালদহবাসীদের সহযোগিতায় জেলার সদরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের চেষ্টা চলে। আর সেই সঙ্গে চলতে থাকে এই সব নানান ধরনের অবহেলিত পুরাবস্তু সংগ্রহের চেষ্টাচরিত্র। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেমন বহু মূর্তি সংগৃহীত হয়, তেমনি তাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে একদল আগ্রহী তরুণ অতীত বাংলার এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হন। এইসব উৎসাহীদের মধ্যে যিনি নানাভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীসেনকে সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন কে. সি. বর্মন এবং সে সময়ে তাঁর সহায়তা পাওয়া না গেলে এইসব প্রত্নতত্ত্ব সম্পদ সংগ্রহ করা খুব সহজ হতো না। সুতরাং এই ভাবেই শ্রীসেন তদানীন্তন অবিভক্ত মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেন বহু মূর্তি, শিলালিপি, হাতে লেখা পুঁথি, এবং প্রাচীন মুদ্রা। মালদহ জেলায় একটি জেলা গ্রন্থাগার এবং সেই সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীসেন উদ্যোগী হওয়ায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে স্থানীয় কর্মকর্তাগণ এই প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার নামকরণ করেন বি আর সেন পাবলিক লাইব্রেরী অ্যান্ড মিউজিয়াম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালা আশুতোষ মিউজিয়াম স্থাপিত হওয়ায় — এখান থেকেই সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার 'এ্যাফিলিয়েশন' নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এইভাবেই ১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চের এক শুভদিনে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রথম স্বাগত জানালেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক প্রমথনাথ মিশ্র এবং সেইসঙ্গে এই ভবনের উদ্বোধন করলেন তদানীন্তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় ডঃ মজুমদার সমাজজীবনে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন এবং এ বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, আজকে এই জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় যেমন মালদহের একটি বহু দিনের অভাব দূরীভূত হলো, তেমনি এই ঐতিহ্যপূর্ণ জেলার সদরে এতদিন কোন সংগ্রহশালা গড়ে ওঠেনি একথা দুঃখজনক হলেও আজ সেই অভাব পূরণ হলো। এইভাবেই একদা 'ক্লাব লাইব্রেরীকে নিয়ে বিনয়রঞ্জন সেন, এর সার্বজনীন রূপ দিলেন, অভিজাতদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন সাধারণের জন্য। অন্যদিকে এর দৃষ্টিপাত হল অতীত মালদহের মাটিচাপা নীরব সংস্কৃতির দিকে, যার মধ্যে অতীত বাংলার ধর্মবিপ্লব থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জীবনের মর্মকথা রয়েছে শিলীভূত হয়ে। মালদহ এবং অতীত

বাংলার ভাস্কর্য, কলা, কারুশিল্প, পুরাতন পুঁথি, মুদ্রা, ধর্মপুস্তক মিউজিয়ামে স্থান পেল। মালদহের সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি নূতন ধারা সন্নিবেশিত হল।' (বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার পত্রিকা, চৈত্র ১৩৭৭)।

তারপর থেকে উৎসাহীদের চেষ্টায় প্রাচীন গৌড় ও বরেন্দ্রভূমির সেই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সংগৃহীত হতে লাগলো বহু মূর্তি, বহু শিলালিপি আর প্রস্তর ভাস্কর্য। এইভাবেই দ্বিতীয় গোপাল দেবের সেই মূল্যবান তাম্রপট্টও এই মিউজিয়মে একদিন প্রদত্ত হল। প্রায় বছর দুয়েকের মধ্যেই এত বেশি সংখ্যক মূর্তি-ভাস্কর্য সংগৃহীত হলো যে, এটিকে লাইব্রেরী থেকে পৃথক করে আলাদা একটি সংগ্রহশালা ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বহুদিন ধরেই এইভাবে পৃথক একটি মিউজিয়ম ভবন প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেষ্ট থেকে এখানের উৎসাহী কর্মীরা অবশেষে জনসাধারণের আর্থিক সহযোগিতায় এবং সরকারী সাহায্যে বিগত ১৯৫৬ সালে একটি পৃথক সংগ্রহশালা ভবন নির্মাণ করলেন। ১৯৫৭ সাল নাগাদ জেলা গ্রন্থাগারের পাশেই তার নবনির্মিত ভবনে এই সংগ্রহশালা উঠে আসে এবং ঐ বৎসরেই জেলা গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তিত হয়ে মালদহ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত লাভ করে এবং সেই সঙ্গেই এই সংগ্রহশালারও নামকরণ হয় 'মালদহ জেলা মিউজিয়াম'। অবশ্য বি আর সেন মহাশয়ের কাছে এই নাম পবিবর্তনের জন্য তাঁব মতামত চাওয়া হয় এবং তিনি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তারপর থেকেই 'মালদহ জেলা মিউজিয়াম' হিসেবে পাকাপোক্তভাবে এর নামকরণ সূচিত হয়।

সংগ্রহশালার গ্যালারিতে প্রবেশ করলেই শুধু মূর্তি আর মূর্তি। আর কত যে রকমের, কত যে ধরনের, কত যে আকারের আর কত যে সৌন্দর্য সুষমায় শোভিত — তার আর ইয়ত্তা নেই। একদিন যে সব সুউচ্চ মন্দির স্থাপিত হয়েছিল তার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের গৌরব নিয়ে, সেই সব মন্দির গাত্রে এবং মন্দিরাভ্যন্তরেই এইসব মূর্তি শোভিত থাকঁতো — আজ তারা কক্ষচ্যুত অবস্থায় গৃহহারা। তারপরে দীর্ঘকালের অবহেলা অনাদরের পরে এসেছে সংগ্রহশালার এই বদ্ধ প্রকোষ্ঠে। ভাবতেও সত্যি অবাক লাগে।

পাথরের এমন সব মূর্তি এখানে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় তিনশোর মত। খ্রীস্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতকের একাধিক সূর্যমূর্তি পাওয়া গেছে এই জেলার গাজোল, নাচোল, হবিবপুর আর বামনগোলা থেকে। এখানে সংগৃহীত সূর্যমূর্তির অনেকগুলিতে যেমন সূর্যের বুটজুতোপরা মূর্তি আছে, তেমনি আবার খালি পায়ে দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তির সংখ্যাও কম নয়। অন্যান্য মূর্তির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধের মূর্তি, তন্ত্রোক্ত মাতৃমূর্তি চামুণ্ডা, উমা-মহেশ্বর, মহিষমর্দ্দিনী, চণ্ডী, চতুর্ভূজা সরস্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা, কার্তিকেয়, অষ্টভুজ গণেশ মূর্তি প্রভৃতি। আর বিষ্ণুমূর্তি তো অসংখ্য সংগৃহীত হয়েছে এই সংগ্রহশালায় এবং এগুলির নানান গঠন ভঙ্গিমা একান্তই আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতিকালে খরবা থেকে পাওয়া এক বিষ্ণুমূর্তি এই সংগ্রহশালার এক অন্যতম আকর্ষণ। আকর্ষণ এই জন্য যে, এর অলঙ্করণ বৈচিত্র্যের তক্ষণ শিল্প একান্তই দর্শকদের মনোহরণ করবে। এছাড়া পঞ্চম শতকের একটি মাতৃকা মূর্তিও এই সংগ্রহশালার একটি বড়ো আকর্ষণ।

সম্প্রতিকালে বামনগোলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে আনুমানিক দশম শতকের একটি মাতৃকা মূর্তি। এ মূর্তির বাম হাতে রয়েছে পদ্ম, ডান হাতে ধানের শীষ, কোলে সন্তান এবং পদতলে হস্তী। এই সংগ্রহশালার সে সময়ের অবৈতনিক কিউরেটর শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তীর মতে এটি হল মনসার একটি দুষ্প্রাপ্য মূর্তি এবং তাঁর মতে এই মূর্তির মধ্য দিয়ে শিল্পী এক সুন্দরের মহিমাকেই প্রকাশ করে তুলতে চেয়েছেন। কেননা সর্প ফণা শোভিত মনসা মূর্তির মধ্যে যে হিংস্র রূপটি সাধারণ ভাবে প্রতিভাত হয়, এ মূর্তিতে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলেই এটি এত বেশি দর্শনীয়। সম্প্রতিকালে এমনি আরও একটি উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় ক্ষুদ্রকায় মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে গাজোলের সাতাশঘরা থেকে। এটি হল ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে সমাসীন এক দেবতার মূর্তি। তাই কেউ কেউ সুন্দরবনের বনাঞ্চলের দেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন আঞ্চলিক লৌকিক দেবতার ভাষ্য অনুযায়ী এটি হল সোনা রায়। অবশ্য মূর্তি বিদ্যায় গবেষণারত গবেষকরাই সন্ধান দিতে পারেন এর প্রকৃত পরিচয়। এই সংগ্রহশালার প্রকাশনা হল 'Art In Stone' (1982)

এই সংগ্রহশালায় যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তাম্রপট্ট বা তাম্রশাসন সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতকের জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত পাল সম্রাট মহেন্দ্রপালের প্রদত্ত তাম্রশাসন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, প্রায় হাজার খানেক মুদ্রারও এক সংগ্রহ এই সংগ্রহশালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা সংগৃহীত হয়েছে দিল্লীর সুলতানদের, মোগল বাদশাহদের, নেপাল ও ত্রিপুরার নৃপতিদের। আর এই সংগ্রহশালায় আছে তুলট কাগজ ও তালপাতায় লেখা অসংখ্য পুঁথি। প্রাচীন গৌড়ের স্মৃতিবহ এই সংগ্রহশালায় তাই ভীড় জমে উৎসাহী গবেষকদের ও স্থানীয় বিদ্যার্থীদের। যারা গৌড় পাণ্ডুয়ার অতীত পুরাকীর্তি দর্শনের জন্যে আসেন, সেইসব ভ্রমণ রসিকেরাও এই সংগ্রহশালা দর্শন করে অতীত বাংলার শিল্প-স্থাপত্যের একান্ত পরিচয় লাভ করেন। বঙ্গসংস্কৃতির গৌরব রক্ষায় আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে একদিন যে পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল, নানান সঙ্কটের, নানান বিঘ্নের ও নানান আবর্তের মধ্যেও তার যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। একদা 'বঙ্গের ভাস্কর্য' প্রবন্ধে বিখ্যাত সাহিত্যসেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালার এক বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'সহস্র বর্ষ পূর্বের বাঙ্গালার যাদু ঐ ঘরে সাজানো আছে। ধরাসুন্দরী এতকাল সে যাদু মৃত্তিকার আবরণে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; যখন তিনি দেখিলেন যে, বাঙ্গালী পূর্ব পরিচয় জানিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে, অতীতের যাদু অপসারিত করিয়া পিতৃপরিচয় প্রকাশ করিবার যোগ্য হইয়াছে, তখন সে মৃত্তিকার যাদু আবরণ দূরে ফেলিয়া দেশমাতৃকা স্বীয় জঠরগত অপূর্ব সামগ্রী উপঢৌকন দিয়াছেন। একবার দেখ বাঙ্গালী, তোমার গৌরব-গরিমামণ্ডিত অতীত বিস্মৃত বিদ্যার দ্যুতিচ্ছটা একবার দেখ। এইখানে বাঙ্গালার কোমল কমনীয়তা সঞ্চিত রহিয়াছে, এইখানে বাঙ্গালীর সব মাধুরী সাজান রহিয়াছে। একবার দেখ ...তাহারা সব কেমন বাঙ্গালী ছিল, যাহারা পাথর কুঁদিয়া দেবতা বাহির করিয়াছে।' মালদহের এই জেলা মিউজিয়ম দেখতে এসে ঠিক ঐ একই কথার পুনরুক্তি করা যায়। ☐

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি হবিবপুর, মালদহ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত সরস্বতী মূর্তি (খ্রীঃ ১২শ শতক।]



॥ ৭ ॥

বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার ও কলেজ সংগ্রহশালা

অতঃপর সেই প্রাচীন রাঢ় ও গৌড়ের সংস্কৃতি সাধনার পর এবার আসছি বরেন্দ্রভূমিতে। আজ থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে একদিন খালিমপুর গ্রামের এক কৃষকের লাঙ্গলের ডগায় উঠে এসেছিল বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস — একটা তামার পাতে লেখা পাল সম্রাট ধর্মপালের প্রশস্তি; যাতে ছিল বাংলায় পাল রাজাদের রাজত্বের ইতিবৃত্ত। কিন্তু সে পাল রাজাদের সেই বিখ্যাত রাজধানীটি কোথায় ছিল? বাংলার ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখা যায় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিতে' পালরাজাদের পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী বিবৃত করে বলেছেন যে, বরেন্দ্রভূমিই ছিল সেই পাল সম্রাটদের রাজধানী। সেকালের সেই বরেন্দ্রভূমির এলাকা কল্পনা করলে আজকের কালে তার চেহারাটা যা দাঁড়ায় তা হল, অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া আর মালদহ জেলার কতকাংশ। কিন্তু এখন সে বরেন্দ্রের পরিচয় আর কিছুই নেই। শুধু আছে কতকগুলি প্রাচীন দিঘির আর ভগ্নস্তূপের ধারে ধারে কিংবদন্তীর ছড়াছড়ি, আর আছে স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, ইতস্ততঃ ছড়ানো অজস্র পাথরের মূর্তি আর ভাস্কর্য-অলঙ্করণ।

তারপর একদিন এই দিনাজপুরের দামোদরপুর গ্রামের মাটিতেই পাওয়া গেল এক তাম্রশাসন। সে তাম্রশাসনে পরিচয় পাওয়া গেল গুপ্ত সম্রাটদের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ এলাকার সেই ইতিবৃত্ত। আশুতোষ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে খনন কাজ করে এখানেই সেই পুরনো 'কোটিবর্ষে'র স্থান নির্ণয় করলেন। আর সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হল মৌর্য-শুঙ্গ আমল থেকে পাল রাজত্বের বহু প্রত্ন সামগ্রী। এইভাবেই আজ

বরেন্দ্রভূমি ও কোটিবর্ষের অন্তর্গত দক্ষিণ দিনাজপুর হল তার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে ঐশ্বর্যবতী। তার খালখন্দরে, অলিতে-গলিতে, রাস্তাঘাটে সেই প্রাচীন রাজ্যেব শিল্পসংস্কৃতির বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে অসংখ্য, যা তার পুরনো দিনের শিল্প-সমৃদ্ধির ঐশ্বর্য ও বিত্তের পবিচয় তুলে ধবে।

সুতবাং এই জেলায় পাথরের মূর্তি ভাস্কর্যেব এত আধিক্য। এমন বেওয়ারিশ কত মূর্তিই না এখান থেকে দেশবিদেশে চালান হয়ে গেছে। সেই চালানের সূত্র ধরে কালে কালে কত বক্ষকেরাও ক্রমশঃ ভক্ষক হয়ে বসেছেন আর তাঁদের ড্রইংরুমগুলিকে সাজিয়ে তুলেছেন এমন অমূল্য উপচার দিয়ে। শিল্পরসিকের চোখের সামনে এমন সব অবহেলিত মূর্তি-ভাস্কর্যকে কত আর অবহেলা করা যায়। পথের ধারে পড়ে থাকা এমনই দুটো অপরূপ মূর্তি কে যেন সংগ্রহ করে একদা বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগারে এনে রেখেছিল। আজকের এই বালুরঘাট এখন হল সরকারীভাবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রধান কেন্দ্র। তাই সেদিনের সেই বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার একদিন পল্লবিত হয়ে রূপ নিল জেলা গ্রন্থাগারের পর্যাযে। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। তখন ঐ গ্রন্থাগারের সম্বল ছিল ঐ মূর্তি দুটিই — কে এবং কেন যে এনেছিল ঐ মূর্তি দুটি সে ইতিহাস কারুরই জানা নেই।

একদিন ছিল আমাদের দেশে, যখন মিউজিয়াম চেতনা তত বেশি গভীর হয়ে ওঠেনি। তবে অবহেলিত এই সব সম্পদ সংগ্রহ করে মজুত করার জন্যে গ্রন্থাগারের আশ্রয়কেই তাঁরা উপযুক্ত মনে করেছিলেন। ইতিমধ্যে আলোচিত মালদহ জেলার গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার ইতিহাসেও তাই আমরা দেখেছি। এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যদেশেও নজর দিলে দেখা যাবে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কাহিনী— তা সবই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। আমাদের এই ভারতবর্ষেও অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যোৎসাহী সমিতিগুলির চেষ্টায় একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন গ্রন্থাগার গড়ে উঠে, তেমনি তার সঙ্গেও যুক্ত হয় সংগ্রহশালা। ফলতঃ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি হোল এর এক উদাহরণ। এছাড়া কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও তার শাখাসমূহের উদাহরণ তো আছেই। বাদ বাকী গ্রামাঞ্চলে এমন অসংখ্য গ্রন্থাগার আছে, যেখানে গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা এমন অসংখ্য পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং বালুরঘাটের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা এত সব পাথরের মূর্তি-ফলক সংগ্রহ করার ইচ্ছে হয় তদানীন্তন সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী অনিল দত্ত মহাশয়ের। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির এই সব উপকরণ, দুষ্প্রাপ্য মূর্তি-ভাস্কর্য সংগ্রহ করেন। তারপর তিনি বদলী হয়ে হুগলিতে চলে যাওয়ায় তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তী গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত মহাশয়ও সমপরিমাণে উৎসাহী হয়ে এইসব প্রত্নতত্ত্বের উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হন। তদানীন্তন বালুরঘাট সমাজশিক্ষা আধিকারিক শ্রী সন্তোষ দে মহাশয়ও তাঁর অকৃপণ সাহায্য দিয়ে এই সংগ্রহকে ঐশ্বর্যময় করে তোলেন। এইভাবেই ১৯৬২-৬৩ সালে বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে যে সংগ্রহশালাটি গড়ে ওঠে, তাতে সংগৃহীত হয় প্রায় পঁচিশটি পাথরের মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক প্রায় পনেরটি এবং হিন্দু নরপতি গণেশের পুত্র যদু — যিনি পরবর্তীকালে মুসলমান

ধর্ম গ্রহণ করে হয়েছিলেন জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ — তাঁর নামাঙ্কিত আটটি মুদ্রা।

তবে এই যে সংগ্রহ, তার পিছনেও যে কত তিক্ত মধুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার ঠিক নেই। গাছতলায় রোদে জলে পড়ে মূর্তিটি নষ্ট হচ্ছে — এমন এক অপরূপ মূর্তি দেখে গ্রন্থাগারের কর্মীরা সেটি সংগ্রহশালায় আনার জন্যে সেখানে যেই হাজির হয়েছেন, অমনি গ্রামবৃদ্ধ লোক এসে তাঁদের বাধা দিয়েছেন। অতঃপর নিরুপায় হয়ে ফন্দিফিকির করে গ্রন্থাগারের কর্মীরা নিজেদের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পরিচয় দিয়ে গ্রামের মোড়লকে বশীভূত করে সেই মূর্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। কে জানে এভাবে ঐ মূর্তি যদি না সংগৃহীত হতো, তা হয়ত কোন একদিন আড়কাঠিদের হাতে পড়ে বিদেশে চালান হয়ে যেত। তবে স্থানীয় লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সব মূর্তি সংগ্রহের কাজে যে সাহায্য করেননি এমন নয়। তাঁদের সকলেরই সহৃদয় দানে বালুরঘাটের এই সংগ্রহশালার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এমনি কত অভিজ্ঞতাই না হয়েছে এই গ্রন্থাগারের কর্মীদের। ছুটির দিনে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন এই সমস্ত সংগ্রহের কাজে; জেলার তথা বঙ্গের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপকরণের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে নিজেদের জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তবে তার জন্যে তাঁরা কোন বেতন পান না বা ওভারটাইম দেবার দাবী করেন না — যা করেন তা একান্তই দেশপ্রেম নামক এক বস্তুর তাগিদেই। সরকারী সাহায্যের ভাণ্ডার তাঁদের একাজের জন্যে খুলে রাখা হয়নি, তত্রাচ এই সংগ্রহে সংগ্রহশালার গৌরব বৃদ্ধির কাজে তাঁদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি।

এ বাদেও যেসব মূর্তি এখানে সংগৃহীত হয়েছে তা পাওয়া গেছে স্থানীয় কোন পুষ্করিণী খননের সময়। গ্রামের লোকেদের মধ্যে চলতি একটা সংস্কারও এ নিয়ে দানা বেঁধে গেছে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কালাপাহাড়ের আক্রমণের সময় বিধর্মীর হাতে দেবতার অসম্মানের আশঙ্কায় সেগুলিকে পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়, এগুলি তাই পুকুর সংস্কারের সময় পাওয়া যায়। কথাটি নেহাতই অমূলক নয়। কালাপাহাড় ছাড়াও বঙ্গে মুসলমান বিজয়ের সময় হয়ত পবিত্রতা বজায় রাখার জন্যে এমন ঘটনা ঘটে থাকবে। তবে কালাপাহাড়ের কিংবদন্তীকে একান্তই অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। সেকালের ইতিহাস বলে যে, এখান থেকে প্রায় সাতাশ মাইল দূরে ঘোড়াঘাটা নামক স্থানে কালাপাহাড় একদা তার ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল, আর হয়ত সেই সঙ্গে চলেছিল বিধর্মীর শাণিত কৃপাণ এইসব মূর্তি উপাসনার উপকরণ ধ্বংসের জন্যে। তাই এত সব মূর্তি বের হয় পুকুর আর দিঘি থেকে — যার অধিকাংশই ভগ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত। এত বিপুল সংখ্যায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে যে এইসব মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে তা দেখে কেউ কেউ বলেন যে, এখানেই ছিল সেই সব মূর্তি নির্মাণের শিল্পকেন্দ্র। এখনও লোকেরা তপন গ্রামের পাথরপুঞ্জীকে দেখিয়ে বলেন যে এই তো সেই মূর্তি তৈরির কারখানা— তা না হলে এত মূর্তি আসবে কোথা থেকে? শুধু তপন কেন, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এমন কোন গ্রাম নেই — যার দশহাত অন্তর একটি না একটি মূর্তি পাওয়া যায় না! এমন কথা যে কিছুমাত্রও অত্যুক্তি নয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করবেন।

বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় যে সব মূর্তি সংগ্রহ হয়েছে তার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল, বিষ্ণু, সূর্য, নৃত্যরত গণেশ, চতুর্মুখ লিঙ্গ, মনসা, বটুক ভৈরব এবং চণ্ডী প্রভৃতির মূর্তি। পোড়ামাটির ফলক সংগৃহীত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত খাঁপুর গ্রামের সিংহবাহিনীর ভগ্ন মন্দির থেকে। এছাড়া বৈরাট্টা গ্রামে এক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া একটি পোড়ামাটির বৃহদাকৃতি ফলক পাওয়া গেছে — যা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য শোভিত। এ ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে সংগৃহীত হয়েছে আরও কতকগুলি আকর্ষণীয় পোড়ামাটির ফলক ও প্রাচীন মুদ্রা।

গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা কিভাবে একত্রে তার কর্মপদ্ধতি সমাজ উন্নয়নের ও সমাজ শিক্ষার কাজে লাগতে পারে তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো এই প্রতিষ্ঠান। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় এই সম্পর্কে একদা এক সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, '......নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের মতোই সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সাধারণ সংগ্রহশালা আজ পৃথিবীর সকল উন্নত দেশগুলিতে জ্ঞানচর্চার ও সংস্কৃতি প্রসারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে। এক হিসেবে আমাদের দেশে সংগ্রহশালার উপযোগিতা গ্রন্থাগারের চেয়েও বেশি; গ্রন্থাগারের ব্যবহার প্রধানত সাক্ষর লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সংগ্রহশালার আবেদন সাক্ষর-নিরক্ষর সকলের কাছেই। সুতরাং আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করে তুলতে সংগ্রহশালা এক অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।' একথা সত্যিই খুব উৎসাহের যে, একদা বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় যত্নবান হয়ে উপযুক্ত অর্থ ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থেকে সেদিন তাঁরা যে সংগ্রহশালার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তা আজ বৃহৎ আকারে গড়ে না উঠলেও তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্যে তাঁরা দেশবাসীর একান্তই কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে থাকবেন।

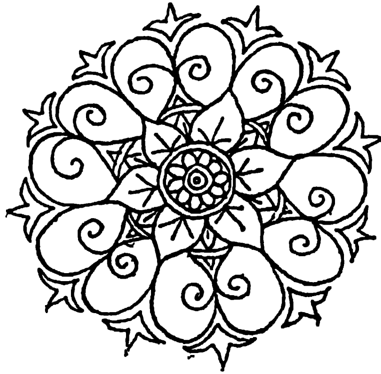
বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের এই সংগ্রহশালাটি দেখার পর আরও একটি সংগ্রহশালা দেখার আকর্ষণ আছে। বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের পাশেই বালুরঘাট কলেজ। এখানের কতিপয় উৎসাহী অধ্যাপকের চেষ্টায় ১৯৬৪ সালে এই কলেজে একটি সুন্দর মূর্তি-ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। অসংখ্য মূর্তি, শিলালিপি আর প্রাচীনকালের মৃৎপাত্র সংগৃহীত হয়েছে এঁদের এই কলেজ মিউজিয়ামে। বর্তমানে এই সংগ্রহশালাটিতে রয়েছে ২৭০টি পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি, ৩টি শিলালিপি, ২টি তাম্রশাসন, দুশোর অধিক পুরানো আমলের রূপোর টাকা এবং বেশ কিছু পোড়ামাটির পাত্র ও ফলক প্রভৃতি। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সুন্দর গৃহনির্মাণ করা হয়েছে সমস্ত সংগৃহীত দ্রব্যগুলি যথাযথ প্রদর্শনের জন্যে। বালুরঘাট কলেজের পরলোকগত অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই এই সংগ্রহশালাটি আজ পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে সরকারীভাবে জেলা সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালাটি দেখার পর পাশাপাশি অবস্থিত এই কলেজ মিউজিয়ামটিও দেখা যেতে পারে, আর সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেতে পারে, কিভাবে দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে জেলার একটি কলেজে এই ধরনের এক সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে পারা যায় এবং

সেই সঙ্গে ছাত্রদের কাছে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভের সুযোগ দান করে ছাত্র সমাজকে উৎসাহী করে তোলা যায়। সুতরাং এই সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর একান্তই শ্রদ্ধার্হ।

এছাড়া বালুরঘাটে সেই প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির সংস্কৃতি নিদর্শনের আরও কিছু কিছু বস্তু সংগৃহীত হয়েছে এখানকার উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'প্রাচ্যভারতী'র উদ্যোগে। উৎসাহীরা অনায়াসেই এখানে এসে সংগৃহীত সেই সব প্রাচীন মূর্তি ও শিলালিপির নিদর্শনগুলি দেখে যেতে পারেন।

সুতরাং আজকের বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায়, বালুরঘাট কলেজ পরিচালিত সংগ্রহশালায় এবং প্রাচ্যভারতী পরিচালিত সংগ্রহশালায় যে সব মূর্তি-ভাস্কর্যের সমাবেশ ঘটেছে তা দেখে মনে হবে এগুলি সেই প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির ও কোটিবর্ষের সংস্কৃতি চিন্তার যেন এক উজ্জ্বল দর্পণ। কালের কপোলতলে হারিয়ে যাওয়া বঙ্গসংস্কৃতি ও ইতিহাসের এমন সব নিদর্শনের এই মূল্যবান সংগ্রহ বালুরঘাটে সংস্কৃতিপ্রেমিকদের কাছে আজ এক বড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ❒

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি বৈরাট্টা থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক (খ্রীঃ ১৮শ শতক)]





।। ১০ ।।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালা ঃ কলকাতা

বিগত ১৩১৫ সালের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবণে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্য-পরিষৎ রূপে আমাদের দর্শন গোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের আনুকূল্য প্রসারিত হউক, — বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অদ্য এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্যলিপি লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীর্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক, অন্তরের এই কামনা প্রকাশ ....করিতেছি।'

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্বোধনী ভাষণের পর আরও প্রায় একশোটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। বাঙ্গালীর গৌরবকীর্তি রক্ষার জন্যে সাহিত্য পরিষদের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের যে প্রত্যাশা সেদিন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তা কালে কালে সেই শিশু আজ তার যৌবনদীপ্ত জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিনের কতিপয় বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যপ্রেমীর একত্র প্রয়াসে সংগঠিত 'বেঙ্গল একাডেমি লিটারেচার' আজ তার পরিবর্তিত নামকরণে ভূষিত হয়েছে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্'।

এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর অর্থ কি তা নিয়ে একদা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী বলেছিলেন, "'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্', এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা আবশ্যক। বঙ্গীয় শব্দের অর্থ কি, সাহিত্য শব্দের অর্থ কি, পরিষদ্ শব্দের অর্থ কি ও এই তিনটি জড়াইয়াই বা অর্থ কি?" বঙ্গীয় শব্দের অর্থ সম্পর্কে শাস্ত্রী মহোদয় তাই লিখেছিলেন, "বল্লালসেনের রাজত্বে পাঁচটি ভাগ ছিল; বঙ্গ, বাগড়ী, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা। এ বঙ্গ বলিতে গেলে পূর্ববাঙ্গালা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কিন্তু কেবল পূর্ব বাঙ্গালার নয়, সারা বাঙ্গালারই সাহিত্য-পরিষদ্।" 'সাহিত্য' ও 'পরিষদ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে তিনি লিখলেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, তার অর্থ কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া বাঙ্‌ময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের অলেখা ছড়াগুলি, মাঝিদের সারিগান এবং অনেক ধর্মের ছড়া ইত্যাদি জিনিসগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিকারের মধ্যে অসিতে পারে না।

'এখন পরিষদ্ শব্দের অর্থ কি? দশজনে মিলিয়া একত্র কাজ করিলে পরিষদ্ হইবে, দুইজনে করিলে হইবে না।"

পরিশেষে শাস্ত্রী মশাই বললেন, "তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ শব্দের আমরা কি বুঝিব? বুঝিব এই যে, বাঙ্গালা দেশবাসী দশজন লোক একত্র হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।" এই হলো সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্য পরিষদেরও তাই ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস আছে। ১৩০১ সালে প্রথম তার স্থাপনা হয়েছিল যেখানে, সেই ২/২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়ী ছেড়ে, ১৩০৩ সালে উঠে আসতে হয় ২৯নং গ্রে স্ট্রিটে এবং ১৩০৬ সালে আবার পরিষদের কার্যালয় চলে যায় ১৩৭/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ভাড়াবাড়ীতে। কিন্তু এই ভাড়াটে বাড়ীর সংকীর্ণ ঘর ক'খানিতে পরিষদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একদিন পরিষদের কর্মকর্তারা দ্বারস্থ হন কাশিমবাজারের মহারাজার কাছে ভূমিদানের প্রত্যাশায়। মহারাজা তাদের সেদিন বিমুখ না করে একখণ্ড জমি দান করেন এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। সেসময়ের আপার সার্কুলার রোডের উপর হালশীবাগানে এই প্রদত্ত একখণ্ড জমিতে পরিষদের নবনির্মিত গৃহ স্থাপিত হয়। এইভাবেই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে সেই বিরাট সম্ভাবনার বীজ বপন করা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠতে থাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্; বঙ্গসাহিত্যের নতুন ও পুরানো গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা হয় — জ্ঞানের ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্যে এইভাবেই তার একটি মূল্যবান গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়।

শুধুমাত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাই নয়, বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় এবং ভবিষ্যতের গবেষণার জন্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে তার প্রাচীন সাহিত্যের উপকরণ হাতে লেখা তালপাতা ও তুলট কাগজের পুঁথি সংগ্রহ ক'রে তার পুঁথিশালার প্রতিষ্ঠা হয়। পুঁথিশালার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাই বলা হয়, "...... যে সকল সারগর্ভ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, সেই সকল সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করা এবং সুবিধামত প্রকাশ করা পরিষদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক..। এশিয়াটিক সোসাইটি নামক

সভা যেমন বহু সংখ্যক বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, পরিষদও সেই বাঙ্গালার বিলুপ্তপ্রায় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন, ইহাই .... অভিপ্রায়।" সুতরাং এই উদ্দেশ্যে সেদিন থেকে পরিষদে এ যাবৎ যে সব পুঁথি সংগ্রহ হয়েছে আজ তার সংখ্যা হবে প্রায় হাজার ছ'য়েক। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা পুঁথি হল, আনুমানিক ১৩শ শতাব্দীর কৃষ্ণকীর্তনের সেই মহামূল্যবান পুঁথি -- যা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধিতে একান্তই সহায়ক হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গণ্ডীকে প্রসারিত করেছে। সংগৃহীত বাংলা পুঁথি ছাড়াও সংস্কৃত, তিব্বতী, ওড়িয়া, হিন্দী, অসমীয়া ও ফার্সী পুঁথিও এই পুঁথিশালার এক সম্পদ।

পরিষদের উদ্যোগে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠারও এক ইতিহাস আছে। ১৩১৩ সালে কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শিল্প ও কৃষিপ্রদর্শনীতে শিক্ষাসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্যে পরিষদ্ কতকগুলি প্রাচীন দ্রব্য তাম্র ও প্রস্তর লিপির ছাপ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানের ও মন্দিরের ফটো, অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি, প্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক ও প্রাচীন পুঁথি ঐ প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। '.. তৎকালে দর্শকগণের এবং পরিষদের হিতৈষিগণের মন্তব্য হইতে জানা যায় যে, বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ও অযত্নরক্ষিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেগুলি পরিষদ মন্দিরে সংরক্ষণের ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলে পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে। তদবধি পরিষদ্ কার্যালয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।'

খাস্ কলকাতার বুকে ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত এমন একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' থাকা সত্ত্বেও, আবার এই কলকাতাতেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে একটি সংগ্রহশালা সংগঠিত করার কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা তা নিয়ে সভ্যদের মধ্যে নানান প্রশ্ন দেখা দেয়। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত ১৯১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে তদানীন্তন পরিষদ্ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এর উত্তরে জবাব দিয়েছিলেন যে, একথা স্বীকৃত যে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামেরও স্থানাভাব ঘটেছে এবং তাদের সংগৃহীত যাবতীয় প্রত্নদ্রব্যের উপযুক্ত স্থানও সঙ্কুলান হচ্ছে না। তাছাড়া একথাও স্বীকৃত যে এখনও মাটির গর্ভে লুকোনো যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আছে তা সরকারী 'ট্রেজার ট্রোভ' আইনের বিধি লঙ্ঘন ছাড়াও ব্যক্তিগত সন্ধান ও সংগ্রহের ফলেই বেশী সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং এটাই কাম্য যে এখানে এবং অন্যত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগ সরকারী উদ্যোগের অনুপূরক হয়ে উঠুক। এছাড়া সম্প্রতিকালে সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে আমাদের দেশের অতীত পুরাকীর্তি সংরক্ষণের এই প্রচেষ্টায় দেশে একটা জাগরণও এসেছে।

এই ভাবেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বারা উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়ে বহু আগ্রহী চিন্তাবিদ্ পুরাবস্তু সংগ্রহের দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়েন। দেশের নানাস্থান থেকে এই ধরনের নানান প্রত্নবস্তু উপহার আসতে থাকে এই চিত্রশালায়। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা,

বিভিন্ন ভাষায় লিখিত মূল্যবান পুঁথিপত্র, পাথর ও ধাতুনির্মিত মূর্তিরাজি প্রভৃতি এখানে এসে জমা হতে থাকে। 'চিত্রশালার প্রথমাবস্থায় পরিষদের সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্ন ও চেষ্টায় বর্তমান চিত্রশালার অধিকাংশ দ্রব্যই (প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তি) সংগৃহীত হয়।'

সাহিত্য পরিষদ্ চিত্রশালায় এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য যেসব দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে মুদ্রাই হল প্রায় বারোশোর মত। এখানে সংগৃহীত মুদ্রার মধ্যে আছে, মৌর্য-শুঙ্গ, শক, ইন্দো-পার্থিয়ান, ক্ষত্রপ, কুলিন্দ, কুষাণ ও গুপ্ত প্রভৃতি আমলের মুদ্রা। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের মুদ্রা, দিল্লীর সুলতানদের মুদ্রা, বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের মুদ্রা, অহোম, কোচবিহার ও নেপাল রাজাদের মুদ্রা, মোগল সম্রাটদের মুদ্রা, কাশ্মীর, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের মুসলমান রাজাদের মুদ্রা, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রা প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত মুদ্রার এই বহুমূল্য সংগ্রহ সম্পর্কে কৃতিত্বের অধিকারী হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে এই চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্তি ও মুদ্রার একটি বিবরণপূর্ণ তালিকা প্রণীত হয়।

এখানের এই চিত্রশালার একান্ত গৌরব তার সংগৃহীত মূর্তিরাজি। এর মধ্যে আছে গান্ধার থেকে পাওয়া বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, যক্ষ ও বুদ্ধের জীবনেতিহাসের দৃশ্য সম্বলিত মূর্তি। এছাড়া বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের মূর্তির ছাপ, ভূমিস্পর্শ ও ব্যাখ্যান মুদ্রায় বুদ্ধ মূর্তি প্রভৃতি। জৈন ভাস্কর্যের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে শান্তিনাথ ও মহাবীরের মূর্তি। এছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা-মহেশ্বর, সূর্য, নবগ্রহ মূর্তিফলক, গণেশ, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি বহু মূর্তিও এই সংগ্রহশালার সম্পদ। পরিষদের সংগ্রহে দ্বাদশ শতকের অমূল্য 'কল্যাণ সুন্দর' মূর্তিটি এক অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত — যার মধ্যে হিন্দু বিবাহের উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াচার 'সপ্তপদী' অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়েছে এই শিবদুর্গার বৈবাহিক মূর্তি ভাস্কর্যে।

প্রস্তর ছাড়াও ধাতুনির্মিত মূর্তিও এখানে সংগ্রহ হয়েছে। এর মধ্যে বুদ্ধ, বিষ্ণু, হরপার্বতী, সপ্তমাতৃকা ও মহিষমর্দিনী প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তিই প্রধান। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি অঞ্চল থেকে পাওয়া এমন তিনটি ধাতুনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি দেখে ১৯১১ সালে বিলেতের ইন্ডিয়ান সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি স্যার উইলিয়াম রোদেনস্টিন মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করে ছিলেন, 'I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to watch. I think, any where in the world.'

পোড়ামাটির ইঁটের ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তি-ভাস্কর্যের এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ কালানুক্রমে এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে বহু ফলকই যেমন সংগৃহীত হয়েছে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে, তেমনই পশ্চিমবাংলার গৌড়-পাণ্ডুয়া এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার জেলা থেকেও এগুলি পাওয়া গেছে।

এ পর্যন্ত যে কটি তাম্রশাসন বাংলার ইতিহাস রচনায় উপাদান যুগিয়েছে তার মধ্যে সাহিত্য পরিষদ্ চিত্রশালার সংগ্রহেই আছে এমন ছ'টি তাম্রশাসন। তপনদীঘি ও শক্তিপুর থেকে পাওয়া লক্ষ্মণসেনের দুটি তাম্রশাসন, ঢাকার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে পাওয়া বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন এবং মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন এই সংগ্রহশালার এক

উল্লেখযোগ্য সম্পদ। পরবর্তীকালে মনোরঞ্জন গুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত প্রথম মহীপালের ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের দুটি তাম্রশাসন এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

তারপর এই চিত্রশালায় আছে প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত রাজা প্রতাপাদিত্যের পাথর দিয়ে তৈরি কামানের তিনটি গোলা, বিষ্ণুপুর থেকে পাওয়া লোহার বর্ম ও কামানের গোলা, তরোয়াল প্রভৃতিও এখানে আছে। আর আছে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্তৃক সংগৃহীত বিখ্যাত পলাশী যুদ্ধের কামানের গোলা।

মুদ্রা, মূর্তি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও কিছু কিছু প্রাচীন চিত্রকলা ও চিত্রিত পুঁথির পাটাও এই সংগ্রহে আছে। এর মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজিত ঘোষ কর্তৃক প্রদত্ত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুঁথির পাটা, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্তৃক প্রদত্ত রাজস্থানী মুদ্রাকৃতি চিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আঞ্চলিক চিত্রকলার উদাহরণ হিসেবে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস এবং ওড়িশার গঞ্জিফা তাসও এই সংগ্রহের একান্ত মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহের পর সাহিত্য পরিষদের মূল্যবান সংগ্রহ হলো, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁদের হস্তলিপি ও বিভিন্ন রচনার পান্ডুলিপি। মনীষীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক ব্রিষ্টল থেকে আনীত রাজা রামমোহন রায়ের পাগড়ী। সাহিত্যসেবীদের পান্ডুলিপির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ভগিনী নিবেদিতার বিভিন্ন রচনার সমষ্টি পাঁচটি খন্ড, রমেশচন্দ্র দত্তের 'Economic History of India in the Victorian Age.,' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ডাইরী, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'সিংহল বিজয়' ও 'বঙ্গনারী', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বেখাক্ষর বর্ণমালা', ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাসন্তী', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'যৌতুক' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পাঁচটা প্রবন্ধ, একটি গল্প ও কবিতার পাণ্ডুলিপি।

সেকালের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী, শিল্পরসিক ও সমাজসংস্কারক প্রায় সকলেরই চিঠিপত্রাদি এই সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে — যা তদানীন্তন সমাজ ও সাহিত্যের এক অমূল্য উপাদান বলে গণ্য হতে পারে। শুধুমাত্র চিঠিপত্রই সংগৃহীত হয়নি — এইসব সাহিত্যরথীদের তৈলচিত্রও সংগৃহীত হয়েছে প্রায় দুশোর মত। "বর্তমান পরিষদ মন্দিরে সাহিত্যরথীদের এত নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে যে, ইহার সহিত লন্ডনের ওয়েস্ট মিনস্টার আবি-মধ্যে 'পোয়েটস্ কর্নার'-এর তুলনা করা যাইতে পারে।"

এছাড়া মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজের সংগ্রহ হয়েছে এখানে। সেকালের মনুষ্য বিক্রয়ের দলিল, রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয় সম্পত্তির দলিল, গোবিন্দদেবের পূজার্চনার জন্য প্রতাপাদিত্যের ছাড়পত্র এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কবি ভারতচন্দ্রের দরখাস্ত ও তৎসহ মহারাজার নিজ হস্তের আদেশপত্র প্রভৃতি।

সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার এইসব অমূল্য সম্পদ প্রদর্শনের জন্যে একদা দেশ বিদেশেও প্রেরিত হয়েছে। এর মধ্যে চিত্রশালার কতকগুলি দুর্লভ মূর্তি ও প্রাচীন চিত্র ১৯৪৭-৪৮ সালে বিলেতের রয়াল একাডেমি অব আর্টসের উদ্যোগে বার্লিংটন হাউসের ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে যায় এবং পরবর্তী বৎসরে নয়াদিল্লীর গভর্নমেন্ট হাউসে ভারত সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে স্থান লাভ করেছিল। এছাড়া

গত কয়েক বৎসরে চিত্রশালার উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্প্রতিকালে অনুষ্ঠিত পোড়ামাটির ভাস্কর্য-শিল্পের ধারাবাহিকতা ও পটুয়া চিত্রশিল্প পর্যায়ে দুটি সাময়িক প্রদর্শনী সংগঠিত করে পরিষদ্ কর্তৃপক্ষ শিল্পরসিকদের একান্ত ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে পর্যন্ত পরলোকগত ভারতপথিক ডেভিড্ ম্যাককাচ্চনের স্মৃতির উদ্দেশে পরিষদে যে 'ডেভিড্ স্মৃতি বক্তৃতামালা'র আয়োজন করা হয় তা যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার পি.সি.ভি মল্লিক মহোদয়। যে সব বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছিল তা হল বাংলার পটুয়া সমাজের সংগঠন ও চরিত্র (বিনয় ভট্টাচার্য), বাংলার লোকসংস্কৃতি আলোচনার পদ্ধতি (তুষার চট্টোপাধ্যায়), বাংলার পটুয়া সমাজ (সুহৃদ ভৌমিক), বাংলার পাল ও সেনযুগীয় মন্দিরের গঠন পদ্ধতি ও গঠন কৌশল (দীপকরঞ্জন দাস), বাংলার মন্দির ঃ মন্দির গড়া স্থপতিদের নিবাস ও পরিচয় (তারাপদ সাঁতরা), মন্দিরাশ্রিত পোড়ামাটি অলংকরণের শিল্পগত দিক (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়)।

সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা সম্পর্কিত এযাবৎ তিনটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং তা হল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'Descriptive Catalogue of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad (1911), অবৈতনিক চিত্রশালাধ্যক্ষ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত 'Hand-book of Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya parisad (1922) এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে মনোরঞ্জন গুপ্তের 'Historical Relics etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum' নামে বিভিন্ন তথ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়।

এছাড়া পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি পরলোকগত নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর উদ্যোগে 'ভারতকোষ' নামে বাংলায় 'এনসাইক্লোপিডিয়া' গ্রন্থ রচনাও এই পরিষদের এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

পরিশেষে, সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একদা লিখেছিলেন, '....মুখ্যত বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি লইয়া সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বানুসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। ...বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত। জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথি-পত্রের ভিতরে বাঙ্গলা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল পুঁথিকে জল, আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। পুরাতন মন্দির ও জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের সহিত যে সকল পুরাতন কিংবদন্তী বিজড়িত আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাসের যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি পুরাতন দলিল প্রভৃতি হইতে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কৃত করিতে হইবে। ...এই সমুদয় ও আরও বৃহৎ কার্য সাহিত্য পরিষদের প্রধান কর্তব্য মধ্যে রহিয়াছে।'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বহুলাংশে সফল হয়ে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চেতনাকে যে সহস্র গুণ বর্ধিত করেছে—একথা বলাই বাহুল্য। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি ব্রোঞ্জনির্মিত বুদ্ধমূর্তি (খ্রীঃ ১২শ শতক)]



॥ ১১ ॥

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা ঃ শিলিগুড়ি

জাতীয় সংস্কৃতির অমূল্য উপাদান সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একদা লিখেছিলেন, 'যে জাতির সৌন্দর্যবোধ যে পরিমাণে বিকাশলাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে জীবনযাপনের উপকরণগুলিকেও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে — কেবল যেন তেন প্রকারেণ কার্য সাধন করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এই কারণে, পুরাতন মৃদ্‌ভাণ্ডটি পর্যন্ত — পুরাতন মানব সভ্যতার দ্যোতক বলিয়া ইতিহাস লেখকের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান আছে বলিয়া তাহার ভগ্নাংশ পর্যন্ত প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের সংগ্রহালয়ে স্থান হইয়া থাকে।'

তাই অক্ষয়কুমার মৈত্রয় শুধু সংস্কৃতি ও ইতিহাস সাধনায় তাঁর চিন্তাভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ইতিহাস গবেষণায় সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই কালে কালে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর অক্ষয় কীর্তি 'বরেন্দ্র অসুসন্ধান সমিতি।' ১৯১০ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি একটি চিত্রশালাও গড়ে তুলেছিলেন — যে চিত্রশালা একদিন বরেন্দ্রভূমি তথা সমগ্র বাংলায় তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

যাঁর সারাজীবন সাহিত্য ও ইতিহাস সাধনায় অতিবাহিত হয়েছিল সেই মহাপুরুষ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র অক্ষয় কীর্তি আলোচনার আগে তাঁর জীবনেতিহাসের আলোচনায় এলে দেখা যাবে বাল্যকালে তাঁর অভিভাবকেরা ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, 'এই বালক বাঙ্গলা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি করে এইরূপ শিক্ষাই ইহাকে দিতে হইবে।' এই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংগ্রহশালা চেতনার অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণে তার নামও অক্ষয়কুমার রাখা হয়। বিদ্যালাভ কালেই ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যে আগ্রহী হয়ে উঠেন তার পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, '.... এফ. এ পড়িবার সময়ে মেকলের ক্লাইব এবং হেস্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা হইত। মেকলের বর্ণনা যে প্রকৃত নহে, তাহা সাহেবকে বুঝাইবার জন্য আমি নানা প্রমাণের অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধানকার্য দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়। তদুপলক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, তদবলম্বনে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে উপদেশ দান করেন।'

এইভাবেই অক্ষয়কুমারের বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি এত গভীব দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় যথাযোগ্য মনোযোগী হন। শুধু মনোযোগই নয়, তিনি এইসব উপকরণ সংগ্রহ সম্পর্কে এবং তা সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী হন। উপকরণ সংগ্রহের অভাবে ইতিহাস রচনার ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি তাই লিখেছিলেন, 'যে দেশের ইতিহাস উপকরণ বহু ভাষায় লিখিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কালক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে, সে দেশের কোনও একজন ব্যক্তি সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই পঁচিশ বৎসর পূর্বে কথা উঠিয়াও, অদ্যাপি ইতিহাস সংকলিত হয় নাই; এতদিনের সাহিত্যশ্রম বিষয়ান্তরেই সমধিকরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। অনুরাগের অভাব ছিল না, প্রতিভারও অভাব ছিল না; কেবল উপকরণগুলি অনায়াসলভ্য ছিল না বলিয়াই পূর্বাচার্যগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিলে অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহা হইবে ....।' এইভাবেই অক্ষয়কুমারের চিন্তাভাবনা তাঁকে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্যে সচেষ্ট করে তোলে এবং পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সমিতির এই সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা স্থাপনের পর দীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে দেশ ভাগাভাগির কলঙ্ক পড়েছে। সুতরাং রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিশেষ কিছু জানতে পারেননি। আর সেইসঙ্গে জানতে পারেননি, পূর্ববাংলায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র স্মৃতিরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থার কথা বা তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব-অনুষ্ঠানের কোন বিবরণের কথা। এই অজ্ঞাত বিবরণই ছিল আমাদের কাছে একান্তই দুঃখের।

কিন্তু বাঙ্গালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি — এই অপবাদ থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ। বিগত ১৯৬৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য বি. এন. দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহে

এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় একটি বিভাগীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বাংলার ইতিহাস ও সংগ্রহশালা আন্দোলনেব পথিকৃৎ ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অক্ষয়কুমারের স্মরণে এই সংগ্রহশালার নামকরণ করা হয়, 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা।'

উত্তরবঙ্গের নানা স্থানেই প্রত্নবস্তুর ছড়াছড়ি। ব্যক্তিগত ভাবে বহু উৎসাহীই এইসব অনাদর ও অবহেলায় পড়ে থাকা প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ বৃদ্ধি করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেব মাটিতে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমাবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে জলপাইগুড়ির এমনই কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি কিছু কিছু মূর্তি ও প্রাচীন মুদ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংগ্রহশালায় দান করেন। এর ফলে একদিকে যেমন এই বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ উৎসাহিত হন, অন্যদিকে এই সংগ্রহ তার ভবিষ্যতের বনিয়াদ রচনায় সহায়তা করে। এইভাবেই একদিন রামমোহন নগরে অক্ষয়কুমারের স্মৃতিরক্ষায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার ভিত্তিস্থাপন হয়। তারপর এর প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আরও প্রায় চল্লিশটি বছর পার হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে এই সংগ্রহশালায় যা সংগৃহীত হয়েছে, তাও সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। পাথর ও ধাতুনির্মিত মূর্তিই সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ত্রিশটি, মুদ্রার সংখ্যা প্রায় ষাটটি এবং হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিও হবে প্রায় কুড়িটির মত।

মূর্তি-ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি প্রধানতঃ সংগ্রহ হয়েছে পাশাপাশি জেলা মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে। পাথরের মূর্তি সংগ্রহের তালিকায় যা উল্লেখযোগ্য তা হল, সূর্য, বিষ্ণু, চণ্ডিকা, বুদ্ধ, অপরাজিতা ও মনসার মূর্তি। ধাতুনির্মিত মূর্তির মধ্যে আছে বিশেষভাবে মহিষমর্দিনী ও বৌদ্ধভাবাপন্ন চুন্দ্রার মূর্তি। সংগৃহীত মুদ্রার মধ্যে সুলতানী আমলের কিছু মুদ্রাও যেমন আছে, তেমনি আছে স্থানীয় কোচবিহার রাজাদের মুদ্রা প্রভৃতি। জলপাইগুড়ি থেকে পাওয়া কাঠের এক রাধাকৃষ্ণ মূর্তি আধুনিক হলেও তার দারুভাস্কর্য অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, স্থানীয় কবি পীতাম্বর রচিত একটি মঙ্গলকাব্যের পুঁথি। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, সম্প্রতি কোচবিহার কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনৈক অধ্যাপক এই মূল্যবান পুঁথিটি নিয়ে গবেষণারত রয়েছেন।

ইতিমধ্যেই এই সংগ্রহশালাটি বহু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সহায়ক হিসেবে এই সংগ্রহশালা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে এটি ভারততত্ত্বের এবং বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অনুশীলন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার পথে পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এর স্থান সঙ্কুলানের। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে, কিন্তু ক্রমশ নানান দ্রব্য সংগৃহীত হওয়ায় অবিলম্বে একটি স্বতন্ত্র মিউজিয়ম গৃহের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আলোচ্য সংগ্রহশালাটি পরিচালনা করার জন্যে প্রথমদিকে সংগ্রহশালার অন্যতম সংগঠক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য অবৈতনিকভাবে এর দায়িত্বে ছিলেন। শুধু সংগ্রহ ও পরিচালনাব মধ্যেই এই সংগ্রহশালাটির কার্যক্রম তিনি সীমাবদ্ধ রাখেননি; এই সংগ্রহশালায়

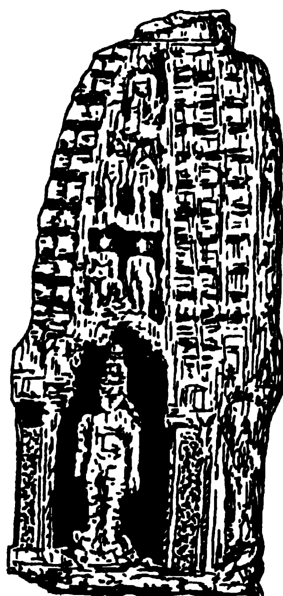
সংগৃহীত মুদ্রাগুলি নিয়েও একান্তই গবেষণারত রয়েছেন এবং তাঁর এই গবেষণার ফলশ্রুতি হল তাঁর লেখা কয়েকটি নিবন্ধ, যা ১৯৬৮ সালের "জার্নাল অব ন্যুমিসম্যাটিক সোসাইটি"-র মুখপত্রে এবং "এশিয়াটিক সোসাইটি"-র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশ করা হয়েছে, 'Akshaya Kumar Maitreya Museum Catalogue part I' এবং ১৯৮৩ সালে 'Iconography of sculptures' শীর্ষক দুটি গ্রন্থ। ভবিষ্যতে সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠিত এই সংগ্রহশালাটি যে এই অঞ্চলের একটি যথাযোগ্য গবেষণার কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে শিল্প ও সংস্কৃতির আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানতপস্বী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একদিন ভবিষ্যদ্বাণী করে লিখেছিলেন যে, '....প্রাচীন শিল্প পরিচয়ের প্রয়োজন যতই অনুভূত হইতেছে, তথ্যানুসন্ধান চেষ্টা সভ্য-সমাজে ততই আন্তরিকতা লাভ করিতেছে। ইহার আলোচনায় যে দেশ যত অধিক অগ্রসর হইতেছে, সেই দেশ ততই মানব তত্ত্ব অধ্যয়নের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছ। ইহা জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়া দিয়া, মানসিক সজীবতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। শিল্পতত্ত্বের আলোচনা এইরূপে উচ্চশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া সভ্য সমাজের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়কে অল্পদিনের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, ইতিহাসকেও আখ্যায়িকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে।'

যশস্বী ঐতিহাসিক সেদিন যে আশা প্রকাশ করেছিলেন, আজ তাঁরই স্মৃতিবহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় বর্তমানের এই 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা'টি যে তাঁর আশা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ❑

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি বেলেপাথরে নির্মিত দ্বারপালিকা মূর্তি (খ্রীঃ ১২শ শতক)]





।। ১২ ।।

জেলা সংগ্রহশালা (হরিপদ সাহিত্য মন্দির) ঃ পুরুলিয়া

আজকের এই পুরুলিয়া, তখন ছিল বিহারের মানভূম জেলা। এই জেলার পঞ্চকোট রাজ্যের দেওয়ান-ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে মাইকেল মধুসূদন এখানে এসেছিলেন ১৮৭২ সালে। কাঁকব মাটির ধূ ধূ করা প্রান্তর, পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা এই জেলাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করে মাইকেল একদা রচনা করেছিলেন, বিখ্যাত একটি চতুর্দশপদী। পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন ঃ

'পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজ কুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত মণ্ডলে।
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায় তুমি দিলে
অজ্ঞাত-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে।
প্রভুর কি অনুগ্রহ। দেখ ভাবি মনে,

(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে।
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।'

কবি 'মনানন্দ' লাভ করে সেদিনে পুরুলিয়ার উন্নতি প্রার্থনা করে যে ' বাড়ুক সৌভাগ্য তব' বলে উল্লেখ করেছিলেন, তা থেকে আজ আরও প্রায় দেড়শো বছর অতিবাহিত হয়েছে; পুরুলিয়ার উপর দিয়ে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার স্রোত বয়ে গেছে এবং তারপরে অনেক অনেক পরিবর্তনের উত্তরাধিকারী হয়েছে আজকের এই পুরুলিয়া। অবশেষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন আন্দোলনের ফলে অংশত মানভূম বিহার থেকে বাংলায় চলে আসে এবং আলাদা পুরুলিয়া জেলার সৃষ্টি হয়। অতি মূল্যবান সব খনিজ সম্পদের অধিকারী এই পুরুলিয়ায় তার যথাযোগ্য শিল্পসম্পদ গড়ে উঠেছে কিনা, বা তার নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতিকে আজকে নগর সভ্যতার আওতায় এনে বিকৃত করা হচ্ছে কিনা — এ সব আলোচনারও যেমন আশু প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এমন এক প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের অধিকারী জেলায় তার পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ সংরক্ষণের অবস্থাটা যে কি — তা নিয়েও সমান অনুসন্ধান। সীমান্ত বাংলার এই রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে যেমন গড়ে উঠেছে তার লোকসংস্কৃতির সম্পদ, তেমনি তার সর্বত্রই প্রায় ছড়িয়ে আছে দশম-একাদশ শতকের বহু মঠ-মন্দির। এই অঞ্চলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবাহ ছাড়াও জৈন ধর্মেব প্রভাব এখানে এত গভীরভাবে বিস্তৃত হয়েছিল যে, তার নিদর্শনস্বরূপ এখনও সেই প্রাচীন মন্দিরগুলি কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে মোকাবিলা করে। আর কত যে কালের কপোলতলে বিসর্জিত হয়েছে তারও ঠিক ঠিকানা নেই। সেগুলির পরিচয় এখন শুধু জঙ্গলে ঢাকা স্তূপের সমারোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমন একটি পাথুরে দেশে শুধু পাথরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যই গড়ে উঠেনি, এখানেও দশম-একাদশ শতকের পোড়ামাটির ভাস্কর্য-সজ্জা সমন্বিত বিরাটাকার ইঁটের শিখর দেউলও নির্মিত হয়েছিল — যার সাক্ষী আজও রয়েছে পাড়া ও বড়াম-দেউলঘাটায়। বড়াম-দেউলঘাটায় অবস্থিত প্রায় হাজার বছরের এত ঐশ্বর্যময় মন্দিরগুলি আজ সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে তিল তিল করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। কেবলমাত্র বড়াম দেউলঘাটার ও পাড়ার পোড়ামাটির প্রাচীন শিখর দেউলগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে সংস্কারসাধন করা হয়েছে। তারপর দশম শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত নির্মিত এমন বহু পাথরের মন্দির আর তার অভ্যন্তরস্থ মূর্তিরাজি অবহেলায় অনাদরে ধ্বংস হতে চলেছে। এই কালেরই সমসাময়িক তেলকুপির এমন অসংখ্য মন্দির দামোদরের গর্ভে, পাঞ্চেত জলাধার নির্মাণের প্রয়োজনে সেগুলিকে নিমজ্জিত ও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এইসব পরিত্যক্ত ও অবহেলিত মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দেবতা হিসেবে পূজিত এমন কত বেওয়ারিশ মূর্তি সব চালান হয়ে গেছে, হয়ত কোন মূর্তির চোরাকারবারীদের হাতে। এখনও সুইসা-দেউলী, পলমা, পাকবিড়রা, বুধপুর,

আর্শা, টুইসামা, বাঁদা ও কোশজুড়ি অঞ্চলে যে কটি পাথরের মন্দির আছে ও তার আশপাশে যে সব মূর্তি-ভাস্কর্যের সম্পদ ছড়িয়ে আছে তার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম বললেও চলে। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এইসব অতি শীঘ্রই নষ্ট বা অদৃশ্য হবার যে সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধারণা করা মোটেই অমূলক নয়।

এছাড়া পরবর্তীকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পুরুলিয়া তথা পূর্বতন মানভূম জেলায় যে কটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য সমন্বিত মন্দির দেখা গেছে তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এক পুরুলিয়া জেলাতেই কেবলমাত্র জোড়বাংলা মন্দিরই আছে চারটি স্থানে; যথা, ডিমডিহা, গদীবেড়ো, চাকুলতোড় ও গড়পঞ্চকোটে। জোড়বাংলার স্থাপত্যে নির্মিত ঝালদা থানার দঙ্গল গ্রামে যে পীরের সমাধিটি আছে তাও একান্ত অভিনব। এ ছাড়া পোড়ামাটির অপূর্ব ভাস্কর্য সমন্বিত চেলিয়ামার আটচালা এবং আচকদার চারচালা মন্দিরটি পুরুলিয়া জেলার একান্ত গৌরব। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, চেলিয়ামার মন্দিরটি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে সংস্কার করা হয়েছে।

সুতরাং এই যেখানে পুরুলিয়া জেলার মাঠেঘাটে তার প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্প সম্পদের ছড়াছড়ি, সেখানে অতীতে কোন সংগ্রহশালা গড়ে উঠেনি ; তবে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছে। বিগত ১৯২১ সালে উৎসাহী কতিপয় কলেজের ছাত্র পুরুলিয়ায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এই গ্রন্থাগারের কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন এক দয়ালু ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিপদ দাঁ এই গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তাঁরই দেওয়া আর্থিক সাহায্যে গ্রন্থাগারের জমি সংগ্রহ ও গৃহনির্মাণ করা হয়। সুতরাং দাঁ মহাশয়ের এই বদান্যতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্বরূপ পুরুলিয়ার সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারটির পরবর্তী সময়ে নামকরণ করা হয় হরিপদ সাহিত্য মন্দির। তারপর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাহিত্যিক এই সাহিত্য মন্দিরে পদার্পণ করেছেন এবং তাঁদের বহুমূল্য প্রজ্ঞা দিয়ে এই গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেছেন। মানভূমের সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদগুলিকে অবহেলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে সাহিত্য মন্দিরের কর্মীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তোলেন সম্প্রতি পরলোকগত প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। ১৯৫২-৫৩ সাল নাগাদ তিনি সাহিত্য মন্দিরের কর্মীদের একটি জেলা সংগ্রহশালা সংগঠিত করার জন্যে পরামর্শ দেন।

এরপরেই সাহিত্য মন্দিরের পক্ষ থেকে একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্যে যথাযথ প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন সাহিত্য মন্দিরের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীঅশোক চৌধুরী। পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ইতিপূর্বে স্থানীয়ভাবে যে সব মনীষী তাঁদের রচনায় এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের কথা তুলে ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গত সরোজরঞ্জন চৌধুরীর নাম একান্তই উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১৯৩৮ সালে 'মানভূমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকের মাধ্যমে মানভূমের ইতিহাস ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিবরণ উপস্থাপিত করেন। সরোজবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅনিল চৌধুরীও মানভূমের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিলেন। সুতরাং তিনিও এই সংগ্রহশালা সংগঠনে একান্তভাবেই নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ইতিমধ্যেই পুরুলিয়ার নানাস্থান থেকে বহু মূর্তি-ভাস্কর্য সংগ্রহ করতে সক্ষম

হন। এই সঙ্গে এই সংগ্রহশালার সংগ্রহের কাজে আরও যিনি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী রেখা মল্লিক। ইনিও সমান উৎসাহে এই সংগ্রহশালার জন্যে বহু প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং শুধু সংগ্রহই নয়, জেলার নানাস্থানের পুরাতাত্ত্বিক সম্পদগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানেও ততোধিক তিনি আগ্রহী। বলতে গেলে, শ্রীচৌধুরী ও শ্রীমতী মল্লিকের প্রচেষ্টাতেই হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের নবগঠিত এই সংগ্রহশালায় এতসব মূল্যবান দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে।

বিগত ১৯৬১ সালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে এইসব সংগৃহীত বস্তু দিয়ে একটি পুরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। তিনি এই সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে তাঁর দপ্তর থেকে এক হাজার টাকার অনুদান মঞ্জুর করেন। এইভাবেই পরবর্তীকালে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে সংগঠিত এই সংগ্রহশালাটি একটি যথার্থ রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তার নিজস্ব গৃহের। তাই সংগ্রহশালার দ্রব্যগুলিকে নিরাপত্তার অভাবে যথাযথভাবে প্রদর্শন করায় অসুবিধে দেখা দেয়।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালায় এ যাবৎ যা সংগৃহীত হয়েছে তার বিষয়বস্তু হল, পাথরের মূর্তিরাজি, জৈন চৌখুপী, লিপিযুক্ত মূর্তির তলদেশ প্রভৃতি। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিও প্রায় ত্রিশটির মত সংগৃহীত হয়েছে পুরুলিয়া জেলার নানান স্থান থেকে। এছাড়া আছে মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ফলক — যার প্রাপ্তিস্থান হল আচকদা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যেমন এঁরা সংগ্রহ করেছেন, তেমনি মুদ্রার সংগ্রহও কিছু আছে। এছাড়া আছে আদিবাসীদের অলঙ্কার ও আঞ্চলিক নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র — যার বহু কিছুই বর্তমানে লুপ্ত। আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে এখানে দেখা যেতে পারে স্থানীয় কুম্ভকার সমাজের তৈরি হাতি-ঘোড়ার নমুনা এবং সেই সঙ্গে ধারাবাহিকতার নিদর্শনযুক্ত ছৌ নৃত্যের মুখোশ ও নাচে ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, যা লোকশিল্প ও সংস্কৃতি অনুরাগীদের একান্তই চমৎকৃত করবে। সর্বশেষে পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ এবং পুরুলিয়ার যাবতীয় মন্দির ও মূর্তি-ভাস্কর্যের আলোকচিত্র সংগ্রহ — এই সংগ্রহশালার আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সংগ্রহশালার প্রকাশনা হল, অনিলকুমার চৌধুরী কৃত 'Descriptiure catalogue of Zilla Samgrahasala-Purulia'

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের এই সংগ্রহশালার এখন সবেমাত্র জীবন প্রভাত। তবু অনেক দিনের একটি অভাব পূরণ করার জন্যে এখানের কর্মীরা এই সংগ্রহশালাটি স্থাপনের মধ্যে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আশা করা যায় কবি মধুসূদনের ভাষায় একদিন সেটি হয়ে উঠবে, 'উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে।' সীমান্ত বাংলা তথা মানভূমের সংস্কৃতি রক্ষায় পুরুলিয়াবাসীরা যে অধিকতর যত্নবান হবেন — এটাই দেশবাসীর একান্ত কামনা। ❑

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি ছড়রা, পুরুলিয়া থেকে প্রাপ্ত জৈন চৌখুপী (খ্রীঃ ১২শ শতক)]



।। ১৩ ।।

মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম (ভূতপূর্ব কমার্শিয়াল মিউজিয়াম) — কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ঃ কলকাতা

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশী শিল্পের প্রসারে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাঙালির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কি রকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আমাদের সামনে আনতে হবে। কলকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালি যুবকদের মনে সেই উৎসাহ্ জাগানো যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।' স্বদেশী শিল্পের প্রসার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে সেদিন যে চিন্তাভাবনার উদয় হয়েছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বদেশী শিল্পকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে একটি যথাযোগ্য মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাদেশিক পৌরসভাগুলিকে অগ্রণী হতে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছিলেন 'বাংলার অধিনেতা' জননায়ক শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী চিন্তায় প্রাণবন্ত আদর্শের দীপশিখাকে তিনি প্রজ্বলিত করে দিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে বাংলার স্বদেশী শিল্পের একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের বিপ্লবী

চেতনা নিয়ে এতাবৎকাল বহু আলোচনা করেছেন তাঁর জীবনীকাররা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের শিল্পকে জনসমাজের সম্মুখে তুলে ধরে তিনি সেদিন যে দেশাত্মবোধের কর্মমন্দির রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর এই কর্মধারার দিকটি একান্তই উপেক্ষিত থেকে গেছে।

পরাধীন দেশের মাটিতে বিদেশী শিল্পের আমদানিতে দেশীয় শিল্প তার পরিচয়টুকু তুলে ধরার সুযোগ থেকে যেখানে বঞ্চিত, সেখানে দেশবাসী যদি তার দেশী শিল্পের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে, তার জন্যেই দরকার একটি সুসংগঠিত সংগ্রহশালার এবং এরই মাধ্যমে কাঁচা মাল, চাহিদা ও যোগানের পরিচয় লাভ করে শিল্প উদ্যোগীরা যেমন নতুন নতুন শিল্প ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারবেন, তেমনি সাধারণ লোকেরাও দেশের শিল্প সম্ভাবনার কথা অবগত হওয়ার মাধ্যমে লোকশিক্ষার পাঠও গ্রহণ করতে পারবেন। বিদেশী শাসনের নিগড়ে বাঁধা দেশে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনে এই ছিল শিল্প সংক্রান্ত মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে রূপ দেবার জন্য মেয়র সুভাষচন্দ্র তদানীন্তন দেশকর্মী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সঙ্গে সুচিন্তিত পরামর্শপূর্বক কর্পোরেশনের কাছে একটি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা দাখিল করলেন। ১৯৩২ সালের ৩০শে জুন তারিখে সুভাষচন্দ্রের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য আদেশ জারী হল এবং ক্রমান্বয়ে প্রস্তুতি পর্ব শেষে ১৯৩৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর জনসাধারণের জন্যে এই সংগ্রহশালার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। সংগ্রহশালার কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হল দেশবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্বদেশী শিল্প সৃষ্টি যজ্ঞের হোতা জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীকে। তারপর এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে দেওয়ালপত্র পড়ল কলকাতার অলিতে গলিতে। তাতে লেখা ছিল ঃ

"কমার্শিয়াল মিউজিয়াম
কলিকাতা কর্পোরেশন
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা -১২
বাণিজ্য, শিল্প এবং জনশিক্ষার মিউজিয়াম
একত্রে একটি।
একবার মাত্র দর্শনেই আপনাকে ধারণা দিতে পারে
ভারতের প্রচুর কাঁচা মালের সন্ধান
এবং
শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ঃ

যা তুলে ধরা হয়েছে আসল শিল্পবস্তু সংগ্রহের এবং চিত্রিত চার্টের ও মডেলের মাধ্যমে — যার মধ্যে রয়েছে শিল্প উৎপাদনের ধারা, বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র ও বিদেশী উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন ও বাণিজ্য প্রভৃতি, প্রভৃতি।

প্রদর্শন দ্রব্যের মাধ্যমে একটি জ্ঞানের আকর গ্রন্থ

এবং
দেশের শিল্প পুনর্গঠনে একটি যথার্থ নির্দেশনা।”

শুধুমাত্র দেশীয় শিল্পের প্রদর্শন ও তথ্যানুসন্ধানই নয় — কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও সাধারণ্যে তুলে ধরা হয়েছিল, বিভিন্ন চার্ট ও প্রাণবন্ত মডেলের সাহায্যে। এইভাবেই একদিন কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের এক স্বতন্ত্র গৃহে 'কমার্শিয়াল মিউজিয়াম' জনসাধারণকে স্বদেশী শিল্প প্রসারে একান্তই উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

মিউজিয়মের প্রদর্শনী কক্ষটিতে যেমন দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সম্ভার প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে একটি দর্শন উপভোগ্য তথ্যপঞ্জী-গৃহ সংগঠন করা হয়েছিল, তেমনি এখানে সংগঠিত করা হয়েছিল একটি প্রয়োজনীয় তথ্যকেন্দ্রের, যেখানে বঙ্গ তথা ভারত শিল্পের যাবতীয় তথ্য আগ্রহশীলদের সরবরাহ করা যায়। এরই পরিপূরক হিসাবে কিছু কিছু বুলেটিন, শিল্প দ্রব্যের মূল্য তালিকা পুস্তক এবং শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য পুস্তকও প্রকাশ করা হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী প্রকাশনালয়ের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তক ও পত্রপত্রিকার একটি গ্রন্থাগার এবং নিঃশুল্ক পাঠাগারও স্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়া তথ্য কেন্দ্র এ বিষয়ে বিভিন্ন শিল্পের চাহিদা ও যোগানের তথ্য সরবরাহ করে ক্রেতা ও উৎপাদকের মধ্যে একটা যোগসূত্র করে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিল। স্বদেশী দ্রব্যের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে কোন স্বদেশী দ্রব্যের বিশেষ প্রদর্শনীর সময়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প সরবরাহকারীদের এই সংগ্রহশালা দর্শনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হত এবং এই সঙ্গেই বিশেষ বিশেষ উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদকদের এই মিউজিয়ামে তাঁদের দ্রব্যের বিশেষ প্রদর্শনী সংগঠনের জন্যও অনুরোধ করা হত। এইভাবেই এখানে কাঁচ, রবার, তন্তুজ, খেলনা, দেয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রদর্শনীতে জনসাধারণের মধ্যে খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও এই কমার্শিয়াল মিউজিয়াম তাদের দ্রব্য সম্ভার নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরের মেলায় এবং প্রদেশান্তরে বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ করেছে একাধিকবার। এ যাবৎকাল প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি বিভিন্ন স্থানের প্রদর্শনীতে এই মিউজিয়াম অংশগ্রহণ করেছে এবং তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ১৯৩৮ সালে লাহোরে সারা ভারত প্রদর্শনীতে তার অংশগ্রহণ।

জনসাধারণের কাছে এই মিউজিয়াম শ্রুতিদর্শন সাহায্য হিসেবে যেমন তার দৃশ্য বস্তুকে তুলে ধরেছিল, তেমনি ব্যবস্থা ছিল নিয়মিত 'স্লাইড' সহযোগে বক্তৃতার ও সিনেমা প্রদর্শনের। এছাড়া বিশেষ বিশেষ বক্তাদেরও এখানে শিল্প ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হত। এইসব উল্লেখযোগ্য বক্তা ও তাঁদের বক্তৃতার বিষয়গুলি যদি অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে বিদেশী আমলে দেশের শিল্প বাণিজ্য জগতের চিন্তা-ভবনা, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎসাহীরা সেদিনে যে দৃষ্টিপাত করেছিলেন তার মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ জাতীয় পুর্নগঠনের বীজ এবং যা আজও দেশের সমস্যা সমাধানে একান্তই প্রয়োজনীয় বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। এমন কি পশ্চিমবাংলার ভূতপূর্ব রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও দেশের বেকার সমস্যা ও তার সমাধানের

উপায় সম্পর্কেও এখানে বক্তৃতা করেছেন। আলোচ্য বক্তৃতার বিষয়গুলি পুস্তিকা আকারে মিউজিয়ামের প্রকাশনা পুস্তিকা হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং আগ্রহশীল পাঠকের জন্যে তার এক বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল : (১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অবৈতনিক এগ্রিকালচারাল অফিসার শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী (১৯৩৮) 'পসিবিলিটিজ অব লং স্ট্যাপলড কটন কালটিভেশন ইন বেঙ্গল,' (২) সুবিনয় ভট্টাচার্য (১৯৩৯) 'প্রসপেক্টস এ্যান্ড প্রবলেম্স্ অব কটন মিলস ইন বেঙ্গল,' (৩) এ টি গাঙ্গুলী, অবৈতনিক সম্পাদক, সারাভারত সাবান প্রস্তুতকারী সমিতি (১৯৩৯) 'সোপ ইন্ডাস্ট্রি অব বেঙ্গল,' (৪) বি এম দাস, সুপারিন্টেডেন্ট বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউট্ ১৯৪০ 'লেদার ইন্ডাস্ট্রি অব বেঙ্গল' (৫) এইচ সি মুখার্জি, ফেলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন পরিষদের সদস্য, সভাপতি : ভারতীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের সারা ভারত সম্মেলন (১৯৪০) 'ম্যাস আনএমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইটস্ রেমিডি' (৬) এইচ এন দাশগুপ্ত, ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪০) 'প্রসপেক্ট অব পটারি ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল,' (৭) জে কে সরকার : পাঞ্জাব এবং বোম্বাই সরকারের তন্তুজ রপ্তানিকারক সংস্থা (১৯৪০) 'ফাইবার ইন্ডাস্ট্রি এ্যান্ড ইট্স্ পসিবিলিটি' (৮) শ্রীএ কে এম জ্যাকেরিয়া, ভূতপূর্ব মেয়র : কলিকাতা কর্পোরেশন, (১৯৪০) 'সেরিকালচার ইন্ডাস্ট্রি ইন জাপান', (৯) বি সি ভট্টাচার্য, প্রিন্সিপ্যাল : বেঙ্গল টেক্সস্টাইল ইনসটিটিউট (১৯৪০) 'দ্য কটন ইন্ডাস্টি-এ্যাজ এ মিন্স অব রিলিভিং আনএমপ্লয়মেন্ট' (১০) ডঃ সুধীর সেন, সম্পাদক : বিশ্বভারতী ইকনমিক রিসার্চ (১৯৪১) 'ইকনমিকস অব দ্য হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি', (১১) সুপ্রকাশ ঘোষ, ঈশান স্কলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৩)'দ্য প্লেস অব জিওগ্রাফি ইন পোস্ট ওয়র প্লানিং', (১২) এ কে বসু, ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ঢাকেশ্বরী কটন মিলস (১৯৪৫) 'ক্লথ প্রবলেম ইন বেঙ্গল' প্রভৃতি।

মূলতঃ দেখা যাচ্ছে, এই সংগ্রহশালার পক্ষে তার পুরানো দিনের ভূমিকায় যে শিল্পোদ্যমের প্রয়াস হয়েছিল একদিকে তার সাক্ষী হয়ে আছে এইসব বক্তৃতার মুদ্রিত স্মারক পুস্তিকা, অন্যদিকে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় হিসাবে এই সংগ্রহশালা থেকে আরও যে সব পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এইসব পুস্তিকাগুলি হল : (১) রাবার ইন্ডাস্ট্রি (১৯৩৭), (২) গ্লাস ইন্ডাস্ট্রি (১৯৩৭), (৩) ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রি (১৯৩৮), (৪) সায়েন্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (১৯৪০), (৫) ম্যাটারনিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এক্সিবিশন (১৯৪০), (৬) হোয়েয়ার টু বাই (১৯৪০), (৭) সেক্স এডুকেশন (১৯৪৩), (৮) গেট দ্য বেস্ট আউট অব ইয়োর কিচেন গার্ডেন (১৯৪৩), (৯) হাউ টু কীপ ক্যালকাটা ক্লিন (১৯৪৪), (১০) ভারতে বিদেশী মালের আমদানী (১৯৪৫), (১১) হ্যান্ডিক্যাপস অব দ্য হোসিয়ারি ইন্ডাস্ট্রি (১৯৪৫), (১২) বাংলাদেশে সয়াবিনের চাষ প্রভৃতি।

স্বদেশী শিল্প চিন্তার অগ্রদূত এই সংগ্রহশালা, তাই শুধুমাত্র জনসাধারণ ও শিল্প উৎপাদনকারীদের আকৃষ্ট করেনি, ভারতের বরেণ্য দেশনেতাদেরও উৎসাহিত করেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এমন অনেক বিখ্যাত দেশনেতার পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এই কমার্শিয়াল মিউজিয়াম। স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু এই সংগ্রহশালা দেখে উৎসাহিত হয়ে ১৯৩৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে জানিয়েছিলেন '..... I was very favourably

impressed by the Corporation Commercial Museum. I think this enterprise is deserving of praise and must prove helpful to our Swadeshi Industries. It surprise me that some such thing had not been done so far.'

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পুষ্ট এই মিউজিয়ম দেখে জওহরলালজীর মত স্বনামধন্য দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুও চমৎকৃত হয়েছিলেন দেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পরিচয় সাধারণের কাছে তুলে ধরাব এই লোকশিক্ষার আয়োজনে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের তদানীন্তন শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীডি এন মেহ্তাও একান্ত উৎসাহিত হয়ে তাঁর প্রদেশেও এমন একটা সংগ্রহশালা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। জননেতা শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ও এই সংগ্রহশালার কার্যাবলীতে একান্তই মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, '.......The Museum is a fine venture, and will claim an honourable place when the history of the pioneering days of Indian industries comes to be written.'

শুধু গণমান্য ব্যক্তিবর্গই নয়, তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিও যে এই সংগ্রহশালার কার্যাবলীর একান্ত প্রশংসা করে লিখেছিলেন, সে সম্পর্কে একটি মন্তব্য হলো '..... At its premises on College Street, the Museum which for the health and educative value of its exhibits is deserving of a visit by every business magnate from Clive Street' (Capital 29.6.39)।

সেকালের ব্রিটিশ শাসনের রাজরোষকে উপেক্ষা করেও স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে বাঙ্গালীকে সচেতন করে তুলতে এই মিউজিয়াম কোন ভাবেই পরাঙ্মুখ হয়নি। বরং সরবে যা ঘোষিত হয়েছিল তার নমুনা হল ঃ 'যুদ্ধের দরুন আমদানি কমেছিল আবার বিদেশী জিনিস ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে — প্রতিরোধ করার উপায় স্বদেশী কেনা ও দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা; এলুমিনিয়ম দ্রব্যাদি সম্পর্কে আক্ষেপ করে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ঃ 'সামান্য মাটির পাত্র তাও গেল এলুমিনিয়মের উপদ্রবে। কুমোর নিরন্ন হল। ভাতসিদ্ধর হাঁড়িটির জন্যে পরমুখাপেক্ষী হলাম — ভাবতেও লজ্জা হয়।' বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে মিউজিয়াম থেকে আরও যা ঘোষণা করা হয়েছিল, 'যারা বিদেশীর দেওয়া প্রসাধনে অঙ্গ শোভা বৃদ্ধি করেন তাদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে নিজেদের লজ্জা বোধ করা কি উচিত নয়? বা 'মন ভোলানো সখের জিনিষ আমদানি করি ৬৪ লক্ষ টাকার। কতবড় অসহায় পঙ্গুজাত আমরা। এ ক্লৈব্য দূর হবে কবে?' ইত্যাদি।

মূলতঃ এ ছিল পরনির্ভর দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তার স্বাদেশিকতার উন্মেষে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার আন্দোলন। দেশব্রতীরা তাই সে যুগে কর্পোরেশনের পরিচালিত এই সংগ্রহশালাটির মাধ্যমে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের এই সংগ্রামকে অভিনন্দিত করেছেন। তারপর একদিন দেশ স্বাধীন হয়েছে; ক্রমে তার অর্ধশতাব্দী উৎসব পালনও শেষ হয়েছে। নেতাজীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সেদিনের এই কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের নামও আজ নেই একসময় পরিবর্তিত হয়ে তা দাঁড়িয়েছিল 'মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম' নামে।

কিন্তু হায়, কলকাতা কর্পোরেশনের অবহেলা ও অনাদরের ফলে সে মিউজিয়ামটি আজ অবলুপ্তির পথে নাম লিখিয়েছে।

প্রতি বছর সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে দেশবাসী আড়ম্বর করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ

করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই মিউজিয়ামটির দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার করে তার পূর্বরূপে ফিরিয়ে আনার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কীর্তি রক্ষার জন্য কর্পোরেশন সচেষ্ট হলেন না। এইভাবেই সংগ্রহশালাটির মৃত্যু ঘটলো তিল তিল করে। যদি শিল্প বাণিজ্যের দ্রব্য সম্ভার আজ 'বাক-ডেটেড' হয়ে প্রদর্শনের অযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে এখানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অথবা বৃহত্তর কলকাতা পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি মিউজিয়াম কি গড়ে তোলা যেত না? কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এমন চিন্তাভাবনা করার মানসিকতার অভাবই যে এই মিউজিয়মের অপমৃত্যুর কারণ —তা বোধ হয় বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই। ❑

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটিতে সহজ প্রাপ্য ও সুলভ ফলের খাদ্য তালিকা, যা মূর্তি, ছবি ও চার্টের সাহায্যে দেখানো হয়েছিল।]





॥ ১৪ ॥

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা এবং চিত্রবীথি

বছর চল্লিশ আগে ভারতে এসেছিলেন ডঃ এরিক হেরাল্ড। এর পরিচয় হল, ইনি চেকোস্লোভাকিয়ার একজন তরুণ সংগ্রহশালাতত্ত্ববিদ্। ভাবতের সংগ্রহশালার কর্মপদ্ধতি এবং সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য এবং সেই সঙ্গে ভারতের সংগ্রহশালায় সংগৃহীত প্রাচীন শিল্পদ্রব্য ও প্রত্নবস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য তাঁর এই দীর্ঘ পরিক্রমা। ভারতের বিশেষ বিশেষ সংগ্রহশালাগুলি পরিদর্শন করে তিনি মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন যে, ভারতে সত্যিই অনেক সুন্দর মিউজিয়াম আছে কিন্তু সংখ্যায় তা খুবই অল্প। ভারতের প্রায় ৪০ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় মিউজিয়ামের সংখ্যাল্পতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তার নিজের দেশের উদাহবণ সহযোগে দুঃখ করে বললেন যে, ৪০ কোটি লোকের জন্যে ভারতে একশ'টি মিউজিয়াম অর্থাৎ ৪ লক্ষ অধিবাসী পিছু একটি মিউজিয়াম, কিন্তু তাঁর ১৪ লক্ষ অধিবাসীর দেশে আছে পঞ্চাশটি মিউজিয়াম, অর্থাৎ কম করে ৩০ হাজার লোকের জন্যে একটি মিউজিয়াম।

উপরের এই বিবরণ থেকে আমরা একটা বিষয়ই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারছি যে, আমাদের দেশে সংগ্রহশালা চেতনা তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা মিউজিয়াম সংগঠনের ক্ষেত্রে যে পিছিয়ে আছি বা আমাদের যে অগ্রগতির

কোন উল্লেখযোগ্য নজির নেই — এমন নয়। চেক সংগ্রহশালাতত্ত্ববিদ্ ভারতবর্ষে একশটা মিউজিয়মের সংখ্যা দিয়েছেন, (কোথা থেকে এই বিবরণ পেয়েছেন—তা অবশ্য উল্লেখ করেননি) কিন্তু খোদ এই পশ্চিমবঙ্গেই আমরা বর্তমান হিসেবমত প্রায় একশোটি সরকারী ও বেসরকারী সংগ্রহশালার পরিচয় খুঁজে পাই। সরকারী সাহায্যপুষ্ট না হয়েও প্রতিটি জেলার শহরে ও গ্রামাঞ্চলে আমাদের অতীত সম্পদ রক্ষার জন্যে যে সব দেশব্রতীরা সচেষ্ট হয়েছেন, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা বেসরকারীভাবে অথবা গ্রন্থাগার গৃহে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখতে পাই। এছাড়া শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও যে মিউজিয়াম সংগঠনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই — তার এক বড় উদাহরণ হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম।

বর্ধমান জেলার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত প্রত্নতত্ত্বসম্পদ ভূমিতে এতাবৎকাল কোন মিউজিয়ামের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে বর্ধমান রাজবাটিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সূচনা করা হয় তখন এর অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এ বিষয়ে পদাধিকারবলে তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়-আচার্য ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং উপাচার্য শ্রীসুকুমার সেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন ও বিধিমতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্যে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশেষে ১৯৬৫ সালের অগাস্ট মাসে পরবর্তী উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ আই. সি.এস. -এর প্রচেষ্টায় প্রস্তাবিত এই সংগ্রহশালা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। অতঃপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংগ্রহশালার নামকরণ হয় 'মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্ট গ্যালারী' (সংগ্রহশালা এবং চিত্রবীথী) ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়' এবং সংগ্রহশালা পরিচালনার জন্য কিউরেটর পদে নিয়োগ করা হয় বিশিষ্ট প্রত্নবিদ্ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়কে। তারপর স্থানীয় অনেকেই বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। কিন্তু সংগ্রহশালার কর্মনীতির প্রথম কথাই হল তার সংগ্রহ। বর্ধমান রাজবাটির উত্তরাধিকারিগণের কাছ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গোলাপবাগের রাজবাটি এলাকায় শুধু তাঁদের ভূমি ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকা প্রভৃতিরই অধিকার পেয়েছে। তাঁদের মূল্যবান শিল্প-সংস্কৃতির কিছুমাত্রই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আসেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বর্ধমান রাজবাটির এই বিরাট অট্টালিকাগুলির অভ্যন্তরে সামন্ততন্ত্র যুগের না জানি কত কি সম্পদই না আহরিত হয়েছিল। নিদেন এত বড় বর্ধমান মহারাজার এই জমিদারী সেরেস্তার বহু ঐতিহাসিক কাগজপত্রও তো মজুত পাওয়া যেতে পারত, যা দিয়ে আধুনিক ইতিহাসের গবেষকরা বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আবিষ্কার করে চিরাচরিত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের কথা-সামান্য কিছু পাণ্ডুলিপি ও রাজবাড়ি প্রকাশিত কিছু গ্রন্থাবলী ছাড়া তেমন কিছুর অধিকারী হতে পারেনি এই সংগ্রহশালা। এ ছাড়া এত বড় রাজপরিবারের অস্ত্রশালায় অষ্টাদশ শতকের যে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিল তার বিস্তৃত পরিচয় রেখে গেছেন সেকালের ইংরেজ শাসকরা।

বর্ধমান রাজার দখলে এমন একটি তরবারি ছিল যার সম্পর্কে উল্লেখ না করলে

রাজপরিবারের অস্ত্রশস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। এ তরবারির ইতিহাস হল, বর্ধমান শহরের আট মাইল দূরত্বে কামারপাড়ার কর্মকাররা প্রায় তিনশ বছর আগে বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের পিতার কাছে একটি তরবারি বিক্রয়ের জন্য আনেন, কিন্তু তার অসম্ভব মূল্য শুনে তিনি ক্রয় করায় অসম্মতি প্রকাশ করেন। অতএব কর্মকার শিল্পী তা ফেরৎ নিয়ে যাবার সময় রাজবাড়ির মধ্যে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের উপর ঐ তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে আঘাত দেন, যার ফলে গাছটা সম্পূর্ণ কেটে যায় বটে, কিন্তু তা পড়ে না গিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। কিছুদিন বাদে গাছটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবার কারণ রাজা যখন অনুসন্ধান করেন, তখন তার প্রকৃত রহস্য জানতে পেরে ঐ কর্মকারের কাছ থেকে প্রার্থিত মহার্ঘ দামেই তরবারিটি ক্রয় করেন।

এছাড়া কামারপাড়ার তৈরি এমন সব 'ম্যাচলক' বন্দুক তৈরি করা হয়েছিল, যা দিয়ে ১৭৬১ সালে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বর্ধমান মহারাজা তিলোকচাঁদ বাহাদুর তাঁর স্বার্থরক্ষার লড়াই করেন। সুতরাং রাজবাড়ির এই সব অস্ত্রশস্ত্রের কিছু পরিমাণ যদি এই সংগ্রহশালায় জমা হত, তাহলে আমরা বাংলার কর্মকার সমাজের গৌরবময় শিল্পনৈপুণ্যের কথা স্মরণ করে অতীত বাংলার লৌহশিল্প বিষয়ক গবেষণার পথ প্রশস্ত করে তুলতে পারতাম।

কিন্তু রাজবাড়ীর এত সব উল্লেখযোগ্য শিল্প-সম্পদের বিবরণ থাকা সত্ত্বেও মিউজিয়াম এই রাজবাড়ীর কাছ থেকে বিন্দুমাত্র দ্রব্যও লাভ করতে পারেনি। তবে তাতে দুঃখের কোন কারণ নেই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন জেলাগুলি থেকে অতীত ইতিহাসের যে সব সম্পদ এখানে সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যেই এই সংগ্রহশালার একান্ত গৌরববৃদ্ধি ঘটেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগপর্বের সূচনাতে দেখা যায়, বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদের ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়, তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ এবং রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিলিত উদ্যোগে বর্ধমান শহর থেকে ৭টি মূল্যবান মূর্তি সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে একটি হল, কাঞ্চননগর থেকে পাওয়া নবম শতকের বৈশ্ববনের মূর্তি। বর্ধমান মহারাজার তরফ থেকে পাওয়া যায় কিছু মার্বেল পাথরে নির্মিত মূর্তি-ভাস্কর্য এবং কিছু কিছু পরিত্যক্ত তৈলচিত্র, যার মধ্যে দু'একটি ইন্দো-ইউরোপীয় শিল্পধারায় আঁকা মৌলিক চিত্রও আছে। বেড়াচাঁপা, হরিনারায়ণপুর, মঙ্গলকোট ও একুয়ার থেকে প্রাচীন যুগের পোড়ামাটির মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তিকা, পুতুল-খেলনা যেমন এই সংগ্রহশালার বিশেষ সংগ্রহ, তেমনি হেতমপুর, বিষ্ণুপুর, কাঞ্চননগর, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদিও সংগৃহীত হয়েছে। পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্যের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে বহু মূল্যবান দ্রব্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দিনাজপুর থেকে পাওয়া বিষ্ণুপট্ট, সূর্য, বিষ্ণু, চণ্ডী, মনসা ও মহালক্ষ্মী প্রভৃতির মূর্তি, বোলপুর থেকে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পার্শ্বস্থিত অলংকৃত প্রস্তর-ভাস্কর্য, কুড়মুন থেকে সংগৃহীত পাথরের স্তম্ভ, আলমগঞ্জ থেকে অষ্ট মুখলিঙ্গ, মায়াপুর থেকে অপরূপ বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তি। নবস্থা গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে প্রায় আট ফুট উচ্চতার তিন অংশে ভগ্ন এক বিষ্ণুমূর্তি — যা

দর্শকদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এছাড়া সংগৃহীত হয়েছে প্রাক্‌বাংলা, বাংলা ও আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিফলক, পাঞ্চমার্ক মুদ্রা থেকে ইন্ডো-গ্রীক আমলের মূল্যবান সব প্রাচীন মুদ্রা, রাজস্থানী ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ব্রোঞ্জ নির্মিত মডেল প্রভৃতি। পরিশেষে লোকশিল্পের সংগ্রহ হিসাবে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পট, পুতুল এবং কাঠের বিভিন্ন ধরনের মূর্তি প্রভৃতিও সংগৃহীত হয়েছে।

তবে এই সংগ্রহ হয়েছে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এবং দীর্ঘ পবিক্রমায। মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম আর হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং এই সব জেলার উৎসাহী কলেজ অধ্যাপকদের সহযোগিতায় সংগৃহীত হয়েছে এই সব মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার। আর এই সঙ্গেই অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়েছে একুয়ারে ও ভূরিখানোতে — যেখান থেকে পাওযা গেছে তাম্রাশ্মীয় যুগের লাল-কালো রঙের প্রাচীন মৃৎপাত্র এবং দশম-একাদশ শতকের প্রস্তবমূর্তি প্রভৃতি।

অন্যদিকে অজয় নদের তীরবর্তী বর্ধমান জেলাব পাণ্ডুবাজার ঢিবি খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, যা থেকে প্রমাণিত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধুসভ্যতার সমসাময়িক প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগের এক সভ্যতা যেখানে বিরাজমান ছিল। ঠিক অনুরূপ আর এক উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে এই মিউজিয়ামের উদ্যোগে। স্থানটি হল, পানাগড় রেল ষ্টেশন থেকে অদূরে অবস্থিত ভরতপুর। শুধু আবিষ্কৃত নয়, এখানে পরীক্ষামূলকভাবে খননকার্যও করা হয়েছে এবং এর ফলে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে নব্যপ্রস্তর, তাম্রপ্রস্তর ও লৌহযুগের সংস্কৃতি ছাড়াও গুপ্ত আমলের একটি বৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপ ও বুদ্ধমূর্তি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে জনবসতির চিহ্নস্বরূপ লাল-কালো মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, উজ্জ্বল লাল মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির কোশীপাত্র, চিত্রিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, মূল্যবান পাথরের মাল্যদানা, তামার বলয় ও আংটি এবং হাড়ের তীরের ফলা প্রভৃতি। সুতরাং এযাবতকাল এই খননকার্য থেকে প্রমাণিত হরপ্পা পরবর্তী তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার এক ব্যাপক বিস্তার দামোদরের এই তীরবর্তী ভূমিতে প্রসারিত হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক বাংলার বিস্মৃত এই জনপদের ইতিবৃত্ত আজ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালযের সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ একান্তই ধন্যবাদার্হ।

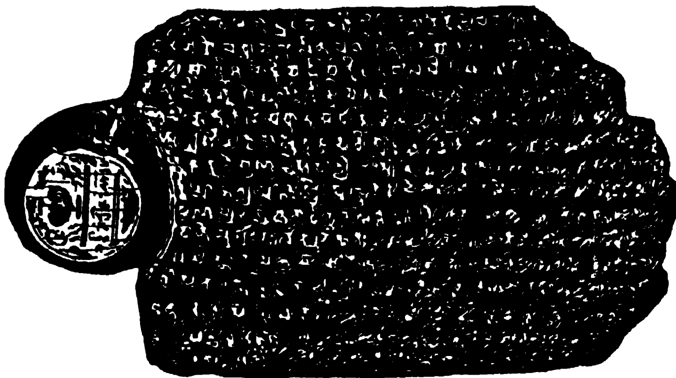
শুধু সংগ্রহ, অনুসন্ধান এবং উৎখননের কাজে এই সংগ্রহশালার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকেনি। যাতে সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহশীল হয়ে উঠতে পারে — সেজন্য বর্ধমান শহরের বিদ্যালয়গুলিতে এই সংগ্রহশালার কিউরেটার তার প্রত্নদ্রব্যের সম্ভারগুলি প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করেছেন। সংগ্রহশালার গ্রন্থাগারটিতে একদিকে যেমন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে, তেমনি ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রায় এক হাজার পুস্তকও সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই সংগ্রহশালাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'দি স্কুল অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজ'। তার উদ্বোধন ও প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় সংগ্রহশালাতেই ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে। সংরক্ষিত ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির এবং সেই সঙ্গে মুদ্রা, টেরাকোটা, ও চিত্রনিদর্শনগুলি নিয়ে দু'দুটি

সচিত্র তালিকা প্রণয়নের কাজ চালাচ্ছেন বর্তমান কিউরেটর রঙ্গনকান্তি জানা। এ ছাড়া সংগ্রহশালায় সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য দ্রব্যগুলি সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টি আকর্ষণের এবং আরও গবেষণার জন্য ভূতপূর্ব মিউজিয়ম-কিউরেটর শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত বিভিন্ন বৎসরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের কার্যবিবরণী স্মারক পুস্তিকায় যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী হল, (১) Vaisvavana, image in the collection of University Museum, Burdwan (২) Two bronze images of Pala-Sena period (৩) Three stones-sculpture of Post-Gupta period (৪) Gold coin of Chandragupta from Adrahati village in the district of Burdwan প্রভৃতি।

তবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংগ্রহশালার এখন প্রধান সমস্যা হল তার নিজস্ব গৃহের। বর্ধমান মহারাজার মুসলমান খাতক-প্রজাদের জন্য একদা নির্দিষ্ট পূর্বতন অতিথিশালায় এই মিউজিয়াম গৃহটি অবস্থিত, তাই স্বল্প পরিসরে এত অধিক সংখ্যক দ্রব্য যেমন প্রদর্শনের অসুবিধে, অন্যদিকে তেমন সংগৃহীত দ্রব্য মজুত রাখার স্থান সঙ্কুলানেরও অভাব। সেজন্য কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের কাছে ১৮ লক্ষ টাকার গৃহনির্মাণের এক পরিকল্পনা দাখিল করেছেন। স্থিরীকৃত হয় যে, নবরূপে এই সংগ্রহশালার নামকরণ হবে 'আঞ্চলিক সৃষ্টিধর্মী শিল্পকেন্দ্র' (রিজিওন্যাল ক্রিয়েটিভ আর্ট সেন্টার)। সব কিছু মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মিউজিয়াম বঙ্গ সংস্কৃতি রক্ষার্থে যে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছেন অদূর ভবিষ্যতে একদিন বঙ্গের গৌরব রক্ষায় তা যে এক জীবন্ত জ্ঞানপীঠ হিসাবে গড়ে উঠবে — সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি পোড়ামাটির গজশার্দুল মূর্তি (খ্রীঃ ১৮শ শতক)]





॥ ১৫ ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংগ্রহশালা ঃ মেদিনীপুর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবশ্য করণীয় কার্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বলেছিলেন, বাংলা দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে সাহিত্য পরিষদের একটি করিয়া শাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল শাখা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের আলোচনা ছাড়াও প্রধানত তন্ন তন্ন রূপে স্থানীয় সমস্ত বিবরণ এবং রক্ষাযোগ্য প্রাচীন পুঁথি ঐতিহাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশ স্মরণে রেখে মেদিনীপুর শহরের কতিপয় সাহিত্যানুরাগী ও ইতিহাসপ্রেমীরা একদা যে সাহিত্য সমাজটি গঠন করেছিলেন, সেটি পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি ব্যোমকেশ মুস্তাফীর উদ্যোগে সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে অঙ্গীভূত হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

সুতরাং মেদিনীপুরে এই সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হয় সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতি এবং দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনই এই শাখা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু নিজস্ব ভবন না থাকায় শাখা পরিষদের কাজকর্মের অসুবিধের কারণে বিষয়টি নিয়ে একটি পরিষদ ভবন নির্মাণকার্যের তাগিদে পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের (১৮ই ফাল্গুন, ১৩২৭) দ্বিতীয় দিনের সভায় মূল পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহোদয় এই অভাব বিশেষভাবে লক্ষ করে সভাস্থলে এই অভাব মোচনের জন্য দেশবাসীর নিকট কাতর আবেদন করেন। কাঁথির 'নীহার' পত্রিকায় (২৪.৮.১৯২০) এ বিষয়ে লেখা হয়েছিল ",... (তিনি) স্বয়ং অগ্রণী হইয়া নগদ চাঁদা দিয়া সকলের নিকট অর্থ ভিক্ষা করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ও উক্ত আবেদনে সাড়া দিলে সভাস্থলেই কিছু টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং প্রায় ৫০০ টাকা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় খ্যাতনামা উকিল পরলোকগত ˆকার্তিকচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের

দ্বিতীয় পুত্র শাখা পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি.এল. মহাশয় মন্দির নির্মাণোপযোগী দুই বিঘা ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মন্দির নির্মাণোপযোগী স্থান পাইলেও নির্মাণকার্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ জন্য আনুমানিক ৮০০০ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক। যে মেদিনীপুর বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বুকে করিয়া ধন্য; যেখানে দানশীল রাজা, জমিদার ও পরার্থে মুক্তহস্ত ব্যক্তির অভাব নাই, সে দেশে সামান্য অর্থাভাবে যদি একটি স্থায়ী সাহিত্যের সাধনা মন্দির নির্মিত না হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই আজ আমরা দেশের রাজা, জমিদার, জনসাধারণ সকলেরই নিকট ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া উপস্থিত। যাঁহার যাহা সামর্থ্য, তিনি তাহাই দিয়া আমাদের এই সদনুষ্ঠানের সহায় হউন এবং দেশের মুখোজ্জ্বল করুন।

যিনি যাহা দিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে। কোষাধ্যক্ষ শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র, কেরাণীটোলা, শ্রী উপেন্দ্রনাথ মাইতি, রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেব, ডাক্তার শচীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মৌলভী সমানুদ্দিন আহম্মদ, শ্রী রমেশ চন্দ্র মিত্র।''

উল্লেখ্য যে, মেদিনীপুর শহরে একটি স্থায়ী সংগ্রহশালা নির্মাণের জন্য ১৯২০ সালে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, অনুরূপ ১৯২৩ সালে দেখা যাচ্ছে মেদিনীপুরের দক্ষিণপ্রান্ত কাঁথি এলাকায় একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন খেজুরীর মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়। মহেন্দ্রনাথ করণের কথা আজ দেশবাসী বিস্মৃত হলেও হিজলীর ইতিহাস রচনায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা বাঙ্গালীর একান্ত গৌরবের। দেশের এমন একজন অখ্যাত ঐতিহাসিক সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ না থাকলেও একদা প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর স্বচ্ছ ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'শ্রমশীলতা অপেক্ষা আরও একটি মহত্তর ও দুর্লভগুণ মহেন্দ্রনাথের ছিল। তিনি প্রত্যেক তথ্যকে পরীক্ষা করিয়া তাহার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, অতি নির্মমভাবে জনপ্রিয় মিথ্যা প্রবাদকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকে হয়ত নীরস করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে ইহার স্থায়ী মূল্য বাড়িয়াছে। মহেন্দ্রনাথের এই কঠোর সত্য সন্ধান ব্রতের প্রমাণ পাইয়া আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই।'

শুধু হিজলীর ইতিহাস রচনার মধ্যেই মহেন্দ্রনাথের পরিচয় নয়, তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উন্নতি বিধানের জন্যও নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। এছাড়া প্রদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করে জাতির অতীত সম্মান জাগ্রত করার জন্য তিনি যেসব চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল কাঁথি শহরে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রচেষ্টা। মহেন্দ্রবাবুর এই উদ্যোগের পরিচয় জানা যায়, কাঁথি থেকে প্রকাশিত 'নীহার' পত্রিকায় (৯.১০.১৯২৩) প্রকাশিত তাঁর এক আবেদন থেকে। সেই আবেদনে বলা হয়েছিল ''..... দারিয়াপুরের ভগ্ন মসজিদের অপহৃত শিলালিপিগুলি সম্পর্কে তথ্য জিজ্ঞাসু হইয়া আমি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পরিচালিত কাঁথি ক্লাবের উদ্যমের একাংশ দেশের প্রত্নসম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ...সেদিন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত আমার আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার

নিকট অবগত হইলাম, নূতন একটি হল নির্মাণ দ্বারা ক্লাব ভবনের আয়তন বৃদ্ধি করা হইতেছে। আমার মনে হয় উক্ত হলঘরের একাংশ মিউজিয়াম বা প্রত্ন (চিত্রশালা) দ্রব্যাগার-রূপে ব্যবহার করিলে ক্লাবের পক্ষে একটি স্থায়ী গৌরবজনক কার্য করা হইবে।

হিজলী, বাহিরী প্রভৃতি স্থানে খনন করিলে অনেক পুরাদ্রব্যের নিদর্শন মিলিতে পারে। দেশের ইতিহাস চর্চার পক্ষে সেগুলি মণিমানিক্য অপেক্ষাও মূল্যবান। ..... বিস্তৃত কাঁথি মহকুমার ভগ্ন মন্দির-মসজিদে, প্রাচীন পুষ্করিণী আদির লোক বিখ্যাত নামের মধ্যে, জনপ্রবাদে, কাঁথিবাসীর দৈনন্দিন জীবনধারার আচার-ব্যবহারের কত অজ্ঞাত ঐতিহাসিক ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কাঁথির অভিজাত ও সুধিবৃন্দ পরিচালিত কাঁথি ক্লাবের মধ্যে 'হিজলী অনুসন্ধান সমিতি' অভিধেয় একটি মহানুষ্ঠানের জন্মলাভ দুরাশা নহে। এই সমস্ত ভগ্ন মৃৎপাত্র ও প্রস্তর খণ্ড এবং জীর্ণ পুঁথি-পত্রাদির সংগ্রহাগারের জন্য কাঁথি সাহিত্যামোদিগণের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে। এই সমস্ত 'অকেজো' জিনিষ কাঁথির সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্যের স্থান লাভ করিবে।"

হায়, কাঁথিতে মহেন্দ্রনাথ করণের উদ্যোগে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা সফলকাম হয়নি। আমরা জানিনা, আলোচ্য এই কাঁথি ক্লাব তার সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কার্যধারা কতদূর বিস্তার করতে পেরেছিলো? তবে বোঝা যায় স্থানীয় পুরাবস্তুগুলি সংগ্রহের যে কি মূল্য তা কাঁথির অভিজাত প্রতিষ্ঠান কাঁথি ক্লাব অনুধাবন করতে সক্ষম হননি, যা একান্তই দুঃখের। কাঁথিতে সেজন্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা স্থাপনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, মহেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে সেটি অঙ্কুরেই এইভাবে বিনাশ ঘটে।

কাঁথিতে মিউজিয়ম স্থাপনের এই প্রচেষ্টা বানচাল হলেও, মেদিনীপুর শহরে সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্যোগ অনেকটাই পরিণত আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যেই পাটনা বাজারে সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্যোগে অস্থায়ীভাবে এক গৃহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা চলতে থাকে প্রাচীন পুঁথি, পাথরের মূর্তি, মুদ্রা ও অন্যান্য পুরাবস্তু প্রভৃতি। অন্যদিকে, এই সময় জেলার জেলাশাসক পদে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন বিনয়রঞ্জন সেন আই. সি.এস। তাঁর প্রচেষ্টায় মালদা জেলার নানাস্থানে প্রাপ্ত বিবিধ মূর্তি-ভাস্কর্য সংগৃহীত হয়ে মালদা শহরে বি. আর. সেন মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে। এখানে বদলি হয়ে আসার পর তাঁর প্রথম কাজ হয় মেদিনীপুরের সিংহশিশু বিদ্যাসাগরের বীরসিংহ গ্রামের বেদখল বাস্তুভিটা উদ্ধার করে সেখানে একটি স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করা। যেমন ভাবা তেমনি সেটি কার্যে রূপায়ণও তিনি করেন; বিদ্যাসাগরের বাস্তুভিটা উদ্ধার করে সেখানে সরকারী উদ্যোগে নির্মিত হয় বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন। এরপর তিনি মেদিনীপুর শহরেও বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির স্থাপনের এক প্রচেষ্টা শুরু করেন। শহরের পুরানো কেল্লার উত্তরে এবং হাসপাতালের নিকটবর্তী স্থানে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ পরিকল্পনা মত এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর এই ভবনটির উদ্বোধন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যেসব বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও

ঐতিহাসিকরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, স্যার যদুনাথ সরকার, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রী সজনীকান্ত দাস, শ্রীঅনিল চন্দ্র ও শ্রীসুধাকর রায়চৌধুরী প্রমুখ মনীষীগণ।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনের দ্বাব উদঘাটনপূর্বক কবি বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিবেদন করেন, " ...... সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীযতা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পবিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালীর নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্য পালনের সুযোগ ঘটাবার জন্য বিদ্যাসাগরের জন্ম প্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে আমি তার দ্বারোদঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে তাব একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গ সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ....।"

পরবর্তী পদক্ষেপে এই বিদ্যাসাগর ভবনের এক অংশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার উদ্যোগে সংগৃহীত পুরাবস্তুগুলিকে নিয়ে একটি প্রত্ন-সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়। এ সংগ্রহশালায় সংগৃহীত পাথরের মূর্তিরাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, নটরাজ, জৈন ঋষভনাথের দুটি মূর্তি প্রভৃতি। এছাড়া টেবাকোটা ফলকের মধ্যে দেখা যায়, চন্দ্রকোণা এলাকা থেকে প্রাপ্ত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মনসা মূর্তি ও নৌকাবিলাস সম্পর্কিত দুটি পোড়ামাটির ফলক। ১৯৫৫ সাল নাগাদ জজকোর্টের কাছে এক কুয়োর মধ্যে প্রাপ্ত দুটি মাটির প্রদীপ সংগ্রহশালায় দান করেন গয়লাপাড়ার শ্রীকিশোরীমোহন হাতী। তাছাড়া জনৈক ব্যবসায়ী শ্রী চিত্তরঞ্জন রায় নালন্দা থেকে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির শিল সংগ্রহশালায় দান করেন। ফার্সী লিপিযুক্ত পাথর খোদাই একটি মসজিদ-প্রতিষ্ঠাফলক এ সংগ্রহশালার এক সম্পদ। বিভিন্ন মুদ্রার যে সংগ্রহ এখানে দেখা যায় সেগুলি পরিষদের সভাপতি শ্রীমনীষীনাথ বসু সরস্বতী কর্তৃক প্রদত্ত। এ সংগ্রহশালায় সংগৃহীত বাংলা পুঁথির সংখ্যা ২০১টি এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা প্রায় পাঁচশতাধিক।

সংগ্রহশালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন কতৃর্ক প্রদত্ত শশাঙ্কের রাজত্বকালীন মহাসামন্তগণের দেওয়া দুটি তাম্রশাসন। এ দুটি তাম্রশাসন কিভাবে আবিষ্কৃত হল তার ইতিহাসও বেশ কৌতুকাবহ। বিগত ১৯৩৭ সালের কোন এক সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বন্দুক লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য দরবার করতে আসেন জেলার মোহনপুর থানার এলাকাধীন আঁতলা গ্রামের সুরত খাঁ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁকে বলেন যে, তার এলাকায় যদি কোন পাথরের হিন্দু ঠাকুর বা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কোন কিছু প্রাচীন দ্রব্য পাওয়া যায় তার খবর আনলে, বন্দুক লাইসেন্স তরান্বিত করে দেওয়া হবে। ভগ্ন মনোরথ সুরত খাঁ সে সময় কোন উপযুক্ত জবাব না দিয়ে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বললেন যে, মাটি কাটার সময় তিনি দুটো তামার কোদাল পেয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর কথা শুনে বলেছিলেন তামার কোদাল যদি পেয়ে থাকেন তা আমাকে দেখান। সুরত খাঁ তাঁর কাপড় জড়ানো পুঁটলি খুলে শশাঙ্কেব আমলের দুটি তাম্রশাসন বের করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে মেলে ধরলেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. আর. সেন সেই তামার কোদাল দেখে লাফিয়ে উঠলেন; বুঝতে পাবলেন সেটি তামার কোদাল নয় প্রাচীন কোন তাম্রশাসন। পবে তিনি তাম্রশাসন দুটিকে পাঠোদ্ধারের জন্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারেব কাছে পাঠিয়েছিলেন। এইভাবে আবিষ্কৃত এই সংগ্রহশালায় শশাঙ্কের আমলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন সংগৃহীত হয়ে বর্তমানে পরিষদ সংগ্রহশালায় শোভাবর্ধন করছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখার পক্ষ থেকে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতি হল, বিনোদশঙ্কর দাস রচিত 'জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুরের গণ বিক্ষোভ' (১৯৬৮ খ্রীঃ) গ্রন্থের প্রকাশ। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি শশাঙ্কের নামাঙ্কিত তাম্রপট্ট]





।। ১৬ ।।

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র

তমলুকের কথা মনে হলেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। পালি ভাষায় রচিত খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর 'দীপবংস' এবং খ্রীস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের 'মহাবংস' নামের দু'খানি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাট অশোক পাটলিপুত্র থেকে তাম্রলিপ্তে এসে সেখানকার বন্দর থেকে সিংহলে বোধিবৃক্ষ পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন-চাঙ উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি তাম্রলিপ্তে পৌঁছে সেখানে অশোক নির্মিত স্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে আরও এক চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এসেছিলেন তমলুকে এবং তখন সেখানে বত্রিশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন বলে তার ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কথাসরিৎসাগর-এর এক কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে তাম্রলিপ্তিকা পূর্বাম্বুধির অদূরে অবস্থিত এক নগরী। 'দশকুমারচরিত'-এর মতে দামলিপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

সেজন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অনুমান যে, সেকালের বিবিধ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং বিদেশী পর্যটনকারীদের এইসব বিবরণে বিভিন্ন নামে উল্লেখিত সে সময়ের সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, তাম্রলিপ্তিকা, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্ত, তমোলিপ্তী, তমোলিপ্তি, তমোলিতি, তম্মোলিতি, দামলিপ্ত, তমালিটিস, টলিকটেই ও তম্বলুকই সম্ভবতঃ আজকের এই তমলুক।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের এ অনুমানের পিছনে আরও যেসব যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে তা হল, এই তমলুক শহর ও তার আশপাশের এলাকায় বহুবিধ প্রত্নসম্পদ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কারের ফলে এ স্থানটি আজ ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনুসন্ধানলব্ধ প্রাচীন পুরাবস্তু উদ্ধার ছাড়াও ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ তমলুকে পরীক্ষামূলক উৎখনন করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানাবিধ পাথরের হাতিয়ার ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক কালের যেসব পুরাবস্তু উদ্ধার করেছে, সেগুলি এখানকার অতীত ইতিহাসের এক বিস্ময়কর সাক্ষ্য।

কিন্তু আজকে কোন পর্যটক তমলুক শহরে গেলে দু'একটি শেষ মধ্যযুগের মন্দির-স্থাপত্য ছাড়া প্রাচীনত্বের আর কোন নিদর্শনই খুঁজে পাবেন না। তবে তমলুক ও তার আশপাশে মাটির তলা থেকে যেসব প্রাচীনকালের প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলির নিদর্শন দেখা যেতে পারে তমলুক শহরে স্থাপিত তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার -এ।

আলোচ্য এই সংগ্রহশালা স্থাপনের পিছনে স্থানীয় উৎসাহীদের নিরলস প্রচেষ্টাই যে সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সে প্রচেষ্টার ইতিহাসও বেশ চমকপ্রদ। আসলে এতসব প্রত্নবস্তু তমলুকে পাওয়া গেলেও, সেগুলি ইতিমধ্যে কলকাতার বিভিন্ন মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র স্থানীয় বাসিন্দা হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় (টুনু বাবু) আগ্রহী হয়ে এখান থেকে যেসব পুরাবস্তু উদ্ধার করেছিলেন তাই দিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় 'সতীস্মৃতি সংগ্রহশালা' নামে একটি ছোট খাটো সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের উত্তরোত্তর এ বিষয়ে আগ্রহের কারণে তমলুকে একটি পুরোদস্তুর প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এর ফলে তমলুক কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এবং তাঁর দুই সহযোগী ছাত্র প্রদ্যোৎকুমার দে ও কমলকুমার কুণ্ডু অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে একটি সার্থক সংগ্রহশালা স্থাপনে মনোযোগী হন। এইসঙ্গে তমলুক স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মচারী প্রশান্তকুমার মণ্ডল মিউজিয়াম সংগঠনের কাজে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহের কাজে আরও যারা উৎসাহীর ভূমিকা গ্রহণ করেন তারা হলেন, একজন পানবিড়ি দোকানের মালিক শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র প্রধান এবং অন্যজন ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সামান্য কর্মচারী শ্রী আশুতোষ মাইতি। এই উৎসাহী দু'জন সাইকেলে চড়ে বা পদব্রজে তমলুকের কাছাকাছি রূপনারায়ণ তীরবর্তী ইছাপুর, দনিপুর, অমৃতবেড়িয়া, বাঁকা, নাটশাল প্রভৃতি এলাকা থেকে সংগ্রহ করে আনেন অনেক বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। বলতে গেলে এই সংগ্রহশালার আজ যে সংগ্রহ তার প্রায় অধিকাংশই সংগৃহীত হয় প্রশান্ত, আশু ও লক্ষণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

মিউজিয়ামের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। প্রথমদিকে সেটি স্থাপিত হয় সংগ্রহশালার জনৈক সদস্যের মেসবাড়িতে। তারপর ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তমলুক পৌরসভার কর্তৃপক্ষ মিউজিয়ম সংগঠনের জন্য বিনা ভাড়ায় দু'খানি ঘর ছেড়ে দেওয়ায় সেখানেই মিউজিয়মের সংগৃহীত পুরাবস্তুগুলি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। সেকালের সেই আদিমকাল থেকে মৌর্য-শুঙ্গ যুগের কত

না পুরাবস্তুই এখানে সংগৃহীত হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এখানে এলে দেখা যেতে পারে, পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ বেশ কিছু মূর্তি ফলক, যক্ষ-যক্ষী ও দেবদেবীর মূর্তি আর সেই সঙ্গে সেকালের সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র-ফলক। এছাড়া আছে, কত না ধরনের সেকালের ভগ্ন ও অভগ্ন মৃৎপাত্রের নমুনা, পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্যসহ আরও অনেক রকমেব পুরাবস্তু, দেখে যেন শেষ করা যায় না।

এখানকার মিউজিয়ামে প্রদর্শিত এইসব বস্তুগুলি দেখতে দেখতে এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যাবে, যেখানে প্রদর্শিত হয়েছে কতকগুলি হাড়ের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র। বেশ বোঝা যায়, হরিণের শিং বা কোন জন্তুর হাড় থেকে এসব অস্ত্র বানানো হয়েছিল। কি হোত এসব হাড়ের তৈরি অস্ত্র নিয়ে—এ প্রশ্ন থেকে যায়। একটা চওড়া ধরনের হাড়ের ফলার একদিকে পরপর বর্শা ফলকের মত খাঁজকাটা আছে। বলা হয়েছে এগুলো হল সেকালে মাছ শিকারের 'হারপুন' হিসাবে ব্যবহৃত অস্ত্র। এইসঙ্গে আছে সরু হাড়ের তৈরি সামান্য লম্বা একদিকে সূচালো ধরনের অসংখ্য শলাকা — যা দেখে মনে হয় লাঠির ডগায় এগুলো গেঁথে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। লক্ষ করলে বোঝা যায়, এক সময়ে এমন কোন সরু হাড়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে চেঁচেছুলে যে ফলা বানানো হয়েছিল তার চিহ্নও বর্তমান। আবার দেখা যাচ্ছে, হাড়ের একদিকটা এমনভাবে ছুরির মত ধারালো করার চেষ্টা হয়েছে। সম্ভবত সেগুলি কোনসময়ে ব্যবহার করা হ'ত চাঁচনি অর্থাৎ 'স্ক্র্যাপার' হিসেবে। কতকগুলি হাড়কে আবার টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে সরু সরু ফলা তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে মাটির তলায় থাকতে থাকতে এগুলির মধ্যে বেশ কিছু নিদর্শন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

আরও কিছু হাড়ের দ্রব্য আছে, সেগুলির উপর খোদাই করা হয়েছে নানান নকশা। এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা হরিণের শিং-এর উপর উৎকীর্ণ করা হয়েছে কোন এক হরিণের মুখাবয়ব। আবার কোন একটা হরিণের শিং-এর উপর খোদাই করা হয়েছে কোন এক নারীর মুখের আদল। নব্যপ্রস্তর যুগের তিন কোনা অস্ত্রের মত একটা হাড়ের টুকরোয় আবার লাল-কালোতে নকশা আঁকা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই শিল্পকর্মের নিদর্শন ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেছেন, এসব খুবই প্রাচীন, হয়ত বা মেসোলিথিক পর্বের মানব সভ্যতার নিদর্শন। প্রসঙ্গত অধ্যাপক সাংকালিয়া মন্তব্য করেছেন যে, বাংলার শিল্প পরিক্রমার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে, ভগ্ন-অভগ্ন নানান ধরনের পাত্র। প্রাগৈতিহাসিক কালের একটি মালসা ধরনের পাত্র, যা লাল-কালো রঙে চিত্রিত এ মিউজিয়ামের এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ । এছাড়া উত্তর ভারতীয় কালো চকচকে এবং 'রুলেটেড' ধরনের বেশ কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তমলুক ও তার সন্নিহিত এলাকায়, যা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। কতকগুলি মৃৎপাত্রের গায়ে আবার জীবজন্তু, গাছপালা, বৃত্ত ও অর্ধবৃত্ত প্রভৃতি উৎকীর্ণ নকশা বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করে। এর মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ হল, ব্রাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ এক মৃৎপাত্র। এছাড়া খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠশতক পর্যন্ত সময়ে নির্মিত বৌদ্ধ জাতক ও মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে উৎকীর্ণ নানাবিধ পোড়ামাটির ফলক এ সংগ্রহশালার এক সম্পদ। উল্লেখ্য যে, বিলেতের অক্সফোর্ডের ইন্ডিয়ান

ইনস্টিটিউট-এ 'অক্সফোর্ড যক্ষিণী' নামে যে বিখ্যাত পঞ্চচূড়া যক্ষিণী-ফলকটি দেখা যায় সেটি তমলুক থেকে সংগৃহীত বলেই জনশ্রুতি।

সংগ্রহশালার সংগঠকরা সংগ্রহ করেছেন একটি ক্ষয়প্রাপ্ত তাম্রশাসন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এই তাম্রপটটি দেখে যা মন্তব্য করেছেন তা একান্তই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন "..... এইরূপ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একখানি তাম্রশাসন সম্প্রতি সংগ্রহশালার কর্মীরা সংগ্রহ করেছেন। এজন্য তাঁরা অবশ্যই ঐতিহাসিক সমাজের ধন্যবাদের পাত্র; কারণ শাসনটি ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর অর্থাৎ ১৩।১৪ শত বৎসর পূর্বের একখানি অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিদানপত্র। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দলিলটির অবস্থা এখন এমন যে, এর সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার কখনও সম্ভব হবে না। ঐ যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যার নিম্নাঞ্চলে গৌড়েশ্বর গোপচন্দ্র ও শশাঙ্কের অধিকার বিস্তারের সামান্য সামান্য ইঙ্গিতমাত্র আমরা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি। ঐ ক্ষতিগ্রস্ত তাম্রপত্রটি সমস্যাটির উপর নূতন আলোকপাত করবে আশা করা গিয়েছিল। যা হোক, ঘটনাটি থেকে সংগ্রহশালার প্রযোজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং তার কর্মীদের দায়িত্ব কিছু বোঝা গেল। সংগ্রহালয়ের সংস্পর্শে এসে এতো প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী দেখে দেশের অজ্ঞ জনসাধারণও ধীরে ধীরে সেগুলির মূল্যবিষয়ে সজাগ হয়ে উঠবে, এই আমরা আশা করি।"

মিউজিয়ামে সংগৃহীত তাম্রকুঠারটি প্রাগৈতিহাসিক কালের কোন এক সময়ে তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন, তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়। এছাড়া এ সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে মূল্যবান পাথরের পুঁতি, পাথর ও হাড়ের মাল্যদানা, গুপ্তযুগের ব্রাহ্মীলিপি মুদ্রিত মুদ্রাঙ্ক এবং দশম-একাদশ শতাব্দীর ব্রোঞ্জের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দেবীমূর্তি।

এ সংগ্রহশালায় প্রত্নসামগ্রীর পাশাপাশি সংগৃহীত হয়েছে নানান লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের নিদর্শন যথা, পট, পুতুল, শিঙ-এর চিরুনি, মাদুর ও গয়না বড়ির সম্ভার। সংগৃহীত হয়েছে বহু তুলট কাগজে হাতে লেখা পুঁথি।

এ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে ইংরেজি ও বাংলায় মুদ্রিত সচিত্র দুটি ফোল্ডার। এছাড়া যেসব গবেষণা গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা নিম্নরূপ : ১. The Archaeological Treasures of Tamralipta, ২. Interpretation of Terracottas From Tamralipta. ৩.Art and Artifacts of Bone and Antler. ৪. তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ (১৮৭৩) (পুনর্মুদ্রিত) প্রভৃতি।

প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য ও বর্তমান লোকশিল্প-হস্তশিল্প প্রভৃতির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন ও তার প্রকাশনার মাধ্যমে এতদ্ঞ্চলের যথাযথ ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র যে পথে অগ্রসর হয়েছে সে প্রচেষ্টাকে আমরা সর্বতোভাবে স্বাগত জানাই। সুখের কথা, সংগ্রহশালাটির সুষ্ঠভাবে পরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। □

[* অধ্যায়ের শিরনামে অঙ্কিত স্কেচটি মৃৎভাণ্ডের উপর উৎকীর্ণ মস্তক মূর্তি (আঃ গুপ্তযুগ)]



॥ ১৭ ॥

চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা

উত্তর চব্বিশ-পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার এলাকাধীন একটি জনপদ বেড়াচাঁপা। এ স্থান নামটিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। লোকে বলে এখানে এক সময় চন্দ্রকেতু রাজার রাজত্বে পীর গোরাচাঁদ তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছিলেন বেড়ার গায়ে চাঁপাফুল ফুটিয়ে, তাই এ স্থানের নাম হয়েছে বেড়াচাঁপা। কিন্তু কিংবদন্তীর এ মাহাত্ম্য ছাড়াও এখানকার নাম আজ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানের মাটির তলায় অগাধ প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য লুকিয়ে থাকার জন্য। বলা যেতে পারে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে বেড়াচাঁপা আজ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আগে এখানে আসতে হলে ভরসা ছিল মার্টিন কোম্পানির ছোট রেল, এখন সে ট্রেন কবেই উঠে গেছে, পরিবর্তে শ্যামবাজার বা এসপ্লানেড থেকে বাসে বারাসত হয়ে এখানে আসা যায়।

বেড়াচাঁপার বিখ্যাত স্থান হল চন্দ্রকেতুর গড়, যার প্রাচীনত্ব নিয়ে নানান কিংবদন্তী। বাস্তবে মাঝে মাঝে মাঠেঘাটে ভূমি কর্ষণের সময় বা মাটি ধ্বসে যাওয়ার কারণে বেরিয়ে পড়ে নানান পুরাবস্তু, মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক বা মৃৎপাত্র প্রভৃতি। এইসব প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির সূত্র ধরে ১৯০৬ সালে এখানে অনুসন্ধানে আসেন ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ভারপ্রাপ্ত লঙ হার্স্ট সাহেব। তিনি স্থানটি পরিদর্শনান্তে মন্তব্য করেছিলেন, ".... This was one of the earliest settlement in lower Bengal." এর ঠিক বছর তিনেক বাদে ১৯০৯ সালে চন্দ্রকেতুগড়ে পদার্পণ করলেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সেদিন সহযোগী ছিলেন, তাঁর ফার্সী শিক্ষক মৌলভী-খয়র-উল আলম এবং সুহৃদ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। বেড়াচাঁপায় ভ্রমণ পরিক্রমার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন , " ...... কলিকাতা হইতে বারাসত-বসিরহাট রেলে অতি সহজেই যাওয়া যায়। বেড়াচাঁপা স্টেশনে নামিয়া এক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে যাইলেই চন্দ্রকেতু গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পৌঁছানো যায়।..... স্থানীয় লোকের নিকট হইতে নৃপেন্দ্র বসু যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও পুরাতন।

...... যে স্থানটি এখন চন্দ্রকেতুর গড় বলিয়া পরিচিত তাহা দূর হইতে দেখিলে একটি পুষ্করিণীর পাড় বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু নিকটে যাইলে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহা যে পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

চন্দ্রকেতুগড়ে যে সমস্ত অতি প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, স্থানটি ভারতবর্ষের অতি পুবাতন স্থানগুলির অন্যতম।"

রাখালদাস চন্দ্রকেতুগড় এলাকা পরিদর্শনে এসে বেশ কিছু পুরা-নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালায় প্রদর্শনের জন্য উপহার দেন। এইসব পুরাবস্তুগুলির এক তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচিত এবং চিত্রশালা প্রকাশিত এক পুস্তিকায়, যার শিরনাম হল, 'Descriptive Catalogue of Sculptures and Coins in the Museum of Bangiya Sahitya Parisad' (1911).

রাখালদাসের মতই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তুলে ধরলেন চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্ন-ঐশ্বর্যের কথা। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার পূর্বে জয়নগর-মজিলপুরের প্রত্নতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্ত চন্দ্রকেতু গড় পরিদর্শনে এসে এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিলেন।

কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম তখন অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর পরিচালনায় উৎখনন কার্য চালাচ্ছিলেন। এদিকে দেশভাগের জন্য রেলপথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যাতায়াতের অসুবিধের কারণে বাণগড়ের খননকার্য মুলতবী করে দেওয়া হয় এবং কাছাকাছি কোন এক উপযুক্ত স্থানে খননকার্যের উদ্দেশ্যে খোঁজ-সন্ধান চলতে থাকে। কালিদাস দত্ত মশাই তখন আশুতোষ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষকে চন্দ্রকেতুগড় উৎখননের জন্য পরামর্শ দেন। মূলত তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরামর্শে. ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক প্রভাস মজুমদার এই প্রাচীন জনপদে উৎখননের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার জন্য এ স্থানটি পরিদর্শনে আসেন এবং এখানের পুরাতাত্ত্বিক সম্পদের পরিচয় পেয়ে এখানে খননকাজের সুপারিশ করেন।

ইতিমধ্যে চন্দ্রকেতুগড়ের আশপাশ থেকে পাওয়া যেতে থাকে পোড়ামাটির নানান মৃৎপাত্র এবং বিশেষ করে পোড়ামাটির মূর্তি উৎকীর্ণ ফলক ও পুতুল। প্রত্নবিদ্‌রা সেগুলির মূল্যায়নে এগিয়ে এসে বললেন, এসব প্রত্নবস্তু মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের। ১৯৫৬-৫৭ সালে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষে খনন কার্য শুরু হল, যার ফলে উদ্ঘাটিত হল, নদী-বন্দর মাত্রিক চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়।

চন্দ্রকেতুগড়ে খননকার্য এখানেই থেমে রইল না। কাছাকাছি বেড়াচাঁপায় এক উঁচু

ঢিবিকে লোকে বলতো দমদমা ঢিবি, অর্থাৎ গ্রামের মানুষেব কাছে উঁচু ঢিবি মাত্রই নামকরণে ভূষিত হয়ে থাকে দমদমা। কেউ আবার এ ঢিবিকে বলেন বরাহমিহিরের বা খনা মিহিরেব ঢিপি। ঢিবির ভিতব কি আছে তা জানাব জন্য সাধাবণ মানুষেব কৌতূহলের অন্ত নেই। আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে খনিত্রের আঘাত পড়লো এই উঁচু ঢিবিতে। আবিষ্কৃত হল গুপ্ত যুগের এক বিশাল মন্দিরেব ধ্বংসাবশেষ। এরই ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষেব আগ্রহ ক্রমশ বাড়ে। দেশ-বিদেশ থেকে আগত উৎসাহীরা বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় পরিদর্শনে আসতে থাকে।

কিন্তু এখানে খনা-মিহিরের ঢিবির গর্ভে আত্মগোপন করে থাকা গুপ্ত আমলের বিধ্বস্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ততদিনে খুঁড়ে বের করা হয়েছে। আসলে এই একটি দ্রষ্টব্য ছাড়া, চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত পুরাবস্তু তো দেখতে পাওয়া খুবই সমস্যার বিষয় এবং যথাযথ সুযোগও তো মেলে না। স্থানীয় ভাবে এক উৎসাহী যুবক দিলীপকুমার মৈতে বহুদিন ধরেই এখানকার নানাবিধ পুরাবস্তু সংগ্রহ করে চলেছিলেন। তিনিই বেড়াচাঁপায় আগত সাধারণ দর্শকদের এই অসুবিধের কথা ভেবে বিগত ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে নিজস্ব একক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করলেন চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা। শুধু সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠাই নয়, চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করার জন্য তিনি কয়েকটি পুস্তকও রচনা করলেন। শুরু হল, চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালার জয়যাত্রা। মূলতঃ চন্দ্রকেতুগড় এবং তার আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত পুবা দ্রব্যেই এই সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হযে উঠেছে। প্রসঙ্গত একথা মনে রাখা দরকার যে, ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে প্রধানত যে পরিমাণ পোড়ামাটির মূর্তি-ফলক ও পুতুল সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়ই উপহার দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। এছাড়া দেশ-বিদেশের সংগ্রহশালায় চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত পুরা-নিদর্শনগুলি প্রদর্শিত হওয়ায়, মানুষের উৎসাহ বাড়ে। তারা প্রত্নভূমি চন্দ্রকেতুগড়ে এসে প্রত্ননিদর্শনগুলি দেখার জন্য আগ্রহী হয়। সাধারণ কৌতূহলী জ্ঞানপিপাসু মানুষের এই দেখার চাহিদা মেটাবাব জন্য একক উদ্যমে যেভাবে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রী মৈতে এই 'চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা' গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন, তা একান্তই অভিনন্দনযোগ্য।

চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার প্রত্ননিদর্শনের সংগ্রহ বিশাল বলা চলে। সে সংগ্রহশালার কক্ষে হাজার হাজার বছর আগের নিদর্শন দেখে দর্শকরা যেমন বিমুগ্ধ হয়, তেমনি বিস্মিত হয় আদিমকালের যক্ষিণী মূর্তির শিল্পশৈলী দেখে। পাশাপাশি পোড়ামাটির ক্ষুদ্রকার মূর্তি সূর্য, অগ্নি, গণেশ, উমা-মহেশ্বর ও কুবের প্রভৃতির মূর্তি দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। আরও কত যে অদ্ভুত মূর্তি উৎকীর্ণ ফলক এখানের সংগ্রহে আছে তা দেখে দর্শকরা বিহ্বল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সংগ্রহশালার সংগ্রহে আছে ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ শীল, নানা চিহ্ন অঙ্কিত মুদ্রা। প্রদর্শিত অধিকাংশ নিদর্শনগুলি মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল-সেন যুগের। মৃৎপাত্র যে কত রকমের ও কত ধরনের পাওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই— যা দেখে দর্শকরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রাচীনকালের দৈনন্দিন জীবনের ধ্যানধারণা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেন। সর্বোপরি এখানে সংগৃহীত

হয়েছে নানান ধরনের মিথুন মূর্তি-ফলক, যা প্রাচীনকালের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা করে। মোট কথা, দিলীপকুমার মৈতে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালার কক্ষে প্রদর্শিত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শনগুলি আজ দর্শনার্থীদের কাছে যেভাবে সমাদৃত হয়ে উঠেছে তা একান্তই আনন্দের ও গৌরবের।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ দর্শনার্থীদের আগ্রহের করা চিন্তা করে শ্রী মৈতে বেড়াচাঁপা-চন্দ্রকেতুগড় তথা দেগঙ্গা এলাকার ঐতিহ্য নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আগ্রহশীলরা এখানকার প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে আলোকচিত্রসমৃদ্ধ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করতে পারেন। ১. গড় চন্দ্রকেতুর কথা, ২. অতীত আলোকে চন্দ্রকেতুগড়, ৩. চন্দ্রকেতুগড়, ৪. ইতিহাসে দেগঙ্গা। ❒

[* অধ্যায়ের শিরনামে মুদ্রিত আলোকচিত্রটি চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি (আঃ গুপ্তযুগ)]



ক. মিউজিয়ামের রূপকল্পনার ইতিহাস ঃ গ্রীস

দৃশ্যমান বিষয়ের মাধ্যমে, জ্ঞানের আদিনিকেতনে পৌঁছে দেবার কাজে আজকের একবিংশ শতাব্দীব মিউজিয়াম গ্রহণ করেছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। দেশ-বিদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান আর কারিগরী শিল্প, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ এবং ভূতত্ত্ব প্রভৃতির নির্দশন নিয়ে আজকের মিউজিয়ামের যাত্রা শুরু হযেছে; উদ্দেশ্য হয়েছে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তোলা আর সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। মিউজিয়ামের এই রূপকল্পনার পিছনে একটি দীর্ঘ কাহিনী আত্মগোপন কবে আছে যা একান্তই তার উৎপত্তির ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস। বলা যেতে পাবে, আজকের এই পবিপূর্ণতার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফেলে আসা ইতিহাস।

'মিউজিয়াম' কথাটি স্বভাবতই বিদেশী শব্দজাত। কথাটিব জন্ম হ'য়েছে, সেই সুদূর গ্রীসে। তাই ইংরেজীতে এই 'মিউজিয়াম' শব্দটিব বুৎপত্তি নিযে আলোচনা করলে যা দাঁড়ায় তা হোল, আদিতে এটি ছিল গ্রীকদেবী 'মিউজ'দের বাসস্থল। সুতরাং এ থেকে উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'মউসিয়িন'— যা ল্যাটিনে ভাষান্তরিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে 'মিউজিয়াম'। কিন্তু যাঁরা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী, তাঁদের কাছে এই 'মউসা' কথাটির শব্দতত্ত্ব একান্তই জটিলতার সৃষ্টি করে। পুরাকালের গ্রীক শব্দ 'মন্ট-ইয়া' কথাটির বুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করলে এই কথাই অনুমান করতে সাহায্য করে যে, ঐ মিউজরা ছিলেন আসলে পাহাড়ী বনদেবী। কিন্তু গ্রীক্‌দের প্রাচীন সব গ্রন্থে এই শব্দের অর্থ সম্পর্কে তেমন কিছুই পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়নি। শুধুমাত্র গ্রীককবি হোমার আর হেসিয়ড-এর কাব্যেই এই মিউজদের কাজকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় বলা হয়েছে আদিতে মিউজদের আবির্ভাব ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্মৃতিশক্তি বর্ধনের দেবী হিসেবে— যাঁদের কাছে প্রাচীনকালের গ্রীক-চারণরা স্মৃতিভ্রষ্টণার হাত থেকে মুক্ত হয়ে তাদের গাথা-কথিকা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানাতো। তাছাড়া এই 'মিউজ' দেবীদের বাদ দিয়ে চারণদের কোন কাজই করার উপায় ছিল না। মিউজদের সঙ্গে বিরুদ্ধতার পরিণাম কি হয়েছিল তা থ্রেস দেশের গীতবাদ্যের শিল্পী থামাইরিসের উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শিল্পী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটি মিউজদের বিরুদ্ধে অহংকার জানিয়ে বলেছিল যে, সে মিউজদের আশীর্বাদ ছাড়াই সুমধুর গীত-বাদ্যের মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব যোগ্যতাকে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে। অপরদিকে মিউজরা তার দর্পচূর্ণ করার জন্যে এবার তাদের শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হোল। প্রথমেই তার চোখদুটো দিল অন্ধ করে। ফলে এই অন্ধতার জন্যে থামাইরিসের হাতের বাদ্যযন্ত্র থেমে গেল চিরতরে, আর সেইসঙ্গে মিউজরা তাদের মহৎ দান 'স্মৃতি' আর 'সঙ্গীত' তার মন থেকে কেড়ে নিল। এরপর থেকেই মিউজদের কাছে চারণরা তাই এত শ্রদ্ধাশীল, এত কৃতজ্ঞ।

হোমারের রচিত গ্রীক মহাকাব্য 'অডিসি'তে মিউজরা চারণদের শিক্ষক এবং সেইসঙ্গে উপকারী বন্ধু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। মিউজরা চারণদের ভালবাসতো বলেই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ চারণদের সুমধুর সঙ্গীত উপহার দিতো। অপরদিকে হেসিয়ডের কাব্যে মিউজদের সম্পর্কে আরও রোমান্টিক ক'রে বলা হয়েছে যে, গ্রীকদেবতা জীউসের রাজ্য অলিম্পাশ থেকে নেমে আসতো মিউজরা কাব্যের উচ্ছ্বাসভূমি এই পৃথিবীর হেলিকন পর্বতের সানুদেশে— যেখানে তাদের নারীসুলভ কমনীয় পদদ্বয় নৃত্যের তালে তালে নুপুরধ্বনি তুলতো আর পবিত্র ঝরণার জলে অবগাহন করে ঐক্যতান সঙ্গীতের লহরী তুলতো। তারপর আবার যখন তারা প্রদোষের অন্ধকারে মিলিয়ে যেত, তখন দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রংশসিত তাদের সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসতো। সংখ্যায় এই মিউজরা ছিলেন বিভিন্ন নামের ন'জন। এরা হলেন, ক্যালিয়োপ, ক্লিও, ইরাটো, ইউটারপি, মেলপোমেন, পলিম্‌নিয়া, টার্পসিকোর, থালিয়া এবং উরানিয়া। মহাকবি সেক্সপীয়র মিউজদের সম্পর্কে বলেছেন, 'a particular power and practice of poetry'। মিউজরা ছিলেন জিউস আর মিনিযোসাই (অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'স্মৃতি')-এর কন্যা।

মিউজদের গুণাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা নিজেরা যেমন ভাগবত সঙ্গীত গাইত, তেমনি চারণদের কাজে সহায়তা করার জন্যেও কম সচেষ্ট ছিল না। কবি হেসিয়ড্-এর মধ্যে দিয়েই মিউজরা প্রকাশ করেছে তাদের সেই সুমধুর সঙ্গীত যাতে বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যত আর অতীতের কাহিনী। অন্যদিকে হোমারের মিউজরা জানিয়েছে তাদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত, আর সেইসঙ্গে জানিয়েছে সত্য জিনিষটা কি বা কেমন ক'রে তাকে বর্ণনা করা যায়। এ ছাড়াও মিউজদের আরও এক অবদান হোল তাদের বাগ্মিতা। দেশের রাজসম্প্রদায়রা ছিলেন প্রতিপালক গ্রীক দেবতা জিউসের স্নেহধন্য; সেইজন্যই জিউসের কন্যা মিউজরা ঐসব রাজসম্প্রদায়ের উপরেও করুণা দেখাতেন তাদের সুমধুর ভাষার ডালি উপহার দিয়ে— যাতে রাজারা ন্যায়বিচার করার পথে এবং দেশে শান্তির আবহাওয়া বজায় রাখার কাজে অগ্রগামী হতে পারে। তাদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া সেই সঙ্গীত সুধা দিয়ে পৃথিবীর দুঃখকে ভোলাবার চেষ্টা করতো। দেখা যাচ্ছে হেসিয়ডের সময়ে এই মিউজদের সঙ্গে 'মিনিযোসাই'-এর সম্পর্কের জন্যে মিউজরা যে সব গুণের অধিকারিণী হয়েছেন তা হোল, স্মৃতি, শিল্পানুরাগ এবং কাব্যের অনুপ্রেরণা। এরও পরবর্তী সময়ে এগুলির চেয়ে আরও যে ভিন্ন ধরনের মহৎ গুণের অধিকারিণী হয়েছেন মিউজরা— তা হোল অর্থসম্পদ। উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রীক নরপতি সোলন যখন তার বিখ্যাত কাব্য-সঙ্গীত রচনা করেন, তখন তিনি চিরাচরিত প্রথামত মিনিযোসাই ও জিউসকন্যা মিউজদেরও আবাহন করেন; কিন্তু সেই আবাহনের মধ্যে মিউজদের কাছে কাব্যসঙ্গীতের উপহার পাবার প্রার্থনা ছিল না— ছিল পার্থিব সম্পদ অর্জনের এবং মানুষের মধ্যে সুনাম অক্ষুণ্নের প্রার্থনা। সুতরাং এই প্রথম দেখা গেল, মিউজদের কাছে প্রার্থনার ধরণ বদলে যাবার কাহিনী।

প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, কবিদের অনুপ্রেরণা যোগাবার জন্যেই সাহিত্যের

সঙ্গে মিউজদের সম্পর্ক ছিল খুব বেশী। ফলে দেবী হিসেবে যখন মিউজদের সমাদর তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই পূজার্চনা পাবার অধিকারিণী হয়ে উঠেছিল বলেই গ্রীসের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দির দেখতে পাওয়া গেছে। গ্রীসের হেলিকন পর্বতমালার যে মন্দিরটিতে মিউজদের সবচেয়ে বেশী আধিপত্য ছিল, তা নিয়ে প্রাচীন গ্রীসের থেসপিয়া রাজ্যের জনৈক এমফিয়ন কমপক্ষে দুটি পুস্তক রচনা করেন। সে সময়ের এথেনবাসীদের মতে তাঁর ঐ রচনার নাম ছিল, ''হেলিকনের মউসিয়ন সম্পর্কে।'' এ ছাড়াও খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর স্পার্টান জেনারেল পউসানিয়াস মিউজদের উপাসনা স্থান সম্পর্কে এক বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। অপরদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের দরুণও এই সম্পর্কে কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল, পাথরের একটা লম্বা পাদপীঠ যেখানে একদা থেসপিয়ান দেশবাসী ন'জন মিউজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রত্যেক মিউজের প্রতিমূর্তির নীচে স্ব স্ব নাম খোদাই করা তো ছিলই, উপরন্তু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছোট্ট দু'লাইনের কবিতাও তার সঙ্গে খোদিত ছিল। এই কবিতার রচয়িতা ছিলেন হোনেস্টাস্— যাকে অগস্টান কালের লোক বলে ধরা হয়। কথিত পউসানিয়াসের বিবরণ মতে মিউজদের এই প্রতিমূর্তিগুলির রূপদান করেছেন সিকিসোডোটাস। পউসানিয়াস আরও উল্লেখ করেছেন, মিউজদের প্রতিমূর্তির এই সারিতে আরও যাদের মূর্তি দেখা যেত তাদের মধ্যে ছিল ডাইয়োনিসাসের মূর্তি, যা ছিল মিউজদের দলের মধ্যে দৃশ্যমান এ্যাপোলো ও হারসেমের বীণাযন্ত্র লিরার জন্যে যুধ্যমান অবস্থার মূর্তি, থামাইরিস একটি ভগ্ন লিরা হস্তধৃত অবস্থার খোদিত মূর্তি, মকরবাহী এরিয়ন এবং হেসিয়ড— হাঁটুর উপর রাখা একটি হার্প বাদ্যযন্ত্র ধরে থাকা অবস্থার মূর্তি। এছাড়া ছিল সঙ্গীত সুধা পানে বিভোর বন্যজন্তু পরিবৃত পাথর এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত অরফিউসের মূর্তি। আজকের চিন্তাধারণায় আমরা যে মিউজিয়ামের রূপকল্পনা করি, তা সেকালের গ্রীক দেবী মিউজদের আস্তানা এই 'মউসিয়ন'কে দেখে মনে হয় এটি যেন মিউজদের মিউজিয়াম। 'মউসিয়ন' তাই পরে হ'য়ে পড়েছে মিউজিয়াম।

এবারে গ্রীসের সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্। সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সে সময় গ্রীসে কাব্য পাঠকে বিধিবৎ শিক্ষার (formal education) একটা অঙ্গ বলে মনে করা হোত। তাছাড়া গ্রীসের যুব সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল কাব্যচর্চা। এই প্রসঙ্গে 'নাইসিরেটাস'-এর কথা স্মরণ করা যাক। নাইসিরেটাসের পিতার আকাঙ্ক্ষা পুত্র যেন উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে; তাই তিনি পুত্রকে হোমারের কাব্য মন প্রাণ দিয়ে পড়ার জন্যে বাধ্য করেছিলেন। সক্রেটিসের ছাত্র এবং এথেন্সের বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক এক্সিনোফোন আহুত এক সম্মেলনে এই নাইসিরেটাস যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের দিনে হোমারের ইলিয়ড্ ও অডিসি মহাকাব্যের সবটাই মুখস্থ বলার মত ক্ষমতা নাইসিরেটাসের ছিল। এর জন্যে তার কৃতিত্বের গর্ব ছিল খুব। কিন্তু হায় হতভাগ্য নাইসিরেটাস্! সক্রেটিস নাইসিরেটাসের এই উদ্যম ভঙ্গ করে দিয়ে উক্তি করেছিলেন যে, আবৃত্তিকারকরা মহাকাব্য মুখস্থ বলতে পারে বটে, তবে তারা হোল এই পৃথিবীর এক মহামূর্খ লোক। কবিতা মুখস্থই তারা করেছে

কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়নি। এইভাবেই সক্রেটিস ভর্ৎসনা করে নাইসিরেটাসকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নাইসিরেটাসের উদাহরণ থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় সেকালে গ্রীসে না বুঝে কবিতা মুখস্থ করা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

পুস্তক পাঠ ও কবিতা আবৃত্তিব দিকে সে সময় মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্য ছিল একান্তই নীতিমূলক বিষয়। এর মধ্যে ছাত্রদের অতীতের জাতীয় বীরপুরুষদের এবং সেই বীরপুরুষদের চরিত্রের গুণাবলীকে নকল করার চেষ্টা থাকতো। কবিতা মুখস্থ করা তখন এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল, যেকোন সময়ে যেকোন জায়গা থেকে তারা আবৃত্তি করতে সক্ষম হোতো। প্রায়ই একঘেয়ে পরিশ্রমে কবিতা মুখস্থ করা সে সময়ে স্মৃতিশক্তি বিকাশে একান্তই সহায়ক হবে বলে ধারণা প্রচলিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে দার্শনিক প্লেটোর 'ল' পুস্তকে এই কবিতা মুখস্থ করার মূল্য সম্পর্কে কঠিন সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

তাহলে মোটামুটিভাবে গ্রীসের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে গ্রীসে কাব্য পাঠ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া গেল। মিউজদের দেশে কবিতা আলোচনা করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটি বিশেষ শিক্ষায়তনকে চিহ্নিত করার জন্যই 'মিউজিয়াম' কথাটির প্রচলন। দেখা যাচ্ছে, গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখার মধ্যেই প্রথম পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে উপরিউক্ত অর্থে মিউজিয়াম কথাটির ব্যবহার হয়েছে বটে, কিন্তু এর আগে আমরা এই অর্থের ক্রমোন্নতির বিবরণ এরিস্টফোন এবং ইউরিপিডিসের লেখার মধ্যেও দেখতে পাই। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত এসচিনেস্-এর লেখা থেকেও জানতে পারি যে বিদ্যালয় উৎসবগুলি 'মিউসিয়া' হিসাবে খ্যাত হোত। এ বিষয়ে আরও নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, ড্রাকো ও সোলনের আইনবিধি রচনার সময় এস্‌চিনেস্ প্রসঙ্গত এই প্রথার উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও মাইলটাস শহরে ইউডিমাস সাধারণের শিক্ষার জন্যে অর্থদানের যে বিষয়টি একটি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন তা থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় কেমন করে খ্রীঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিউজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনসাধারণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত একটি কমিটির প্রস্তাবমত ঐ তহবিলের আয় চারজন খেলাধূলার শিক্ষক এবং আরও চারজন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হোত। প্রতি বৎসর আগ্রহী প্রার্থীরা তাদের প্রতিযোগিতার জন্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নাম দিতেন এবং সেইমত একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রার্থীরা গ্রীসের জনপ্রিয় সভার (Popular Assembly) সঙ্গে অপেক্ষমান হারমেস এনাগোনিয়াস দেবতার পুরোহিত এবং মিউজ দেবীদের পুরোহিতদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন। এবারে উৎসব পরিচালনার মূল প্রতিনিধি সমবেত জনতাকে একটি প্রার্থনা সভায় শপথ নেবার জন্যে সমবেত করতো। উপস্থিত জনতাকে শপথ নিতে হোতো এই বলে যে, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এবং অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়ে কেউ যদি কোন অযোগ্য প্রার্থীকে প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে মনোনীত করে থাকেন তাহলে সে এই অসততার জন্যে পাপের ফল ভোগ করবে। এরপর শুরু হোত প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। একে একে উঠে এসে প্রার্থীরা এই বলে শপথ নিতেন

যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা কোন নাগরিককে তাদের প্রতিযোগী পদের জন্য নির্বাচন করার পক্ষে পীড়াপীড়ি করেননি। হারমেস দেবতার পুরোহিতদের পরিচালনায় খেলাধূলার শিক্ষকরা হারমেস দেবতার নামে শপথ বাক্য উচ্চারণ করতেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকরা মিউজ দেবীর পুরোহিতদের ব্যবস্থাপনায় অ্যাপোলো এবং মিউজদের নামে শপথ নিতেন। যা জরিমানা আদায় হোত তা হারমেস ও মিউজের মন্দির-কোষাগারে জমা দেওয়া হোত।

মিউজদের পবিত্র স্থান এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার যে একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এই মিউজিয়াম, এই ধারণা সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে উপবন প্রধান প্লেটোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিতে। সেখানে মিউজ দেবীদের সামনে একটি যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে উৎসর্গ এবং উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হোত। প্লেটো প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মিউজদের সেবায় উৎসর্গিত 'থিয়াসস্' অর্থাৎ 'পবিত্র দল' হিসাবে সংগঠিত করা হ'য়েছিল। এই দলের নিজস্ব নিয়মকানুনও যেমন ছিল তেমনি ছিলো একজন নিজস্ব নেতা, যেখানে বুদ্ধিজীবী তৎপরতাকে কেন্দ্র করেই দলগোষ্ঠির সভ্যরা তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। অনুধ্যান ও গবেষণা, বিশেষ করে গণিত সংক্রান্ত বিষয়ক— এইসব ছিল অ্যাকাডেমির প্রধান কার্যাবলী। এ থেকে বলা যেতে পারে যে, উচ্চশিক্ষার জন্যে সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের বীজ এখান থেকেই প্রথম পরিপক্ক হয়েছিল।

কিংবদন্তী যে, এরিস্টটল্ যখন এথেন্সে এসেছিলেন তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত সাজসরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এরিস্টটল্ যখন লাইসিয়মে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তখন তিনি প্লেটোর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করেন তার নানাবিধ নতুন কান্ডের মধ্যে। এরিস্টটল্ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনলেন মানব সমাজের একান্ত আগ্রহপূর্ণ শিল্পসুষমা বিষয়ক প্রত্যেকটি বিষয়। তাই বোধ হয় ম্যাসিডোনের রাজা ফিলিপ কর্তৃক এই দার্শনিক আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক হবার জন্যে। সুতরাং ভবিষ্যতে আলেকজান্ডারের সম্পদ এরিস্টটলকে সুযোগ করে দিল বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার, যা প্লেটোর শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে একান্তই অজানিত ছিল। এরিস্টটলের লাইসিয়মের প্রতিষ্ঠানে পদার্থ বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র প্লেটোর 'অ্যাকাডেমি' অপেক্ষা অনেক বিস্তারিত ছিল। সুতরাং নীতিগতভাবে গোটা লাইসিয়মই একটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছিল এবং এরিস্টটল ও তাঁর ছাত্ররা এই মিউজদের সেবায় উৎসর্গিত 'থিয়াসস' নামে একটি পবিত্র দল গঠন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই মিউজিয়াম ছিল একটি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র এবং এ থেকেই আমরা ভালভাবে বুঝতে পারি আলেকজান্দ্রিয়াতে সেই বিখ্যাত মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পথ পরবর্তীকালে কিভাবে সুগম হয়ে পড়ে।

যখন ম্যাসিডোনের রাজা ফিলিপ দার্শনিক এরিস্টটলকে তাঁর দেশে ছেলের গৃহশিক্ষকের জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আকর্ষণীয় এবং উপযুক্ত মাহিনা দেবার বদলে মিইজাতে মিউজদের একটা পূজাস্থল নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রেরা শান্ত সমাহিতভাবে পড়াশুনা করতে পারে। গ্রীক জীবনীকার ও দার্শনিক প্লুটার্ক

এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, এরিস্টটল আলেকজান্ডারকে শুধু নীতিশাস্ত্রের এবং রাজনীতি ক্ষেত্রের ব্যবহারিক শিক্ষাই দেন নি, তিনি গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের শিক্ষাও তাকে দিয়েছিলেন। আলেকজান্ডারও তার স্বাভাবিক চরিত্রগতভাবে ছিলেন শিক্ষায় যথেষ্ট আগ্রহী এবং পঠন-পাঠনে মহা উৎসাহী। তার উৎসাহের জন্যেই এরিস্টটল হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যের এক নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, যেটিকে আলেকজান্ডার মনে করতেন সৈনিকদের রণকৌশল সংক্রান্ত একটি বুনিয়াদী সারগ্রন্থ। সেই কারণে প্রাচীন ট্রয় নগরী পরিভ্রমণের সময় তিনি অ্যাচিলিসের সমাধিভূমিতে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী একটি আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ করেন।

যেহেতু এরিস্টটলের সাহিত্য শিক্ষার মধ্যে হোমারের কাব্যই ছিল প্রধান, তাই আলেকজান্ডার সাহিত্য সম্পর্কে খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও ম্যাসিডনবাসীরা ছিলেন গ্রীক এবং তার বিপরীতদিকে তাদের চরিত্রও ছিল বর্বর সংস্কৃতিবিহীন। গ্রীক সাম্রাজ্যের শেষ সীমায় তাদের অবস্থান এত দূরত্বে ছিল যে, খ্রীঃপূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতকেও এথেন্সের বুকে প্রবাহিত গ্রীক সংস্কৃতির সৃজনশীলস্রোত তাদের স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে কেউ কোন ভবিষ্যতবাণী করতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আলেকজান্ডারের প্রাচ্য বিজয় অভিযানের পর বিজিত দেশগুলিতে যে হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার হোল— তা শুধু সম্ভব হয়েছিল বিজয়ী বীরের চরিত্রের উপর এরিস্টটলের শিক্ষার প্রভাবের জন্যই।

শুধু তাই নয়, এরিস্টটল আলেকজান্ডারকে বিজ্ঞান চেতনা বিষয়ক জ্ঞানদানেও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যাঁরা এ্যালান মুরহেডের লেখা নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সেই সুন্দর বিবরণ পড়েছেন সকলেই তার মধ্যে লক্ষ্য করবেন যে, নেপোলিয়নের এই অভিযান শুধুমাত্র একটি সামরিক সাহসিক কার্যই ছিল না— এই সুপরিকল্পিত অভিযানটির উদ্দেশ্য ছিল একান্তই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা কোন ক্রমেই অতিশয়োক্তি হবে না যে, মিশরের ঐ প্রত্নবস্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সর্বপ্রথম গবেষণাযোগ্য হওয়ার সুযোগ যেমন লাভ করেছিল, তেমনি বলা যেতে পারে আলেকজান্ডারের প্রাচ্য অভিযানের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে এবং প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলই ছিল এর মূলে। তিনি তার অভিযানের সময় গ্রীক দেশের যা অজ্ঞাত সেই প্রাচ্যের প্রাকৃতিক জগতের বহু অস্বাভাবিক বস্তু সম্পর্কে তদন্ত ও তথ্য নথিবদ্ধ করার জন্যে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন। মধ্য এশিয়ার অক্সাস এবং হিন্দুকুশ পর্যন্ত তার দীর্ঘ পদক্ষেপ, কাশ্মীর ও সিন্ধুর শাখা-প্রশাখার ধার ধরে দীর্ঘ অভিযান, সিন্ধুনদের সম্মুখভাগ থেকে পারস্য উপসাগরের উপর পর্যন্ত তার বাহিনীর প্রত্যাবর্তন এবং সবশেষে বেলুচিস্তানের মরুভূমি দিয়ে পারস্যে তাঁর আগমন— এগুলি শুধুমাত্র তার সামরিক শক্তি ও কৌশলেরই পরিচয় দেয়নি, পৃথিবীর মানচিত্রে এই অভিযানকে একটা বিপ্লবাত্মক কাজ হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে।

আলেকজান্ডার যা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং যদি না তেত্রিশ বছর বয়সে মারা যেতেন, তাহলে তিনি আজকের কল্পনাকেই পাল্টে দিয়ে সবটুকু বাস্তব করে তুলতেন।

তিনি ভূমধ্যসাগর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডকে এক সাম্রাজ্যের নিগড়ে বেঁধে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তাহলেও তাঁর তের বছরের রাজত্বের জীবনে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের চেহারাটাকেই যেভাবে পাল্টে দিয়েছিলেন— তা শতাব্দী ধরেও কারো পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তাঁর অস্ত্রশক্তির জোরে সৃষ্ট এই বিশাল সাম্রাজ্যের মাটিতে গ্রীক সভ্যতার বীজ বোপন করার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল অবস্থাব সৃষ্টি হয়েছিল— যার ভবিষ্যত একটি পরিণত ও অভূতপূর্ব সার্বজনীন চরিত্রগঠনে যথেষ্ট সহায়ক হোতো।

এহেন আলেকজান্ডার তার এই মানস কল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত হোল, হোমারের স্বপ্নাদিষ্ট মিশরের নীলনদের পশ্চিম তীরের সেই ভূমিতে খ্রীঃ পূঃ ৩৩২ অব্দে আলেকজান্ডার কর্তৃক একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা। তাই আলেকজান্দ্রিয়া মূলতঃ গ্রীকদের দ্বারা নির্মিত হওয়ায় তা গ্রীক নগরী হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং গ্রীসের নগর পরিকল্পনার ধাঁচে এখানেও সেইভাবে নগর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হ'য়েছিল।

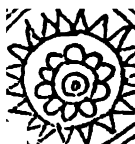
কিন্তু যদি আলেকজান্দ্রিয়াকে বস্তুত একটি গ্রীক নগরী বলে ধরা হয়, তাহলে এর বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রাধান্য ছিল গ্রীক সংস্কৃতির। আর এই গ্রীক সংস্কৃতির প্রাধান্যের কারণই হোল প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটলের শিক্ষার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত আলেকজান্দ্রিয়ায় পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সেই বিখ্যাত মিউজিয়াম, যার কর্তৃত্বে এই নগরী শাসিত হোতো।

আলেকজান্দ্রিয়ার এই মিউজিয়ম পরিপূর্ণভাবে রূপগ্রহণ করেছিল ১ম টলেমীর দ্বারা, যিনি ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের মধ্যে একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী। এছাড়াও তিনি ছিলেন একাধারে একজন ঐতিহাসিক এবং অন্যদিকে বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী। টলেমী আলেকজান্ডারের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এর ফলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আলেকজান্ডারের গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে উৎসাহ, তাঁর বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ এবং মানব সমাজের প্রতি উদার মনোভাব— টলেমীকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ ছাড়া সমগ্র মিশরের ধন দৌলত তার কাছে থাকায় রাজকীয় আড়ম্বরপূর্ণভাবে তা ব্যয় করার অধিকারও সে অর্জন করেছিল।

এই জন্যেই আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তীকালে একটি বিরাট গবেষণা কেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছিলো। বলা যেতে পারে, এটি হোল এই ধরনের সেই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— যা সরকারী আনুকূল্য লাভে একান্তই সক্ষম হয়েছিলো। হেলেনীয় সাম্রাজ্যের সব জায়গা থেকেই পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হোতো তার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হবার জন্যে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আনন্দের সঙ্গেই এই আমন্ত্রণ গৃহীত হোত। রাজকোষ থেকে সভ্যদের যথোপযুক্ত বৃত্তি দেওয়া হোত এবং আহারাদির জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি সাধারণের রন্ধনশালা একত্র আহারের। এইসব গুণীজনেরা কোন ক্রমেই কিন্তু মনে করতেন না যে, তারা তাদের বক্তৃতা মারফৎ অপরকে বাধিত করছেন। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, ছাত্রেরা সাধারণভাবে ঐসব পণ্ডিতদের কাছে দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছ থেকে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানলাভ করতো। একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ— যা পরবর্তীকালে ক্রমশ পুস্তক বৃদ্ধির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। মিউজিয়ামের এই শিক্ষায়তনে একদিকে যেমন সমালোচনামূলক

সাহিত্য, লিপিতত্ত্ব এবং দর্শন সংক্রান্ত বিষয়ক গবেষণার কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, অপরদিকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ঔষধ প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও। এই মিউজিয়ামে মিউজদের মূর্তি ও সেই সঙ্গে যজ্ঞবেদীসহ একটি উপসনাস্থলও ছিল। সুতরাং নীতিগতভাবে এই গবেষণা কেন্দ্রটি ছিল এরিস্টটলের একটি 'থিয়োসিস'— অথবা বলা যেতে পারে 'পবিত্র দল', যার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত এক পুরোহিত। আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়াম আজকের মিউজিয়ামের পরিপূর্ণ রূপদানের যাত্রাপথে ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

সংক্ষেপে এই হোল, গ্রীসের পটভূমিকায় মিউজিয়ামের রূপকল্পনার সেই ফেলে আসা ইতিহাস— যা একান্তই অজ্ঞাত তথ্যের সংমিশ্রণে চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। ❐



খ. প্রাচীন রোম ও মিউজিয়ামের রূপকল্পনা

আজকের দিনে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যদি কোন প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু পাওয়া যায় তা সে পাথরের মূর্তিই হোক বা মুদ্রাই হোক, — তবে তা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এছাড়া ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সংগৃহীত চিত্রকলা বিষয়ক বহু মূল্যবান বস্তুও মিউজিয়ামকে সংরক্ষণের জন্য দান করা হয়। এইভাবেই মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয় বহু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। রোমের ইতিহাসেও একদিন তাই ঘটেছিল। সেখানে প্রাচীনকালে এইসব মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ সংগৃহীত হতো কোন মন্দির বা দেবায়তনে অথবা অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন অট্টালিকায়। সাধারণতঃ এইসব মন্দির-দেবায়তনে থাকতো ধর্মীয় মূর্তি, অঙ্কিত চিত্র, এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রদত্ত শিল্পমূল্য সমন্বিত বস্তুসমূহ।

উদাহরণস্বরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, অলিম্পিয়ার জিউসের মন্দিরে জিউসের মূর্তি এবং এথেন্সের পার্থেনিয়নে বিখ্যাত শিল্পী ফিডিয়াস কর্তৃক নির্মিত এথেনা পার্থিনোর মূর্তির কথা। দেওয়াল চিত্র সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় থেসিয়াসের মন্দির দেওয়ালের গায়ে 'পলিগনোটাস' ও 'মাইকন'-এর আঁকা সেই যুদ্ধ চিত্রটির কথা, যার বিষয়বস্তু হোল এথেনিয়দের সঙ্গে আমাজোনবাসীদের যুদ্ধ সংঘর্ষ। এছাড়াও ডাইয়োনাইসাস ইলেনদিরিয়াস-এর এলাকার মধ্যে অবস্থিত দুটো মন্দিরের মধ্যে একটির গর্ভগৃহে আলকমিনেসের সৃষ্ট একটি দেবমূর্তি এবং সেইসঙ্গে একটি দেওয়ালচিত্রও ছিল। ঐ দেওয়াল চিত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ডাইয়োনাইসাস নিমজ্জিত হিফায়েসটাসকে তুলে এনে অলিম্পাসকে প্রত্যর্পণ করছে, পেনথিয়াসের শাস্তির চিত্র এবং থেসিয়াস কর্তৃক এরিয়াডনিকে নক্সোস দ্বীপে পরিত্যাগ ও তারপরে গ্রীক দেবতা ডাইয়োনাইসাস কর্তৃক উদ্ধার কার্য।

আজকের জগতে মিউজিয়ামে প্রদর্শিত অপরূপ ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে যেমন আগ্রহশীল দর্শকরা ভীড় জমান, তেমনি সে সময়েও ভ্রমণকারীরা থেসপিয়া যেত। বিশেষ করে শিল্পী প্রক্সিটিলেস-এর সৃষ্ট ভাস্কর্য 'ইরসে'র প্রতিমূর্তি দর্শনলাভের জন্যে স্নিডাসেও যেত দর্শকরা, শুধু ঐ একই শিল্পীর কৃত এ্যাপরোডিটের মূর্তি দেখার জন্যে— যা ভেনাসের মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

সেকালে অপরূপ মূর্তি-ভাস্কর্য দেখার স্পৃহা সম্পর্কে প্রাচীন রোমান সাহিত্যে কিছু কিছু বিবরণ আছে। এর মধ্যে হিরোডোটাস-এর লেখা একটি প্রহসনের চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, কোস দ্বীপে অবস্থিত আস্কলিপিয়স মন্দির দর্শনে আগত দুইজন মহিলার কথা। ঐ দুইজন মহিলার মধ্যে যার নাম কোক্কেলি— তিনি এসেছিলেন দেবতার কাছে তার এক অসুস্থ আত্মীয়ের মানত পূরণের জন্যে। নিজের অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি সঙ্গী এনেছিলেন তার বান্ধবী ক্যাল্লো কে। এখানে মানত পূরণের রীতি ছিল নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখা একটি ফলক দেবতার কাছে নিবেদন করা। এ ক্ষেত্রে শরীর ও স্বাস্থ্যের দেব-দেবীদের কাছে

কোক্কেলি তাব প্রার্থনা শেষে, বান্ধবীর পরামর্শমত তার নিবেদিত ফলকটি 'হাইজিয়া' দেবীর মূর্তিব ডানদিকে রেখে দিল। এই বাখাব সময় কোক্কেলি দেখতে পেল অপূর্ব সুষমা সমন্বিত আবও অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে সুন্দর এক শিশুর প্রতিমূর্তি— যে একটি আপেলের দিকে চেয়ে আছে; সে মূর্তিব ভাবব্যঞ্জনা এমনই যে, মনে হবে ঐ আপেলটি না পেলে সে বুঝি মারা পড়বে। একটি বৃদ্ধ ও শিশু একটি বাজহংসেব গলা ধবে আছে; দেখে মনে হবে পাথরের মূর্তি বলে না জানলে আশা কবা যেত যে নিশ্চযই এরা কথা বলবে। 'ম্যাটলেস'-এব কন্যা 'ব্যাটালী'-র প্রতিমূর্তি দেখে মনে হবে— ঠিক যেন আসলেব মতই অবিকল। এছাড়া আরও একটি নগ্ন শিশুর সুষমা সমন্বিত প্রতিমূর্তি সেখানে রয়েছে; দেখে মনে হবে চিমটি কাটলে বোধহয তাব গায়ে কালো ও নীল দাগ পড়বে। একজন মানুষেব অঙ্কিত চিত্রও এখানে ছিল। ছবিতে সে একটি বৃষ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সে ছবিতে বৃষটিকে এমনভাবে অঙ্কিত কবা হযেছে যে, মনে হবে যে কোন সময় সে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর ধবে যে রুচিবোধ গড়ে উঠেছিল— তাব খুব বেশী পরিবর্তন ঘটেনি।

পববর্তীকালে রোমের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, মন্দির-দেবায়তনেব ধর্মীয় আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে হেলেনীয় নৃপতিদের রাজপ্রাসাদে। সমাজের যারা ছিলেন পরাক্রমশালী বা ধনশালী— তারা এই সব শিল্পবস্তু সংগ্রহেব দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সংগ্রহ করার মূলে যে কারণ ছিল তা হোল, তাদেব নিজস্ব সভ্যতার একজন দাবীদার বলে যাতে নিজেদের প্রতিপন্ন করা যায়, অথবা তাবা যা সংগ্রহ করেছেন তা কোন দ্ররিদ্রলোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়— এই ভাব দেখানো। অন্যদিকে বর্বর বা আধা-বর্বর রাজপুত্রেরা এই সব হেলেনীয় শিল্পকলা সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের বর্বরোচিত চরিত্রটিকে হেলেনীয় রঙের আবরণে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতো। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, সে সময়ে হেলেনীর সভ্যতার মুখোস ধারণ পরবর্তীকালে প্রকৃত হেলেনীয় সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হতে সাহায্য করেছে।

রোমান সাহিত্যে প্রথম আমরা দেখতে পাই অলিম্পিক মিউজদের স্তুতি জানানো হয়েছে কবি এন্নিয়াস রচিত ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'এপ্পালস্'-এ। প্রাচীন কবিরা তাদের কাব্যে অনুপ্রেরণার দেবী হিসেবে ইটালীয় দেবী কামিনিয়াকে স্তুতি জানাতো। পরবর্তীকালে আবার কামিনিয়ার বদলে অলিম্পিক মিউজদের স্তুতি করা হয়েছে। কিন্তু মিউজদের প্রতি এই স্তুতিবাদ কিভাবে রোমে এল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা যেতে পারে। রোম নগরীতে মিউজদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি এনেছিলেন রোমান জেনারেল মার্কাস ফুলভিয়াস নোবেলিয়র— সেই এ্যামব্রাসিরা নগরী থেকে; পরবর্তীকালে এটোলিয়নদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে যে নগরী তিনি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই এ্যামব্রাসিয়া নগরী সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এ্যামব্রাসিয়া একদা ছিল রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ রাজা পাইরাসের রাজধানী। এখান থেকেই ফুলভিয়াস ৭৮৫ টি ব্রোঞ্জ ও ২৩০ টি মার্বেল প্রতিমূর্তি এবং সেইসঙ্গে প্রভূত পরিমাণ সোনা ও রূপো

রোমে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফুলভিয়াস এই সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে রোমের সার্কাস ফ্লামিনয়াস-এর কাছে একটি মন্দির নির্মাণ করে তা উৎসর্গ করেন মিউজদেব অন্যতম হারকিউলেসকে। মিউজদের প্রধান এই 'হারকিউলেস'-এর মূর্তি বোধ হয় তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এই এ্যামব্রাসিয়াতে এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় লিরা বাদনরত হারকিউলেস-এর মূর্তিও তিনি এ্যামব্রাসিয়া থেকে নিয়ে আসেন। উদ্যোগী ফুলভিয়াস আরও যা এনেছিলেন তা হোল শিল্পী জিউক্সিস কর্তৃক নির্মিত পোড়ামাটির মিউজদের মূর্তি এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, মিউজদের ঐ মূর্তিগুলিও তাঁর নির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং তাঁর এই মন্দিরটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর আনীত শত শত ব্রোঞ্জ ও মার্বেলের মূর্তিতে এবং সেই সঙ্গে মিউজদের মূর্তিতে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে এইটিই প্রথম মন্দির; অতএব প্রার্থনা উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছাড়াও যাকে বলা যেতে পারে বর্তমান কালের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রীক শিল্পের এক মিউজিয়াম। অন্যদিকে আমরা দেখি রোমান কবি ইন্নিয়াস রোমীয় সাহিত্যে প্রথম মিউজদের কথা প্রবর্তন করেন এবং এই কবিও একদা ফুলভিয়াসের এই অভিযানের অন্যতম সঙ্গীও ছিলেন। ইন্নিয়াসের পরামর্শ মতই ফুলভিয়াস রোমে মিউজদের এই মন্দিরটি নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

যাই হোক, আলোচনার ক্ষেত্রে এই আমরা প্রথম দেখলাম যে, একজন রোমান ভিক্টর গ্রীসের শিল্পসম্পদ লুণ্ঠনের জন্যে হাত বাড়িয়েছেন। ফলে মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহের বাতিক গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চারিত্রিক ব্যবহারও হয়ে পড়েছে বর্বরোচিত। তবে এর অপর একটি দিকও যে আছে, তা পরবর্তী আলোচনায় এলে বোঝা যাবে।

রোমানরা যখন গ্রীক নগরী সিরাকিউজ অধিকার করে তখন বিজয় উৎসব করার জন্যে প্রথম এগিয়ে আসেন জনৈক রোমান, নাম মারসেলাস। তিনি গ্রীক নগরী লুণ্ঠনের সময় যে সব দ্রব্য পেয়েছিলেন তার মধ্যে নিজের জন্যে শুধুমাত্র রেখে দেন একটি 'এ্যাসট্রোলেব'— যা জ্যোর্তিবিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করা হোত এবং বাদ বাকী লুণ্ঠিত দ্রব্য 'অনার' এবং 'ভার্চু' দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং পোর্টো কাপিনার কাছে একটি মন্দিরও নির্মাণ করে দেন। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, সিসিরোর মত রোমান অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই তাদের গৃহসজ্জার জন্যে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু আজকের মিউজিয়াম জগতের কর্মকর্তাদের মতো সংগৃহীত বস্তুর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে তারা কোন কিছু লিখে রাখার আগ্রহ দেখাতেন না। আর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা যে কি সে চিন্তাভাবনার কথা ঠিক আজকের জগতের চাহিদা মত পরিপূর্ণতা লাভ করেনি।

রোমের জীবনযাত্রার অন্যান্য সব তথ্য সংগ্রহ করলে দেখা যায় যে, রোমের যে সব স্মৃতিস্তম্ভগুলি গড়ে উঠেছিল, তাতে অসংখ্য ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত থাকতো। স্মৃতিস্তম্ভের এইসব চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকেরা তাদের বংশধরদের কাছে তুলে ধরতো, কীভাবে তারা রোমে সম্পদ আহরণ করেছেন এবং রোমের ইতিহাসের এই নব উপকরণ সংরক্ষণের জন্যে কীভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রোম সাম্রাজ্যের সুরুতে ঠিক এই ধরণের এক

বিরাট কীর্তিস্তম্ভ গড়ে উঠেছিল, যা অগস্টাসের ফোরাম নামে কথিত। এই অগস্টাসের ফোরামকে সে সময়ে বিচারের ও অন্যান্য সমাবেশের স্থান হিসেবে গণ্য করা হত। এই ফোরামকে একটি ঐতিহাসিক মিউজিয়াম হিসেবে আখ্যা দিতে পারা যায় এই জন্যেই যে, সেখানে দৃষ্টান্ত দিয়ে রোমের ইতিহাসকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে যে সব বীর পুরুষদের অবদান রয়েছে সেই এইনিয়স থেকে অগস্টাস পর্যন্ত রোমান বীরদের প্রতিমূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ট্রোজানের স্তম্ভও ছিল সত্যিকারের এক চিত্র প্রদর্শনী — যেখানে যে কোন দর্শকই দেখতে পেতো কেমন করে একজন সম্রাট এবার তার সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের সীমা বর্ধিত করার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করে চলেছে।

এবার রোমের দেবালয়গুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। একজন শিল্পরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই যদি কনকর্ড-এর মন্দিরে যেত, তাহলে সে দেখতে পেতো, জিউক্সিসের আঁকা মার্সিয়াসের চিত্র, নিসিয়াসের অঙ্কিত 'লাইবার' চিত্র এবং থিয়োডোরাসের আঁকা ক্যাসেন্ডার চিত্র ও সর্বোপরি ইউপরানের সৃষ্ট শিশু এ্যাপোলো ও ডায়না সহ লাটোনার প্রতিমূর্তি, পিস্টন সৃষ্ট মার্স ও 'মার্কুরি'-এর প্রতিমূর্তি এবং স্থেনিস কর্তৃক সিরেস, জুপিটার এবং মিনার্ভার প্রতিমূর্তি। এ ছাড়াও মনিমুক্তোর উপর খোদাই করা কাজের নিদর্শন দেখতে আগ্রহী হলে তাকে জুলিয়াস সিজারের ফোরামের মধ্যে অবস্থিত ভেনাস জেনিট্রিক্সের মন্দিরে যেতে হবে যেখানে ছটি সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়েছে। এই সঙ্গেই দর্শকের সুযোগ ঘটবে 'আর সেসিলাম'-এর কৃত ভেনাস জেনিট্রিক্সের প্রতিমূর্তি এবং টিমোমাকাসের অঙ্কিত চিত্র। ঠিক এরই পাশে যে স্বর্ণনির্মিত ক্লিওপেট্রার মূর্তি— যা সিজার এনে রেখেছিল তাও এইসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষিত হোত। সিজারের রাজপ্রাসাদ 'পলেটিন'-এ অবস্থিত এ্যাপোলোর মন্দিরে প্রবেশ করলে স্কোপাশ কৃত এ্যাপোলোর প্রতিমূর্তি, টিমোথিউস কৃত ল্যাটোনার প্রতিমূর্তি এবং এইসঙ্গে মাইরনের সৃষ্ট চারটি ব্রোঞ্জনির্মিত বৃষমূর্তি দর্শকদের নজরে পড়তো।

সুতরাং এই ধরনের অনেক বস্তুর তালিকা দিয়ে বলা যেতে পারে, কীভাবে রোমের রাজপ্রাসাদে ও দেবায়তনগুলিতে সংগৃহীত হয়েছে বিখ্যাত সব শিল্পবস্তুর নিদর্শন। কিন্তু এছাড়াও রোমের সেই বিখ্যাত স্নানাগারটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই স্নানাগারটির প্রসঙ্গ তুললে বলতে হয় যে, এটিকে কেন্দ্র করে রোমনগরী এক বিশাল মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছিল। উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হতে পারে। অগস্টান যুগে এ্যাগরিপ্পা কর্তৃক নির্মিত এই স্নানাগারের ভিতরের দেওয়ালে বহু দেওয়াল-চিত্র ছিল। পরবর্তীকালে কারাকালার এই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব বস্তু পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়েই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ফারনিসিয়ানো মিউজিয়াম এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান করার ঝোঁক রোমে এই সময় থেকেই ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। আজকের জগতে নেপল্‌স্ মিউজিয়ামের দর্শকদের কাছে ভারসি ও হারকিউলেসের বিরাটাকার মূর্তির সারিতে অবস্থিত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে মাত্র দুটি মূর্তি ঐ স্নানাগার থেকে সংগৃহীত। বাদবাকী রোমের রাজপ্রাসাদ ও শহরতলির প্রাসাদগুলিতেও যে সব সংগ্রহ ছিল তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রোম সম্রাট নীরোর

কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি তার গোল্ডেন হাউসের জন্যে এমন অনেক বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়াও রোম সম্রাট ভেসপাজন তার সহযোগী হাভরাইনের সঙ্গে একত্রে যে ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তা রক্ষিত হয়েছিল টিভোলীর কাছে অবস্থিত রাজপ্রাসাদে। রোমে এই সংগ্রহের প্রতি আগ্রহই পরবর্তীকালে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় যে রূপ গ্রহণ করেছে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে।

এরও পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের গীর্জাগুলিকে কেন্দ্র করে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা পরিণতি লাভ করতে শুরু হয়েছে। প্রতিমাপূজক সম্প্রদায়ের ভজনালয়ে যে সব দ্রব্য সামগ্রী ছিল তা বিজয়ী 'ধর্মসম্প্রদায়' সেগুলিকে এনে রাখলেন গীর্জার অধিকারে। মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পথ ধীরে ধীরে সুগম হয়ে উঠলো। এই সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ হল, কনস্টানটাইন দি গ্রেট-এর রাজত্বের সময় রোমের প্রাচীন সেন্ট পীটর গীর্জার ভিত্তিস্থাপন হয় এবং কতকগুলি মূল্যবান অলংকার সমন্বিত প্রত্নবস্তু যা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্তও ধ্বংসের হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে ছিল —তা শেষ পর্যন্ত এই সেন্ট পীটর গীর্জায় সংরক্ষিত হয়েছিল।

এছাড়াও পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, পেটার্ক এবং পগ্‌গিয়ো প্রভৃতি ইটালীর কবি ও সাহিত্যকবৃন্দও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের দিকে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং এরই ফলে পরবর্তীকালে ইটালীর ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ও এদের উদাহরণ অনুসরণ করে চলেছেন। এরই ফলে বোধহয় রোমের মৃত্তিকার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান এরপর থেকেই শুরু হয়েছে এবং এই ধরনের প্রত্নবস্তুর সন্ধানে আগ্রহী হয়ে ইটালীর নবজাগৃতির সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী র‍্যাফায়েল পর্যন্ত একটা আড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন প্রাচীন রোম নগরীকে খুঁড়ে বের করার জন্যে। এইভাবেই একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পোপের উদ্যোগে প্রত্ন ও শিল্পবস্তু সংগ্রহের সূত্রপাত কীভাবে হচ্ছে, আবার পরবর্তী অধ্যায়ে ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ পোপ সিক্সটাস স্বাক্ষরিত এক লিপিতে দেখা যাচ্ছে, রোম থেকে সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি রোমের জনসাধারণকে ফেরত দেওয়ার জন্যে পোপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এইভাবেই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার এই চেতনাবোধ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত দীর্ঘসময় স্থায়ী হয়েছিল যে, সেই সময়েই ইংলন্ড, ফ্রান্স ও প্রুশিয়ায় জাতীয় সংগ্রহশালা (National Museum) স্থাপিত হয়েছিল শুধুমাত্র রাজা-মহারাজাদেরও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত শিল্পবস্তু থেকে। এই শতাব্দী আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে, ব্যাপকভাবে প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধানের আগ্রহই পরবর্তীকালে সম্ভব করে তুলেছিল বৈজ্ঞানিক প্রথায় খনন ও উৎখননের দ্বারা পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার। পরিশেষে এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই আমাদের ভাগ্যে পুরস্কার জুটেছে আধুনিক কালের এই মিউজিয়াম — যা শুধু শিল্প ও প্রত্নবস্তুর প্রদর্শন ও সংরক্ষণের স্থান নয়; গ্রন্থাগার, জনপ্রিয় বক্তৃতামালা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিউরেটর ও মিউজিয়ামের প্রকাশনা, এমনকি খনন ও উৎখননের কার্যাবলী, এ সবই তো মিউজিয়ামের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার এক যথার্থ রূপায়ণ। ☐

গ. ভারতবর্ষে মিউজিয়াম রূপকল্পনার ইতিহাস

'মিউজিয়াম' কথাটি বিদেশী শব্দজাত এবং এর রূপকল্পনার ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে এর উৎপত্তি সেই গ্রীস দেশের 'মিউজ' থেকে -- যাঁরা ছিলেন স্মৃতি-সঙ্গীতের দেবী। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষেও এই ধরনের কোন 'মিউজিয়াম' বা সংগ্রহশালা ছিল কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগে। দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে চিত্রশিল্পের সংগ্রহশালা অর্থাৎ বিশেষভাবে বলা যেতে পারে 'চিত্রশালা' প্রসঙ্গে বহু উল্লেখ রয়েছে। ভারতবর্ষে শিল্পচেতনা এমনই পরিব্যাপ্ত ছিল যে আলোচনা প্রসঙ্গে এলে দেখা যাবে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত দ্রব্য এবং পোষাক-পরিচ্ছদও কালোপযোগী রুচিসম্মত সজ্জায় বিচিত্রিত করা হয়েছে। বসতবাড়ির দেওয়ালেও দেওয়া হয়েছে চিত্তাকর্ষক রঙের প্রলেপ। আর তার সঙ্গে ঘরের মেঝেতে যে নক্সা সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছে তা হয়ে উঠেছে একান্তই মনোমুগ্ধকর। এমন কি মাটির কলসি বা পোড়ামাটির পাত্রেও রঙিন চিত্র এঁকে এবং কখনও বা স্বল্প গভীরে খোদাই করে নানান-নক্সায় ভরিয়ে দিয়ে যে শিল্প-সুষমা সৃষ্টি করা হয়েছে তা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তা হয়েছে যুগান্তকারী শিল্প সম্পদ। তাই গ্রাম-গ্রামান্তরের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বা ব্রত-পার্বণে ভারতবাসীরা যে পরিশীলিত ও পরিসীমিত শিল্পচর্চা করে গেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শুধু তাই নয়, ভারতবাসীরা তাদের পোষা গরু, ঘোড়া ও হাতি প্রভৃতিকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সজ্জিত করতেও কোন কার্পণ্য দেখান নি। ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এই ধরনের শিল্প সম্পদের ব্যবহার ছাড়াও অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পকলা তদানীন্তন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছিল, তার মূলে ছিল সেকালের 'চিত্রকলা' চর্চার অবদান। সেকালের চিত্রশালা তাই হয়ে উঠেছিলো এই ঐতিহ্যপূর্ণ দেশের আবহমানকালের শিল্পবস্তুর গৌরবগাথা প্রচারের একমাত্র মাধ্যম — যাকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের 'মিউজিয়াম' রূপকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।

আলোচ্য এই চিত্রশালার রূপকল্পনা সম্পর্কে কিছু না কিছু উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে রামায়ণ-মহাভারতে ও বিভিন্ন সময়ে রচিত অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে চিত্রশালার যে সব উপাদান পাওয়া গেছে তা আলোচনায় এলে দেখা যাবে যে, ভবভূতি রচিত (খ্রীঃ ৮ম শতক) 'উত্তর রামচরিতম্'-এ 'বীথি'কথাটির, অর্থাৎ ইংরেজী শব্দের 'গ্যালারী'র উল্লেখ রয়েছে এবং এইসব বীথিতে রক্ষিত চিত্রকলায় রাজন্যবর্গের বীরত্বগাথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিষয়বস্তুরই মত সুন্দরভাবে বর্ণনা দেখা যাচ্ছে 'ভাস' রচিত প্রতিমা নাটকে, (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২য়, ১ম শতক)। 'নৈষাদচরিতম্' (খ্রীঃ ১২শ শতক) কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে রাজকীয় প্রাসাদে 'মুরাল' বা 'ফ্রেসকো' দিয়ে রচিত ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক চিত্রাবলী সমন্বিত এই ধরনের

সুসংগঠিত চিত্রশালার বিবরণ। খ্রীস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে উল্লেখ রয়েছে, 'আলেখ্য গৃহ' নামে সাধারণ বীথিকার প্রসঙ্গ। সুতরাং এইসব সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রশালা স্থাপনের যে ধারাবাহিকতা লক্ষ কবা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভাবতবর্ষেও একদা এক বিশেষ ধরনেব 'মিউজিযাম' চেতনার উন্মেষ হযেছিল।

এছাড়া, তামিল সাহিত্যেও চিত্রশালা বিষয়ক বেশ কিছু উল্লেখ আছে। চোল রাজাদের বিখ্যাত নগরী 'পুহাব'কে চিত্র-বীথিতে সমুজ্জল বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালগুলি মুরাল দিযে যে চিত্রিত হযেছে এমন বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। আবার এইসব মুবাল চিত্রিত রাজপ্রাসাদের হলঘরগুলিতে স্থায়ী শিল্পকলার বীথিকা স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরিবর্তন ও পবিবর্ধনের জন্যে মধ্যে মধ্যে চিত্রিত জড়ানো পটও টাঙানো হত, যা সময় সুযোগমত পাল্টানোর পক্ষে কোন অসুবিধে হত না। শেষ মধ্যযুগে রচিত দাক্ষিণাত্যের 'নারদ শিল্পসূত্র' গ্রন্থে এইসব চিত্রবীথিকার স্থাপত্যগত আকার কি ধরনের হবে — সে সম্পর্কেও একটা ধারণা দেওযা হয়েছে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন তিন রকমের চিত্রশালার কথা বলা হয়েছে এবং সেই চিত্রশালাগুলি হল বাজপ্রাসাদে অবস্থিত শিল্পকলার বীথিকা, সাধারণের জন্যে চিত্র-বীথিকা এবং শিল্পবস্তু বিষয়ক ব্যক্তিগত সংগ্রহের বীথিকা। আলোচ্য প্রথম ধরনেরটিকে বলা যেতে পারে হারেমের চিত্রশালা; অর্থাৎ কোন কোন রাজকুমারীর শয়নঘরকে চিত্রশালায় পরিণত করা হয়েছিল, অথবা তাদের শয়নগৃহের সংলগ্ন ছিল এইসব চিত্রশালা — যাকে বলা হত 'শয়ন-চিত্রশালা'। 'শয়ন-চিত্রশালা' সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল যে, ঘুম থেকে ওঠার সময় শুভ লক্ষণ হিসাবে যেন মাঙ্গলিক বস্তুর চিত্র দেখা যায়। স্নানঘরের সংলগ্নও চিত্রবীথিকা থাকতো — যার নাম ছিল 'অভিষেক চিত্র-শালিকা'।

এছাড়া বিশেষভাবে রাজ সভাসদদের গৃহে ব্যক্তিগত চিত্রশালাও গড়ে উঠেছিল। এগুলি সংগঠিত করা হয়েছিল ভদ্রস্থানীয়, ধান্ধাবাজ এবং মোসাহেব ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তার জন্যে এবং তাদের জন্যে ব্যবহৃত গৃহগুলি এমনই সজ্জিত ছিল যে এগুলিকে সব রকমের সুকুমার শিল্পের রত্নাগার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারতো। কেবলমাত্র শৃঙ্গার, কৌতুক এবং শান্তি বিষয়ক কয়েক ধরনের চিত্রাবলী ব্যক্তিগত গৃহে মায় রাজগৃহে রাখা হতো। কিন্তু মন্দির-দেবালয় এবং অন্যান্য সাধারণের ব্যবহার্য গৃহে বা নৃত্যশালায় এবং সর্বোপরি রাজপ্রাসাদের মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে সব রকমের চিত্র শোভিত থাকতো। অবশ্য এই সব চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে অগ্রাধিকার থাকতো মঙ্গলালেখ্য অথবা শুভ লক্ষণ সমন্বিত চিত্রাবলীর।

প্রাচীন সাহিত্যে 'বানভট্ট' (খ্রীঃ ৭ম শতক) 'বিমান পঙ্‌ক্তি' কথাটি ব্যবহার করেছেন যাতে নির্দেশিত হয়েছে চিত্র-বীথি সম্পন্ন কতকগুলি সারিবদ্ধ গৃহ। 'ভবভূতি' তাঁর নাটকে 'বীথি' কথাটি ব্যবহার করেছেন এই মর্মে যে, তা সুব্যবস্থাসম্পন্ন শিল্পকলার একটি দীর্ঘ 'গ্যালারী'। পূর্ব আলোচিত 'নারদ শিল্পশাস্ত্রে' চিত্রশালার এই গৃহ কি ধরনের হবে তারও এক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গৃহটি নির্মিত হবে মন্দির স্থাপত্যে শিল্পের 'বিমান' ধরনের, অর্থাৎ এইটিই হবে মূল গৃহ এবং এর সম্মুখে থাকবে একটি ছোট 'গোপুর' বা প্রবেশদ্বার

— যার মস্তকে থাকবে শিখবকলস এবং দীর্ঘ বীথিকার অভ্যন্তরে থাকবে বাতায়নের সারি। শিল্প বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত প্রবেশদ্বার, সুসজ্জিত ঝুল বারান্দা এবং মূল গৃহের স্থাপত্যকে রূপ দেবার জন্যে নির্মিত বিরাট বিরাট স্তম্ভ — এইগুলিই যে চিত্রশালা গৃহের বৈশিষ্ট্য ছিল — তার বিবরণ আলোচিত ঐ সব প্রাচীন সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়।

'নারদ শিল্প শাস্ত্রে' আরও বলা হয়েছে, এই সব চিত্রশালাগুলি স্থাপিত হবে চৌরাস্তাব সংযোগস্থলে কোন মন্দির বা রাজপ্রাসাদের বিপরীত দিকে অথবা রাজপথের ঠিক মধ্যস্থলে। এই সব গৃহের স্থাপত্য আকৃতি গোলাকার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হবে — যার সঙ্গে থাকবে একটি বারান্দা-সহ ক্ষুদ্র হলঘর, একটি প্রধান কেন্দ্রীয় হলঘর ও পার্শ্ববর্তী হলঘর এবং সেই সঙ্গে উপরতলায় ওঠার জন্যে সিঁড়ি থাকবে। এই ধরনের চিত্রশালা গৃহ নির্মাণের জন্যে ষোল, কুড়ি অথবা বত্রিশটি থাম ব্যবহার করা হবে আর এর সঙ্গে যথোপযুক্ত বাতায়ন, একটি অলংকৃত চাঁদোয়া, প্রতি প্রবেশপথের সম্মুখে বর্গাকার সমতল ছাদ ও ভিন্ন ভিন্ন হলঘরের মধ্যে সংযোগের জন্য উপযুক্ত সিঁড়ি এবং সর্বোপরি দর্শকদের বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত আসন এ সবই থাকতে হবে। গৃহের সমস্ত কাঠামোটিকে একটি 'বিমান' স্থাপত্যের আকার দেবার জন্য এই গৃহের ছাদ অলংকৃত করতে হবে শিখর ও কলস-সজ্জা দিয়ে। সুদৃশ্য দীপাধার এবং আর্শি ব্যবহার করা হবে গোটা হলঘরটিকে আলোকিত করার জন্যে এবং প্রধান গৃহটি অলংকৃত করা হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোপুরমের নক্সা দিয়ে।

এই সব চিত্রশালার প্রদর্শ-বীথিতে থাকবে দেব, গন্ধর্ব এবং কিন্নরদের বিভিন্ন ভঙ্গিমার নানান চিত্রাবলী; তারপর থাকবে বলশালী বীরপুরুষদের এবং মহামানবদের বিবিধ মহানুভবতার কাহিনী সম্বলিত চিত্রাবলী — যা উপযুক্ত পরিমাণে এবং আকর্ষণীয় রঙের প্রলেপে সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হবে এবং সোনা ও রত্নাদির উপকরণ দিয়ে তা সজ্জিত করা হবে।

এই সব চিত্রশালার প্রদর্শ-বীথিতে যে চিত্র প্রদর্শিত হতো তার বিষয়বস্তু কখনও কখনও ভবভূতি বা কালিদাস বর্ণিত রামায়ণের দৃশ্যবলী থেকে অথবা শ্রীহর্ষ রচিত জীবন নাট্যের কাহিনী থেকে আহরিত হতো। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' এবং 'বিদ্ধশালভঞ্জক' নাটকে যে সমসাময়িক জীবনধারার চিত্র বর্ণিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তুর আলেখ্যধারাও চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হত। শৃঙ্গার রসযুক্ত ছবিগুলিও যে এই সব 'আর্ট-গ্যালারী'তে স্থান পেয়েছিল — সে সম্পর্কে 'নৈষধিয় চিত্রে' বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুনি-ঋষিদের প্রেম-ভালবাসা বিষয়ক উৎকৃষ্ট চিত্রও রাজপ্রাসাদে স্থান পেতো। প্রেমের দেবতা কামদেবের ছবিও থাকতো শয়নঘরের এক বিশেষ স্থানে। এ ছাড়া অন্যত্রও কামদেবের ছবি চিত্রিত করা হত। 'পরিপাদল' কাব্যেও ঠিক এই ধরনের এক বিবরণ পাওয়া যায় যেখানে মুরাল-চিত্রে আঁকা ছিল অহল্যার কাছে ইন্দ্রের প্রেম নিবেদন বিষয়ক চিত্র এবং কাম ও রতির মধ্যে ক্রীড়া বিনোদন বিষয়ক চিত্র। সেকালে শয়ন-চিত্রশালা বা হারেমের চিত্রশালার এইটিই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। 'বাণ' বর্ণনা দিয়েছেন যে, এই সব মুরাল চিত্রে নাগ, অসুর, যক্ষ, কিন্নর ও গরুড় প্রভৃতির প্রতিকৃতি সুস্পষ্ট অঙ্কিত হতো। এছাড়া এই সব চিত্রে সুন্দরভাবে যে লতানে গাছের নক্সা এবং লতাপাতার সজ্জা

থাকতো — তাও 'বাণ'-এর লেখায় পাওয়া যায়। 'নবসাহাসনক-চরিতে' বর্ণিত হয়েছে যে, চিত্র-বীথিতে অর্থাৎ গ্যালারীতে শিকার দৃশ্যের চিত্র থাকবে এবং জলক্রীড়া, পান-ভোজন ও নৃত্যের সময়কালের পটভূমিকায় অঙ্কিত এই সব শিকার দৃশ্যাবলী যাতেহৃদয়ঙ্গম করায় সহায়ক হতে পারে। ভারতীয় চিত্রকরদের তুলিতে পশুপক্ষীর ছবির একটা লক্ষ্মণধারা প্রায়ই ফুটে উঠতো, যা সাধারণের কাছে একান্ত প্রিয় বিষয়বস্তু হিসেবেও আদৃত ছিল।

সেকালের প্রাচীন সাহিত্য থেকে আমরা 'চিত্রশালা' বিষয়ক এই সব তথ্য ছাড়াও ভ্রাম্যমান চিত্রশালা সম্পর্কেও কিছু কিছু বিবরণ জানতে পারি। সেকালের এই ভ্রাম্যমান চিত্রশালা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হতো —আজকের যুগের 'মোবাইল' মিউজিয়ামের' অথবা ভ্রাম্যমান চিত্র প্রদর্শনীর মত। সেকালের এই সব ভ্রাম্যমান চিত্রশালার নাম দেওয়া হয়েছিল, 'নলচম্পু' এবং 'প্রায়নযোগ্যযন্ত্র' চিত্রশালা গৃহ। এই সব চিত্রশালা আকর্ষণীয় করবার জন্য এর অভ্যন্তর বিশেষভাবে সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে সুবাসিত করা হত। চিত্রশালার গ্যালারী খোলা হত সন্ধ্যায়, যাতে আগ্রহী দর্শকরা সুখপ্রদভাবে সেখানে তাদের সান্ধ্যকালীন সময় কাটাতে পারে। এর সঙ্গে সমকালীন সামাজিক বিধিব্যবস্থা মত প্রেমিক-প্রেমিকাদের আমোদপ্রমোদের জন্যে একটা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট স্থানও থাকতো সেই সব চিত্রশালায়। শরৎ ঋতুর আনন্দময় আবহাওয়ায় এই সব চিত্রশালাগুলি সে সময় বিপুলসংখ্যক দর্শকদের আগমনে সরগরম হয়ে উঠতো।

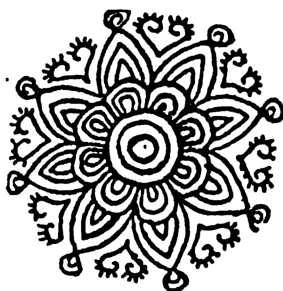
এইভাবেই দেখা যাচ্ছে শিল্প সামগ্রীর ভাণ্ডার এই সব চিত্রশালাগুলিই ভারতীয় জীবনে সংগ্রহশালার রূপকল্পনায় এক প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজকের সংগ্রহশালার চিন্তা ভাবনার মতই সেকালের এই সব চিত্রশালাও ছিল শিল্পজ্ঞানের একটি প্রধান কেন্দ্র — যেখানে শিল্পপ্রেমিক নাগরিকগণ শুধু শিল্পচর্চার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেন নি, আমোদ-আহ্লাদেব এবং চিত্ত বিনোদনের স্থান হিসেবেও উপভোগ করেছেন।

অন্যদিকে মিউজিয়াম রূপকল্পনার বাস্তব জগৎ হিসাবে আমরা দেখি আমাদের দেশের মন্দির-দেবালয়ের অবস্থান ও অবদান। অতুলনীয় ভাস্কর্য-স্থাপত্যের উপকরণসহ এ দেশে যে ভাবে সুসজ্জিত মন্দির-দেবালয় গড়ে উঠেছিল, যার দেওয়ালে একদিকে যেমন ভাস্কর্য হিসাবে খোদিত হতো রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে লোকশিক্ষার উপকরণ, অন্যদিকে সেই সব দেবালয়গুলি হয়ে উঠেছিল সাহিত্য-শিল্পচর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারগুলিও ছিল সে সময়ে জ্ঞানচর্চার এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র এবং এই সব কেন্দ্রে যে পরিমাণ শিল্প-ভাস্কর্যের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল তা আজকের যুগের যে কোন একটি বৃহৎ সংগ্রহশালার সমকক্ষ বলা যেতে পারতো। একদা গুজরাট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জৈন ভাণ্ডারগুলিতেও সে সময় শিল্প-সাহিত্যের যে সুবিপুল সম্ভার সঞ্চিত হয়েছিল, তা বর্তমান কালের মিউজিয়াম রূপকল্পনারই এক বিশেষ আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে।

এছাড়া একটিমাত্র কথায় বলা যেতে পারে, এদেশের মাটিতে এমন অনেক শিলালিপিমালা, এমন অনেক মূর্তি এবং এমন অনেক দানপত্র পাওয়া গেছে যার মধ্যেই নিহিত আছে সেই সংগ্রহশালা রূপকল্পনার আদর্শ। পরবর্তীকালে মুসলিম নরপতিদের

মধ্যেও পুরাবস্তু সংগ্রহের যে ঝোঁক ছিল তারও বিবরণ পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকের ফিরোজ শা তোগলকের সংগ্রহ প্রচেষ্টায়, যিনি তার রাজধানীতে অশোকস্তম্ভ আনয়নের মধ্যেই পুরাবস্তু প্রীতির পরিচয় রেখেছেন। মোগল আমলেও এই সব শিল্পবস্তুর সংগ্রহ ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের দেশের সংগ্রহশালা সংগঠনেব চিন্তায় এক বিশেষ রূপদান করেছে।

অতীত সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষ তার মিউজিয়াম রূপকল্পনায় অনেক স্বাক্ষর রেখে গেছে তার সাহিত্যে, শিল্পে ও সভ্যতার ইতিহাসে। ক্রমোন্নতির আরও অনেক অতীত উপাদান এখনও আত্মগোপন করে আছে — যা একান্তই চর্চা ও গবেষণা সাপেক্ষ। যুগ যুগ ধরে এমন এক উন্নত সভ্যতার দেশে তার শিল্প-স্থাপত্য চর্চার বিকাশ এমনই বিস্তৃত আকার ধারণ করেছিল যে, গোটা ভারতবর্ষই একটা সমৃদ্ধ মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছিল — যার ধ্বংসস্তূপের বিভিন্ন উপাদানকে সম্বল করে আজকের ভারতে মিউজিয়াম সংগঠন পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ❑



ঘ. রবীন্দ্রনাথ ও জনশিক্ষায় মিউজিয়াম

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে এক শতাব্দী আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে উক্তি করেছিলেন সেই উক্তির যথার্থতা আজও উপলব্ধি করা যায় আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। সেকালের বিদ্যাশিক্ষার কাঠামোটি কেন্দ্রীভূত ছিল শুধুমাত্র চাকরির জন্যে একটা প্রয়োজনীয় পাশপোর্ট পাওয়ার সাধনা। পরাধীন দেশে ইংরেজ প্রবর্তিত এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে বিদ্যাসাগর তাই লিখেছিলেন, 'আমাদের যে সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নেই, পাঙ্খা ফি নেই, একজামিনেশন ফি নিয়ে কলের দোর খুলি — দেখাইয়া দিই এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে বলিয়া তাহাদের কলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাশ দিয়া, কেহ এন্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি.এ. হইয়া, কেহ বা এম.এ. হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has ; এক পাকের তৈরী কি না।'

বিদ্যাসাগরের কাল শেষ হয়েছে বহুদিন আগে। রবীন্দ্রনাথের চোখে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শটি কিভাব ধরা পড়েছিল তার আলোচনায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাসাগরের মতই আক্ষেপ করেছেন এই প্রতিধ্বনি তুলে ঃ 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি — সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার অংশ সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারের মুখও চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন। ছাত্ররা দু'বার পাতকলে ছাঁটাবিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার মার্কা পড়িয়া যায়।'

মোটামুটি এই হল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ। শুধু বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ কেন, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেরাণী গড়ার সঙ্কীর্ণ আদর্শকে বহু সজ্জনই তীব্র সমালোচনা করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থার এই গুরুতর গলদটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'এ শিক্ষাকলের প্রণালী হইতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।' তাঁর মতে, 'যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করার দক্ষতা থাকে না।' প্রচলিত পুঁথি পাঠের বিদ্যেকে সমালোচনা করে তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প প্রভাব উত্থাপন করতে গিয়ে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন তা হল, '..... কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিষকে দেখিয়া শুনিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মনন শক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল।' আরও পরিষ্কারভাবে

তিনি তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করলেন এই বলে, 'অতএব একথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।'

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সংস্রবেব মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা পদ্ধতিব সংস্কার করা যায় — তারই বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনার অন্ত ছিল না। এক সময়ে তিনি ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন সন্ধান ও সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়ে। তাঁর মতে স্বদেশকে ভালবাসার প্রমাণই হোল, যারা স্বদেশের সঙ্গে সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হতে চায়। তাই এই ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষি কুটিরে .... স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য ... দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশ প্রেমকে সার্থক করো।' শুধুমাত্র সংগ্রহ নয় — সংগৃহীত বস্তুগুলির যথাযথ প্রদর্শন করার উপযোগিতা সম্পর্কে 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃত সাহিত্য, লোক বিবরণ .... প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের ফটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য।'

সর্বোপরি দেশের নিরক্ষর মানুষদের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলার প্রতি কটাক্ষ করে এবং ঐ আপামর জনসাধারণের লোকশিক্ষার জন্যে করণীয় কিছু থাকতে পারে কিনা সে সম্পর্কে গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে প্রসঙ্গত তিনি লিখেছিলেন, 'কেরাণী তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজত্বে স্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের দেশে প্রধানতঃ দেশের কাজ কংগ্রেসের পাণ্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধমালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা-উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল।

ওই দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয়নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসমর্থের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কিনা এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটি চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনো কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেই জন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগা উচিত।'

সুতরাং সমাজের অনাদরে বঞ্চিত মানুষের চিত্ত সম্পদের এই অপব্যয় রবীন্দ্রনাথকে যেমন ব্যথিত করে তেমনি এই চিরবাধাগ্রস্ত তলায় সূর্যের আলো প্রবেশ করানোর উপায় সম্পর্কে পথের সন্ধান পাওয়াটাই তাঁর কাছে একটি বড়ো প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়।

১৯৩০ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিভ্রমণে যান। সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাশিয়ায় অবস্থিত সে দেশের বেশ কিছু

মিউজিয়াম, মিউজিয়ামের সংগ্রহ এবং তার শিক্ষামূলক কার্যাবলী দেখে। শ্রুতিদর্শনমূলক সাহায্যের মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষাকে আরও ত্বরান্বিত ও আগ্রহী করে তুলতে পারা যায় এবং দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে 'লোক শিক্ষার' বিষয়টিকে কিভাবে উপস্থাপিত করা যায় — তা সবিশেষ অনুধাবন করেছিলেন রাশিয়ায় এসে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন — "শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানা প্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active) ।"

এই মিউজিয়ম চেতনা রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা জানা যায় তাঁর বিদেশযাত্রায় যখন তিনি বহু দ্রষ্টব্য স্থানের আকর্ষণকে গৌণ করে — মিউজিয়াম পরিদর্শনকে মুখ্য করে তুলেছিলেন এবং তিনি যা মন্তব্য করেছিলেন তা এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন, 'এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনেওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারিনি। দেখবার এত জিনিষ খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়।'

তাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ হ'তে হয়েছিল — বিদেশের বিভিন্ন ধরনের মিউজিয়ামের কার্যকলাপ দেখে। এই মিউজিয়াম কিভাবে দেশের যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, 'বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথি পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বার আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড় বড় শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচর'। সমাজ জীবনে মিউজিয়ামের কার্যকারিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে যে একান্তই মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন সন্ধান ও সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাঁধা গণ্ডী পেরিয়ে পুঁথির ইস্কুলকে যদি প্রকৃতির আসরে এনে হাজির করা যায় — তখনই সম্পূর্ণ হতে পারে তার প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃতি পরিচয় বা ইংরেজিতে যাকে বলে Nature Study —এই গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'পথে ও পথের প্রান্তে' তার চিন্তাভাবনায় যে বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তা এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছিলেন, 'ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোন দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা নাম আছে কিন্তু সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জোরে অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে আসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং জানান দেয়। আমাদের

সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ. তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নাম মালায় রোজই বারবার পড়ে আসছি যুথি জাতি সেঁউতি। ছন্দ মিললেই খুশি থাকি, কিন্তু কোন্ ফুল জাতি কোন্ ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি, কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন করে উত্তর পাইনি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জনেরই বা আছে। অপর পক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের মনে প্রিয় নামের আসন পেয়েছে— কপোতাক্ষী, ময়ূরাক্ষী, ইচ্ছামতী। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পূজার ফুল ছাড়া আর কোন ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাশনের সম্বন্ধ আছে অচিরায়ু সীজ্‌ন্ ফ্লাউয়ারের সঙ্গে — মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার — ফুলদানিতে যথারীতি তাদের যাতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটীরিয়ালিজ্‌ম্ — স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দশা ভেবে দেখো, ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সংকীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখি সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক, কোকিল, পাপিয়া, বৌ-কথা কও'কে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু কত সুন্দর পাখি আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্যও এই স্বভাব-বশতই প্রবল। পরীক্ষা-পাসের জন্যে ইতিহাস পাঠে উপেক্ষা করবার জো নেই আমাদের স্বাদেশিকতা সেই পুঁথির ঝুলি দিয়ে তৈরী, দেশের লোকের 'পরে অনুরাগের ঔৎসুক্য দিয়ে নয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ উক্তির মধ্যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে পুঁথি সর্বস্ব ভাব বিদ্যমান রয়েছে — তা স্পষ্টই বোঝা যায়। গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তিনি এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন বলেই — তাঁর পক্ষে এই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পথের হদিশ খুঁজে বের করত সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথ ঐ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন স্থানীয় তথ্যানুসন্ধানের উদ্যোগ। এই তথ্যানুসন্ধানের কাজে সোভিয়েট রাশিয়ার মিউজিয়ামগুলি কীভাবে সাহায্য করতে পেরেছে তারই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন ঃ 'রাশিয়ার Region Study অর্থাৎ স্থানিক তথ্য সন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। .... এসব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তাছাড়া যে সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কি রকম শ্রেণীর কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কিনা, তার খোঁজ হয়ে থাকে। এইসব কেন্দ্রের সঙ্গে যে সব ম্যুজিয়ম আছে, তারই যোগে সাধারণের শিক্ষা-বিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই স্থানিক তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।'

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজে মিউজিয়ামের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে তিনি প্রসঙ্গত তাঁর নিজ দেশের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ঃ '.... এই রকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনের কালীমোহন

কিছু পরিমাণে করেছেন, কিন্তু এই কাজেব সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোন উপকার হয়নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে সন্ধান করার মন তৈরী করা কম কথা নয়। কলেজ বিভাগের ইকনমিকস্ ক্লাশের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এই রকম চর্চার পত্তন করেছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরও বেশি সাধারণভাবে কবা দরকার, পাঠভবনেব ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই।' পরিশেষে এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে মিউজিয়ামেব ভূমিকাকে কিভাবে ঐ প্রচেষ্টার রূপায়নে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায় — তাবই পথনির্দেশ দিয়েছেন এই বলে '..... আর এই সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।'

মিউজিযামের মূলতঃ ভূমিকা হোল সন্ধান ও সংগ্রহ। এই সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে মিউজিয়াম স্থাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা বোঝা যায় — বাংলার গ্রামীণ লোকশিল্পের সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে তাঁর আত্মনিয়োগ করা থেকে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহু কারণে বাংলার এই চিরন্তন লোকশিল্পের ধারাটির দ্রুত অবলুপ্তি ঘটায় রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন — এগুলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর ফলে, সংগৃহীত এইসব বস্তুর দ্বারা একদিন হয়ত বাঙ্গালীর অতীত সংস্কৃতি পরিচয় এইভাবেই জানা যাবে মিউজিয়ামের প্রদর্শন-কক্ষে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাই উৎকণ্ঠিত হয়ে কবি-সমালোচক মোহিতলালকে লিখেছিলেন, 'আমি কিছুকাল যাবত একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি; বাংলার নিজস্ব আর্ট, আইডিয়া ক্রমে বিদেশীয় প্রভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন পরে আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি লোপ পাইবে। তাই আমি এই সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টা কখনই ম্লান হয়নি। বাংলার লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহের কাজে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে একটি চিঠিতে তিনি তাই লিখেছিলেন ঃ

'চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোন শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই — চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার ফটো বা অন্য কোনো রকমের প্রতিকৃতি। ... ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির কড়ির বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কিরকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।'

সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে মিউজিয়ামের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি অন্যত্র আরও বিশদ আলোচনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে উপযুক্তভাবে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা সংগঠনের অভাবে দেশের পুরাতাত্ত্বিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক সম্পদ কীভাবে নষ্ট হতে পারে তার

প্রকৃষ্ট উদাহবণ হোল পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাব উত্তরাধিকারী দেশগুলি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি যে, ১৯০৫ সালে 'প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইন' প্রচলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশেরও বহু মূল্যবান পুরাবস্তুও লুণ্ঠিত হয়েছে এবং কতকাংশ অবহেলায় ও উদাসীনতায় নষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে পুরাতন চীনের ক্ষেত্রেও তাই। সাম্রাজ্যবাদের শোষণে পুবাতন চীনের এই মূল্যবান শিল্পবস্তু ও প্রত্নতত্ত্ব সামগ্রীর অবাধ লুণ্ঠনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন 'য়ুরোপেব সাম্রাজ্য ভোগীরা পিকিনেব বসন্তপ্রাসাদকে কি রকম ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে, বহু যুগের অমূল্য শিল্প সামগ্রী কিবকম লুটে পুটে ছিঁড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিষ জগতে আর কোনদিন তৈরী হতেই পারবে না।'

চীনের এই সাংস্কৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্যথা অনুভব করেছিলেন, অপরদিকে সোভিয়েট রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর যুগে দেশের মূল্যবান শিল্প ও প্রত্নবস্তু সামগ্রী সংরক্ষণের কাজে মিউজিয়ামের ভূমিকায় চমৎকৃত হয়েছিলেন একান্তই। তাঁব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি লিখেছেন, 'ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকবা, অর্ধ অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা কিছু রক্ষা যোগ্য জিনিষ সমস্ত উদ্ধাব কবে যুনিভার্সিটিব ম্যুজিযমে সংগ্রহ করতে লাগলো। ... বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে ....।' কিন্তু এখানেই শেষ নয়; মিউজিয়ামে বস্তুগুলির শুধুমাত্র প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হযনি। তাই তিনি পুনরায় লিখেছেন, 'এই তো গেল সংগ্রহ, তারপরে এই সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা।'

এই প্রসঙ্গে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের অভাব সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, 'আর্ট' সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে একটা দুর্বোধ্য ভাব সৃষ্টি করে একটা অজ্ঞানতার প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়। এই অন্তসারশূন্য মনোভাবকে বিদ্রূপ করে লিখেছেন, 'আমাদের দেশে পলিটিকস্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সবরকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে।' তাই এক্ষেত্রে আমাদের দেশে আর্টের অবদান সাধারণের কাছে অবহেলিত হয়ে রয়েছে। অথচ এই ধরনের আর্ট-মিউজিয়ামে নিযুক্ত পরিচায়ক অর্থাৎ আজকালকার যুগের 'গাইড্-লেকচারার' মারফৎ কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে আর্টের বক্তব্য অর্থাৎ 'চিত্রবস্তুর সংস্থান' (Composition), তার বর্ণ কল্পনা (Colour Schemes), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (Space), তার উজ্জ্বলতা (Illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (techinques) — এ সবই তুলে ধরা যেতে পারে — তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি সংস্থাপিত করেছিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় ছবির মিউজিয়ামের কার্যাবলীর বর্ণনা দিয়ে। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে

দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের শিক্ষা বিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনা পাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

.... এই জন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, ম্যুজিয়মে যে সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে, তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। .... কিন্তু দর্শকের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।'

সাধারণ দর্শকদের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ার মিউজিয়ামের উদ্যোগে কীভাবে ছবি দেখতে শেখানো হয় — তার মোটামুটি বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। আমাদের দেশেও শিল্প ও চিত্রকলার বহু অতুলনীয় সম্পদ বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে সাধারণ মানুষের মনে শিল্পবোধ সৃষ্টির কাজে আমাদের দেশের মিউজিয়ামগুলি কতখানি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন — তা আজ একান্তই অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

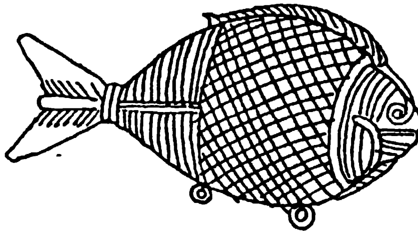
অপর দিকে মিউজিয়াম যে একটি জড়বস্তুর মজুত ঘর তাই নয় — বর্তমানকালে মিউজিয়ামের ভূমিকা হোল সমাজের বিভিন্ন বয়সের নাগরিকের কাছে একটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাশিয়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই ধরনের একটি খেলনার মিউজিয়ম দেখে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনেও অনুরূপ একটা খেলনার মিউজিয়াম স্থাপন করার। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি লিখেছেন, ".... এদের এখানে খেলনার মিউজিয়াম আছে। এই খেলনা সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরছে। তোমাদের নন্দনালয়ের কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হোল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি অনেকটা আমাদেরই মতো।'

আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষের কাছে প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগে শ্রুতিদর্শন মূলক শিক্ষার মাধ্যমে মিউজিয়ামগুলি যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে — সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আভাস দিয়েছিলেন রাশিয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময়। তিনি লিখেছেন, 'মস্কৌতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। ওটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ায় সমস্ত ছোটো বড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই রকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের

ম্যুজিয়ম

পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন মিউজিয়াম পরিদর্শন করে এবং তার কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন যে, বিভিন্ন ধরনের মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের দেশেও এক সৃজনধর্মী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর সহজাত সৃজনাত্মক শক্তিকে এবং এছাড়াও আমাদের দেশের অগণিত নিরক্ষর মানুষের বোধশক্তিকে শ্রুতিদর্শনমূলক সাহায্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট করে তোলাই হোল মিউজিয়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার এই সার্বজনীন অবদানকে মিউজিয়ামেব মাধ্যমে তুলে ধরে আপামর জনসাধারণের জীবনকে দৈন্যের তলা থেকে মুক্ত করে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলেন।

প্রায় আশী বছর আগে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন — তা আজও শিক্ষিত সম্প্রদাযের তথা সরকারী শিক্ষাবিভাগেব দৃষ্টি সেখানে পৌঁছোয়নি। আমাদের দেশে মিউজিয়াম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে — রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনাব সার্থক রূপায়ণ করে — তাঁব স্মৃতির প্রতি কি আমরা যথার্থ মর্যাদা দিতে পারিনা? আমাদের দেশের শিক্ষা বিভাগ রবীন্দ্রনাথের এই মিউজিয়াম পরিকল্পনা সম্পর্কে কি বলেন? ❒



৬. জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার যৌথ ভূমিকা

পশ্চিমবাংলায় একদা গ্রাম্য সংগ্রহশালাগুলির (মিউজিয়াম) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অনুরাগী মানুষদের উদ্যোগে। প্রাচীন ইতিহাসের তত্ত্ব বা পুরাবস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন এমন সব মানুষরাই স্থানীয় পুরাবস্তু অবহেলা বা অযত্নে বিনষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলিকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংগ্রহ করার দিকেই নজর দিয়েছিলেন। মিউজিয়ম-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংগৃহীত বস্তুগুলিকে যথাযথভাবে সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য তারা প্রথমদিকে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায় তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন নি, বা সংগৃহীত বস্তুগুলিকে নিযে কোন সংগ্রহশালায় রূপ দেওয়া যায় কিনা তা নিয়েও কোন চিন্তাভাবনাও তারা করেন নি। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, এমন সব আগ্রহী মানুষদের সংগ্রহ শেষ অবধি জমা হয়েছে স্থানীয় কোন গ্রন্থাগারের এক কোণে একান্তই অবহেলাভরে এবং সেসব সংগ্রহ দিয়ে গ্রন্থাগারের শামিল কোন সংগ্রহশালা গড়ে তোলা যায় কিনা তেমন চিন্তাভাবনার অবকাশ অধিকাংশ গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সঙ্গে মিউজিয়াম একত্রে গড়ে উঠেছে এমন উদাহরণের প্রসঙ্গ উঠলে দেখা যায় সেগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করেছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নজর দিলে দেখা যাবে, গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কাহিনী সবই যেন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। আমাদের এই ভারতবর্ষেও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিদ্যোৎসাহী সমিতিগুলির চেষ্টায় একই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন গ্রন্থাগার গড়ে উঠে, তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত হয় সংগ্রহশালাও। ফলতঃ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিই হল এর এক উদাহরণ। এছাড়া কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তার শাখাসমূহের উদাহরণ তো আছেই। মালদহের জেলা গ্রন্থাগার ও মিউজিয়াম এমনই একটি দৃষ্টান্ত। এছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে জেলা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, হুগলীর রাজবলহাটে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার সংলগ্ন অমূল্য প্রত্নশালা, বর্ধমান জেলার জাড়গ্রামে অবস্থিত মাখনলাল পাঠাগার ও তৎ সংলগ্ন পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা প্রভৃতি এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। বাদ বাকী গ্রামাঞ্চলেও এমন অসংখ্য গ্রন্থাগার আছে যেখানে স্থানীয় উৎসাহীদের এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা এমন অসংখ্য পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে একদা গ্রাম্য সংগ্রহশালা পত্তনের মূলে দেখা যায় স্থানীয় উৎসাহীদের অদম্য উদ্যোগ।

সুতরাং অতীতে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা উভয় প্রতিষ্ঠান একটি মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে, পাশাপাশি অগ্রসর হবার দায়িত্ব যে গ্রহণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উভয় প্রতিষ্ঠানই সংগ্রহের প্রয়াসে নিজেদের নিয়োজিত করেছে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে। গ্রন্থাগার পুস্তক সংগ্রহের ব্যবস্থাপনায় রত এবং সংগ্রহশালা মানবসৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার

এবং প্রাকৃতিক জৈব ও অজৈব নিদর্শনের আহরণ ও সংরক্ষণে ব্রতী। তাই বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা চলেছে একই পথে, অর্থাৎ সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই দুই প্রতিষ্ঠানই সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে। অনেক গ্রন্থাগার সংগঠকের পক্ষে জনশিক্ষার কাজে সংগ্রহশালার ভূমিকাকে অপাংক্তেয় করে দেখানোর প্রবণতা দেখা যায় এবং এ সম্পর্কে সংগ্রহশালাবিদ্‌দেব (Museologist) পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে কবা যায।

মিউজিয়ামের সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে গ্রন্থাগার সংগঠকদের সংশয় দূর করতে হলে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির দিকে দৃষ্টি ফেবানো যাক্।

'Oxford English Dictionary' -র মতে সংগ্রহশালা হোল,

I a. Hist.

The University building erected at Alexandria by Ptolemy Soter.

b. Gen.

A building or apartment dedicated to the pursuit of learning or the arts; a 'home of the Museums'; a scholar's 'study'.

2. A building or portion of a building used as a repository for the preservation and exhibition of objects illustrative of antiquities, natural history, fine and industrial art, or some particular branch of any of these subjects, either generally or with reference to a definite region or period. Also applied to the collection of objects it self. (VOL—VI—L—M).

'Encyclopaedia Britannica' -এব মতে ঃ

'The museum of today is an institution which exhibits and stores objects of history, art, science, industry and other more specialised categories and in addition may interpret or use these objects to explain trends and developments in the various fields of human knowledge. Terms such as "gallery", "art institute", "hall of fame" etc., are after interchangable with the term "museum".

(VOL-15, P p 985, 1059 ed.)

'Encyclopaedia Americana' তে বলা হয়েছে ঃ

"Museums are institutions for preservation, study and display of natural objects, or of those made by man, while as a sequence of study comes the publication of information thus derived."

(VOL—19—P p. 619—1957 ed.)

UNESCO এর সুপারিশ মতে মিউজিয়ম এর সংজ্ঞা হোল ঃ

"The term 'museum' shall be taken to mean any permanent establishment administered in the general interest for the purpose of preserving, studying, enhancing by various means and, in particular, exhibiting to the public for its delectation and instruction, groups of objects and specimens of cultural value: artistic, historical, scientific and techonological collections, botanical and zoological gerdens and aquariums."

'International Council of Museums' এর গঠনতন্ত্রের ২ ধারার সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

Article —3—ICOM shall recognise as a museum any permanent institution, which conserves and displays, for purposes of study,education and enjoyment, collections of objects of cultural or scientific significance.

Article—4—Within this definition fall :

(a) exhibition galleries permanently maintained by public libraries and collection of archives.

(b) historical monuments and parts of historical monuments ..... etc., archaeological and natural sites, which are officially open to the public.

(c) botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, and other institutions which display living specimens.

(d) natural reserves.

এখন উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হওয়া যাবে যে, মিউজিয়ামের সংজ্ঞার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা, বা গ্রন্থাগার সংগঠকদের সংগ্রহশালার পক্ষে জনসেবার ক্ষেত্রে কোন কাজ নেই —এই ধরনের ভ্রমাত্মক ও অমূলক উক্তির যথার্থতা কতখানি। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকই যে মিউজিয়ামের অবদান ও কর্মধারাকে সমাজসেবার কাজে অস্বীকার করতে পারবেন না — একথা বলাই বাহুল্য।

অতএব মিউজিয়াম শুধুমাত্র ইতিহাসের নয় বা 'পুরাতন ঐতিহ্যকে তার Coffin Box-এ সংগ্রহ করে রাখা' নয়। এক্ষেত্রে মিউজিয়ামের সংজ্ঞাকে ধরে নিয়ে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, অতীতে প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ঔষধিতত্ত্ব এবং বিশেষ করে শারীরস্থান শাস্ত্র কোনদিনই মিউজিয়ামকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার (Technology) এবং জীবনী-মূলক বিষয়ের জন্য অনায়াসেই মিউজিয়াম সংগঠিত করা যেতে পারে এবং এই ধরনের মিউজিয়ামের উদাহরণ ভূরি ভূরি মিলতে পারে। মিউজিয়ামকে বাদ দিয়ে গ্রন্থপঞ্জী ও বর্ণনামূলক গ্রন্থবিদ্যা ও ইতিহাস প্রণয়ন করা কি কোনদিন সম্ভব হোতে পারতো?

আমাদের দেশের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত প্রামাণ্য পুস্তকাদি রচনা করা হয়েছে, তার মূল উপাদান সংগৃহীত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন মিউজিয়ামগুলির যথা, Indian Museum- Calcutta, Government Museum - Tamilnadu, Central Museum- Nagpur, State Museum-Lucknow, Archaeological Museum - Mathura এবং Prince of Wales Museum of Western India - Mumbai র উদ্যোগে সংরক্ষিত বস্তুকে কেন্দ্র করেই। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, কলিকাতাস্থ Indian Museum এর সংগ্রহ না থাকলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং Watt কি কোনদিন ভারতীয় শিল্পবস্তু সম্পর্কিত রচনাদি এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্বকোষ রচনা করতে সক্ষম হতেন?

আমাদের দেশের উদাহরণ ছাড়াও, বিদেশের দু'একটি উদাহরণ প্রসঙ্গত তুলে ধরা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। আমস্টারড্যামের Frederick Ruysch (1638-1731)

শারীরস্থান ও উদ্ভিদতত্ত্বের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর এই খ্যাতির পিছনে ছিল তাঁব উক্ত বিযযক একটি মৌল সংগ্রহেব অবদান — যা ব্যতিরেকে কোনদিনই এই বিযযগুলিব উন্নযন সম্ভব হোতো না। বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ Linnaeusকে বলা হয় 'Father of Zoology' ; ইনি প্রাণীতত্ত্বেব শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেছিলেন মূলতঃ তাঁবই সংগৃহীত বস্তুর মিউজিযাম থেকেই। এছাড়া British Museum এর মৌল প্রকাশন গ্রন্থগুলি (Basic Publication) এখনও Text বই হিসাবে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশেব গ্রন্থাগাবিকদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রথম ও প্রাথমিক পুস্তকগুলি Roxburgh, Kyd, Blyth, Foote প্রভৃতি ঐ ঐ বিষয়ের সংগ্রহশালার কর্মীদের সংগ্রহভিত্তিক গবেষণাব ফল। সুতরাং মিউজিয়াম কি শুধুমাত্র সংরক্ষণের কেন্দ্র এবং এর কি Public Service হিসাবে কোন অবদান নেই? এ প্রশ্নের উত্তর আশা করি নিষ্প্রয়োজন।

অপরদিকে যদি মিউজিয়ামকে শুধুমাত্র ইতিহাসের বা প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্কিত বলে ধবে নেওয়া যায় — তাহলেই বা আপত্তি কোথায়? এক্ষেত্রে মিউজিয়ামের সাহায্য ছাড়াই কি ইতিহাস রচনা করা বা রচিত ইতিহাসকে বাদ দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যান্য বিষয়গুলির কি উন্নয়ন করা সম্ভব হোত? বলা বাহুল্য, নিশ্চয়ই তা সম্ভব হোত না, আর এই জন্যেই Dewey প্রমুখ সকল গ্রন্থাগাব বিজ্ঞানীরাই গ্রন্থাগারের বর্গীকরণে ইতিহাসের গুরত্বকে কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারেন নি।

গ্রন্থাগার সংগঠকদের অনেকে মিউজিয়ম সম্পর্কে কটাক্ষ করে থাকেন যে, সংগ্রহশালার পিছনে সামাজিকতা বলতে কিছু নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে মিউজিয়ামের কাজে এবং সেই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি তা আলোচনা করা দরকার। বর্তমান সময়ে বলতে গেলে সংগ্রহশালাই জনশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশের একটি ব্যাপক অংশ নিরক্ষর। সুতরাং এই সব নিরক্ষরদের কাছে সমাজ শিক্ষা এবং বিধিবৎ শিক্ষা পৌঁছে দিতে গেলে সংগ্রহশালায় রক্ষিত বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র করে শ্রুতিদর্শন মূলক বৈজ্ঞানিক উপকরণের (Formal education) (Audio Visual aids) সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। আর এইভাবেই আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশেই সংগ্রহশালার দ্বারা জনশিক্ষা প্রসার লাভ করছে। সংগ্রহশালা শিক্ষার বাহন হিসেবে কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, এ বিষয়ে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তৎকালীন উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, '....the Museum may be regarded, first as an adjunct to the class room and the lecture room', secondly, as a bureau of information and thirdly, as an institution for the culture of the people. A considerable measure of succesful work has been accomplished of these directions, within the limited means at our disposal; but these aims are matters of vital improtance for the promotion of which further determined efforts must be made". (An inaugural address delivered by Hon. Justice Sir Asutosh Mookerjee, Kt. C.S.I. LLD DSC. ... ... Indian Museum, Pp 18)

সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে মিউজিয়ামের মারফত শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা পরবর্তীকালে আদৃত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে সংগ্রহশালাগুলিতে ব্যাপকভাবে দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধিতে মিউজিয়াম পরিকল্পনার বাস্তবতাই সূচিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম শতকে Mudaliar Commission-এর রিপোর্টে প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করে মিউজিয়াম স্থাপন করার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধরনের স্কুল মিউজিয়াম সংগঠন করার জন্য Government Museum, Madras–এর পক্ষ থেকে একটি Hand bookও প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের উন্নতিতে UNESCO-র অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি সংগ্রহশালা বিজ্ঞানীরাও অনায়াসে মিউজিয়ামের ক্ষেত্রে UNESCO -র অবদানকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারে না। তার কারণ জনগণের শিক্ষায় মিউজিয়ামের ভূমিকাকে সুদূরপ্রসারী করার জন্যে UNESCO যে দুটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন তা অবগতির জন্যে তুলে ধরা হচ্ছে। এর মধ্যে (১) The Organization of Museums - Practical advise এবং (২) Museum Techniques in Fundamental Education – পুস্তক দুটিই প্রধান।

পুরাতন বস্তুর সংগ্রহকে রক্ষা করার জন্যে, ঐতিহ্যময় রীতিতে শিল্প প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্যে, গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনী সংগঠন করার জন্যে, পরিবর্তনশীল লোকশিল্পের একটা ইতিহাসানুগ তথ্য সংরক্ষণের জন্যে এবং কৃষি ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের উপায় সম্পর্কে নির্দেশদানের জন্যে সংগ্রহশালার যে এক অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে, তা নিয়ে UNESCO প্রকাশিত শেষোক্ত পুস্তকটিতে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় মিউজিয়ামের মারফত নিউ মেক্সিকোর আদিম জাতির অবলুপ্ত শিল্পকলা এবং আমেরিকার 'নাভাহো' উপজাতির মৃতপ্রায় কম্বল বয়নের রীতি পদ্ধতি কীভাবে সংগ্রহশালার মারফৎ পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল — তা দেখানো হয়েছে। আমাদের দেশে গাছ ও ভূমি সংরক্ষণের উপায় এবং সব্জী উৎপাদনের জন্য বাগান নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কীভাবে সংগ্রহশালা প্রযুক্তি বিদ্যা (Museum Technique) মারফৎ সাধারণের কাছে তুলে ধরা যায় — তা মহীশূরে অনুষ্ঠিত সংগ্রহশালা শিবিরের রিপোর্ট ঐ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। অনেকে মিউজিয়ামের ভূমিকাকে যে ভাবে দেখেছেন তা হোল — বইকে সংরক্ষণ করা ছাড়া সংগ্রহশালার আর কোন কাজ বুঝি নেই। এই কটাক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি হোল এই যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরাও বইয়ের এই সংরক্ষণ ও দুষ্প্রাপ্যতাকে না মেনে নিয়ে থাকতে পারেন নি; Dewey-ও তার ব্যতিক্রম। কেননা অধিকাংশ গ্রন্থাগার বর্গীকরণে একটি বিশেষ স্থান বর্গীকৃত চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে এবং এই স্থানে বিষয় নির্বিশেষে দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপুস্তক সংরক্ষিত করা হয়। উদ্দেশ্য হোল, এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের উক্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তকগুলি একসঙ্গে থাকে এবং ভালভাবেই থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে মিউজিয়াম শুধুমাত্র গ্রন্থ সংরক্ষণের কেন্দ্র বলে হেয় করা মোটেই সমীচীন নয়।

সংরক্ষণ ঃ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা — এই দুই প্রতিষ্ঠানেরই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার গবেষণাগার নিঃসন্দেহে এবং অবিসম্বাদীভাবে গ্রন্থাগার

জগতকে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পাবে। এ প্রসঙ্গে H.J. Plenderneith-এব গবেষণালব্ধ গ্রন্থেব কথা সকলে অবগত আছেন। ভারতেও প্রধান প্রধান সংগ্রহশালাগুলি এ ব্যাপারে গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানাকে সাহায্য কবে।

মিউজিয়ামের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলার আছে; কিন্তু অধিক কহিব কত, পুঁথি বেড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে শুধুমাত্র বলা যেতে পারে যে, মিউজিয়ামের জনকল্যাণমূলক ভূমিকার জন্যেই, পৃথিবীব বেশীর ভাগ দেশেই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মুখ্যত সরকারই যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের দেশেও ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক, সরকারী ছাড়াও বে-সরকাবী বহু মিউজিয়ামকে অনুদান দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিলাতের Standing Commission on Museum & Art Gallery এবং অনান্য দেশেও অনুরূপ ধবনের অধিকাংশ বহু সংস্থাই মিউজিযামকে প্রত্যক্ষ শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করাব চেষ্টায় রত রয়েছেন। আমাদের দেশেও ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায়, Central Advisory Board of Museums মিউজিয়ামের মারফত শিক্ষাব কর্মসূচী প্রণয়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এ কথা ঠিক যে, মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত নয। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিলাতের Provincial Museum গুলি স্থানীয় Municipality এবং মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা যে একই সঙ্গে তাদের স্ব স্ব কার্যে ব্রতী রয়েছেন— এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী John L. Hobbs-এর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয।

তিনি লিখেছেন ঃ 'Libraries and Museums have always been closely linked, both administratively and in the public mind, and there are no signs that a divorce is iminent. The librarian and the museum curator should be the closet of the colleagues and in the sphere of local history at least there should be constant co-operation and consultation'.

সুতরাং আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কর্মীরা মিউজিয়াম সম্পর্কে যে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল এই গভীর বিশ্বাস নিয়ে একথা বলতে পারি মিউজিয়ামের দর্শক তার জীবন্ত অস্তিত্বকে ভুলে মৃতের রাজত্বে মৃতের মত ঘুরে বেড়ায় এই ধরনের উক্তি মিউজিয়াম সচেতনতার ক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এক হিসেবে আমাদের দেশে সংগ্রহশালার উপযোগিতা গ্রন্থাগারের চেয়ে বেশী।'

৩.৪.১৯৬৮



চ. পশ্চিমবাংলায় সংগ্রহশালা আন্দোলন

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয মিউজিওলজিব (সংগ্রহশালা বিজ্ঞান) 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স'। সেদিক থেকে সে সময়ে ভারতে মাত্র যে দুটি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংগ্রহশালা বিজ্ঞান পড়ানো হয়, তার মধ্যে একটি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যটি হল বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামের তদানীন্তন কিউরেটার অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন এই বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরিচালক। এখানে দু'বছরের কোর্স হিসাবে দশজন করে ছাত্র ভর্তির সুযোগ থাকে। ফলতঃ এই সংগ্রহশালা-বিজ্ঞান পাঠ্যধারা চালু হওয়ায় বিভিন্ন গ্রাম-শহরে প্রতিষ্ঠিত ছোট-বড় সংগ্রহশালার সংগঠক ও পরিচালকবৃন্দ তাদের সংগ্রহশালা যথাযথ সংগঠিত করার মানসে মূল্যবান পরামর্শের জন্য এই বিভাগের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন। অন্যদিকে, আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষে বাণগড় ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের ফলে সংগৃহীত বেশ কিছু পুরাবস্তু এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত পাথরের মূর্তিরাজি, ব্রোঞ্জ ও পিতলের মূর্তি, পটচিত্র, কাঁথা ও লোকশিল্পের উপকরণ হিসাবে হাল আমলের পোড়ামাটির নানান পুতুল প্রভৃতি দ্রব্য ঐ মিউজিয়মে প্রদর্শিত হওয়ায় সাধারণ দর্শকদের বেশ আগ্রহান্বিত করে তোলে এবং সেইসঙ্গে মিউজিয়াম চেতনা দানা বাঁধতে থাকে।

এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিকভাবে কোন কিছু পুরাবস্তুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়ায় স্থানীয় আগ্রহী মানুষজন সেগুলিকে সংগ্রহ করে অনুরূপ একটি সংগ্রহশালায় রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হন। সেজন্য সংগৃহীত সেসব বস্তুগুলির যথাযথ সংরক্ষণের জন্য আপাতত স্থানীয় কোন গ্রন্থাগারে বা কোন উৎসাহীর সদর ঘরে রক্ষিত হয়। পরবর্তী সময়ে সেইসব সংগৃহীত নিদর্শনগুলি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বা গ্রন্থাগারের শাখা হিসাবে কোন একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে শুধু সংগ্রহ নয়, সংগৃহীত বস্তুগুলির যথার্থভাবে নথিভুক্তকরণ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ইত্যাদির উপায় নির্ধারণের জন্য এইসব সংগ্রহশালা উদ্যোক্তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত মিউজিওলজি বিভাগের দ্বারস্থ হতে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাওড়া জেলার পাণিত্রাস গ্রামে (থানা বাগনান) প্রতিষ্ঠিত শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারের সে সময় কতিপয় উৎসাহী কর্মী বিগত ১৯৫৮ সাল নাগাদ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যে আঞ্চলিক পুরাবস্তুর সাময়িক প্রদর্শনী করেন, তা দেখে ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এই সব প্রদর্শনীর সংগ্রহ নিয়ে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের পরামর্শ দেন। সেইমত শরৎচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে পত্তন করা সেই ক্ষুদ্র সংগ্রহশালাটিকে যথার্থ রূপদানের জন্য সরকারী অনুদান লাভের প্রত্যাশায় তদানীন্তন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়-এর কাছে একটি 'ডেপুটেশান'ও দেওয়া হয় এবং সেই প্রাতিনিধ্যিকে কেন্দ্র

করে যে স্মারকলিপিটি প্রদত্ত হয়, সেটির রূপরেখা প্রণয়ন করেন ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, মিউজিয়ামে সংগৃহীত এইসব বস্তুর মাধ্যমে শ্রুতিদর্শনমূলক শিক্ষা সহযোগে দেশের আপামর জনসাধারণকে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করানোই একমাত্র উপায়। আলোচ্য সে রূপরেখাটির বয়ান নিম্নরূপ ঃ

"এক সময়ে বারোয়ারী তলার মণ্ডপ ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্র; এখানে গ্রাম-বৃদ্ধেরা সমবেত হতেন সায়াহ্নের প্রমোদে মুখরিত হত এই গৃহ। পূর্জাপার্বণে এখানে উৎসব হত, যাত্রা এবং কলকাতায় লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার আয়োজন হত এইখানে। ক্রমে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বারোয়ারী তলার সংস্কৃতি প্রবাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছে; পরিবর্ত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি কিছু পরিমাণে সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে গ্রন্থাগারের ব্যবহারিকতা আমাদের দেশে বর্তমানে যথেষ্টই সীমাবদ্ধ। ব্যাপক আক্ষরিক জ্ঞানের অভাবই এই সীমাবদ্ধতার মূল কারণ। এক্ষেত্রে কোন কিছুতে আকৃষ্ট করা এবং উৎসাহিত করার উপায় চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মন ও মর্মে প্রবেশ করার চেষ্টা করা, পাশ্চাত্য জগতে সুসংগঠিত ধর্ম এবং খ্রীস্টিয় ভজনালয়গুলি তাদের স্থাপত্য, মূর্তি, সঙ্গীত এবং চিত্র দিয়ে জনমনকে সন্নিবদ্ধ করে — তাহলেও সেখানে এখন বহু গ্রামীণ সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে গ্রামজীবনের কেন্দ্র রূপে। গ্রামের পুরাবস্তু, গ্রামের দর্শনীয় দ্রব্য, জীবজন্তু, পাখী, কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করে এই সব সংগ্রহশালার পত্তন হয়। তারপর আসে বড় বড় পোস্টার, চার্ট, ছবি, — গ্রামের বাইরে যে সমাজ, দেশ এবং জগৎ তার সঙ্গে পরিচয় সাধনের জন্য। দর্শন এবং শ্রুতি সহায়ক নানা বৈজ্ঞানিক উপকরণ [Audio-Visual aids] ব্যবহৃত হচ্ছে এই সব সংগ্রহশালাকে অবলম্বন করে; এই সব সংগ্রহশালার শ্রুতিদর্শন গৃহে [Projection and listening room] আয়োজিত হচ্ছে অভিনয়, লোকগীতি, লোকউৎসব, প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, সংগীত, রেকর্ড ও টেপ রেকর্ডের অনুষ্ঠান। ভিন্ন ভিন্ন উৎসব ছাড়া প্রত্যহের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে এই সংগ্রহশালাগুলি শ্রুতিদর্শন [audio-visual] শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যত সমাজের গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে এমনি সংগ্রহশালা গড়ে উঠবার সুযোগ কিন্তু আমাদের দেশে আরও অনেক বেশী। এই আমাদের বাংলা দেশে কত উৎসবের উপকরণ; লোক সংস্কৃতির ও লোকশিক্ষার কত সহজ প্রকরণ; গ্রামে গ্রামে পথ চলতে কত ধ্বংসস্তূপ, কত মূর্তি, কত কারুকর্ম, কত পুতুল, প্রতিমা, সরা, হাঁড়ি— আমাদের সমাজজীবনের সাক্ষ্য নিয়ে এখনও রয়েছে।

এই সব উপকরণ অতি সহজেই সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখলে যে সংগ্রহশালা গড়ে তোলা যায় — লোকশিক্ষার, বিশ্রাম ও শিক্ষামূলক প্রমোদের এবং গ্রামীণ মিলন কেন্দ্ররূপে দেশ ও সমাজকে সংগঠিত করে তোলার পক্ষে তেমন আর কোন কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করা যায় না। এই ধরনের সংগ্রহশালার প্রথম উপকরণ উৎসাহী ও সেবাব্রতী

কিছু কর্মী, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উন্নয়নকল্পে মানুষই মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

উপযুক্ত জিনিষ সংগ্রহ হলে তাকে সাজিয়ে রাখবাব জন্যে চাই ছোট ছোট কয়েকটি ঘর, বড় মূর্তি সংগ্রহশালার বারান্দাতেই রাখা চলতে পারে; ঘরের ভেতরে থাকবে পুঁথি, পাটা, পুরাণো মাটির, ধাতুর, পাথরের, কাঠের মূর্তি, পুতুল, সরা, কাঁথা ও পট — এমনি হামেশাই যা পাওয়া যায় গ্রামে গ্রামে। আরম্ভের মুখে দেওয়ালে তাকের মত তৈয়ারী করে সংগ্রহগুলি সাজিয়ে রাখা যাবে। দেওয়ালে রাখা চলবে পট, সরা, পুতুল আর কাঠের নক্সা আর মূর্তি, ছোট ছোট তাসের আকারের কাগজে পরিচয়-লিপি লিখে রাখতে হবে — যাদের অক্ষর পরিচয় আছে তাদের জন্যে। এই ঘরের মাঝেই আপাততঃ ছোট-খাট মিলনের ব্যবস্থা থাকবে — যাতে দু'দশজন লোক সমবেত হতে পারে এবং একটি কাঠের চৌকী নিয়ে বসবে অফিস, তাতে থাকবে ক'খানি খাতা; এতে লেখা থাকবে সংগৃহীত জিনিষগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ক্রমিক সংখ্যা, তাদের প্রাপ্তিস্থান ও উপকরণ। ক্রমে একটি অফিসঘর এবং সেই সঙ্গে ছোট গ্রন্থাগারের আয়োজন করতে হবে। আর আয়োজন করতে হবে একটি মাঝারি বড় ঘরের, যে ঘরে স্লাইড আর ফিল্মের ছবি দেখান চলবে, করা চলবে ছোট ছোট অভিনয়, সবাই বসে মজলিসী গান বা Tape recorder থেকে গান শুনতে, বক্তৃতা শুনতে পারবে। গ্রামের সবাইকে ডেকে সংগৃহীত জিনিষগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে; সেগুলির ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য। খুব সুদর্শন ভাল জিনিষ কিছু থাকলে তার ছবি তুলে গৃহস্থদের ঘরে রাখবার জন্যে দিতে হবে — যাতে সংগ্রহশালার সঙ্গে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গ্রামের কুমোর আর কামার, পোটো বা গাইয়ে যে কেউ থাকলে তাদের কাছ থেকে সুদর্শন মাটির পাত্র, পুতুল, পট সংগ্রহ করে নিতে হবে; তুলে নিতে হবে তাদের গান Tape record-এ; সংগ্রহশালায় এগুলি সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে এ গুলির বাইরে ভাল দামে বিক্রয় করা চলবে কিনা? এমনি ভাবে গ্রামীণ সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হতে পারে, চলতে পারে তার কাজ।"

গ্রামীণ সংগ্রহশালা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে রূপরেখাটির আদর্শ অনুসরণের জন্য অনেক মিউজিয়াম অনুরাগীরা সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। এ বিষয়ে ডঃ গাঙ্গুলী ছাড়াও ঐ বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক সন্তোষকুমার বসু অগ্রণী হয়ে এইসব মিউজিয়াম উদ্যোক্তাদের সংগৃহীত বস্তুর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তালিকা প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও কম ব্যয়ে সেগুলির যথাযথ প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠা সংগ্রহশালাগুলির কার্যধারা সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য একটি সংঘবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সাল নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় নানা স্থানের মিউজিয়ামগুলিকে নিয়ে একটি মিউজিয়াম সঙ্ঘ গড়ে তোলা হয়, যার নামকরণ করা হয়, 'মিউজিয়ামস্ এসোসিয়েসন. ওয়েস্ট বেঙ্গল'। উল্লেখ্য যে, এইটিই হল ভারতের প্রথম

আঞ্চলিক সংগ্রহশালা এসোসিয়েশন। পরবর্তী ১৯৬৬ সালে এই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলি নিয়ে একটি সচিত্র সংগ্রহশালা পরিচিতিমূলক বুলেটিন প্রকাশ কবা হয় (দ্রঃ Museums in West Bengal' in Bulletin of Museums Association, West Bengal, Jan. 1966) ঐ বিশেষ বুলেটিনটি ছাড়াও পবে বিভিন্ন সংগ্রহশালাবিদ্দেব রচিত প্রবন্ধাবলীসহ দু'তিনটি সংখ্যা বুলেটিনও যথারীতি প্রকাশ কবা হয়। দুঃখের কথা, ১৯৭৬ সালেব পব উৎসাহী কর্মীর অভাবে এই সংগঠনেব কাজে ভাঁটা পড়ে।

পরবর্তী ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দেব ৫ থেকে ১৭ নভেম্বর কলকাতাব বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিযামের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম মিউজিয়ম ক্যাম্প, যার মূল আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষায় মিউজিয়াম ও প্রদর্শন। ঐ ক্যাম্পের উদ্বোধনী ভাষণ দেন, ডঃ ত্রিগুনা সেন। এই ক্যাম্প উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি একটি সচিত্র বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করেন। (দ্রঃ Guruprasad Chakravarti and Santosh Kumar Bose eds. Bulletin of the West Bengal Headmasters Association, 1967. Published on the occasion of the Second International Campaign for Museums and Fifth Museum Camp on 'Education and Presentation, NOV. 5-7, Calcutta, 1967)। আলোচ্য এই বুলেটিনটিতে বিশিষ্ট সংগ্রহশালাবিদ্দের রচনা ছাড়াও পরিবেশিত হয়:

ক. Alphabetical List of Museums in India (Excepting West Bengal.),

খ. Museums in Calcutta & West Bengal,

গ. Alphabetical List of Zoological garden of India,

ঘ. Relevant Books on Museums & Museology।

পরবর্তী ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মিউজিয়ম সংক্রান্ত প্রচার অভিযান (১৯৬৭-৬৮) উপলক্ষে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করে, সেটিতে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির এক তালিকা সন্নিবিষ্ট হয় (দ্রঃ 'গ্রন্থাগার', খণ্ড ১৭, সংখ্যা ১০, ১৯৬৮)।

ভারত সরকারের তদানীন্তন মিনিস্ট্রি অফ সাইন্টিফিক রিসার্চ ও কালচার‍্যাল এফেয়ার্সের পক্ষ থেকে ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে সি. শিবরামমূর্তি সম্পাদিত যে মিউজিয়াম ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে সেটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ।

ঐ বৎসরই ১৯৬৮ সালে আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মিউজিয়ম তত্ত্ব সম্পর্কিত যে গ্রন্থটি রচনা করেন সেটির শিরনাম হল, 'Studies in Museum and Museology in India.

পরবর্তী ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর প্রকাশনায় 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংগ্রহশালা সম্পর্কিত 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চিন্তা ও বাংলার সংগ্রহশালা' শীর্ষক প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশ করেন তারাপদ সাঁতরা।

বিগত ১৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে, চাকরি কেন্দ্রিক বৃত্তিগত শিক্ষাধারাকে কিভাবে মিউজিয়াম বিজ্ঞানতত্ত্বের অঙ্গীভূত করা যায় সে বিষয়ে অনুসন্ধানেব জন্য স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের পক্ষে তদানীন্তন সদস্য পি.সি.ভি. মল্লিকের উদ্যোগে যে টাস্ক ফোর্স/স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়, সেটির সভ্য হিসাবে বর্তমান এই গ্রন্থের লেখক তাবাপদ সাঁতরাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটির পক্ষে অতঃপর এ বিষয়ে পশ্চিমবাংলাব বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও সংগ্রহশালাবিদ্দের প্রতিবেদন ও পরামর্শ অনুযায়ী যে সুপাবিশপত্রটি প্রস্তুত কবা হয় সেটির শিরনাম হয়, 'Employment-Oriented Vocational Training in Museology in the State of West Bengal'। উল্লেখ্য যে, এটি যথাবীতি পঞ্চম পরিকল্পনাব অর্ন্তভুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হয় (উক্ত সুপারিশপত্রের নকল এই প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত হল)।

পরবর্তী ১৯৭৫ সালের ৪ঠা থেকে ৫ই ডিসেম্বব International Council of Museums-এর পক্ষে অনুষ্ঠিত 'Museums and Cultural and Scientific Exchange for South and South East Asia' বিষয়ক এক আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ এ রাজ্যের যাবতীয় সংগ্রহশালাগুলির উল্লেখে একটি সচিত্র গাইড বুক' প্রকাশ করেন, যার শিরনাম, 'Museums : West Bengal'।

১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার তমলুকে স্থাপিত তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষে সারা বাংলা গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সংগ্রহশালাসমূহের প্রতিনিধিদের সমাবেশে যে আলোচনা চক্রটি অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে উক্ত সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলির প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি মিউজিয়াম-নির্দেশক সুবৃহৎ তালিকা।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ক্রমেই পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ছোটখাটো বহু গ্রামীণ সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। তবে সে সব সংগ্রহশালাগুলির সংগ্রহটাই ছিল ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত এবং সেগুলিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনযোগ্য করে তোলার তেমন চেষ্টা হয়নি। এক তো প্রদর্শন গৃহের অভাব, তদুপরি প্রদর্শনের যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জামের অপ্রতুলতাই এর কারণ। তাছাড়া যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকলেও আর্থিক অসুবিধের কারণে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেজন্য এমন অনেক সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালা সরকারী আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হওয়ায়, তাদের কর্মকাণ্ড মাঝপথেই থেমে গেছে—তেমন প্রসারলাভ করতে পারে নি। উপরন্তু পুরাতত্ত্ব ও লোকশিল্পমূলক ছোট বা বড় সংগ্রহশালা পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হলেও, কৃষিজ, বনজ, হস্তশিল্প ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ বিষয়গুলি নিয়ে তেমন কোন সংগ্রহশালা গড়ে ওঠেনি।

সর্বোপরি অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ক্ষুদ্র সংগ্রহশালার উদ্যোক্তারা মিউজিয়াম-এর উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা অনুযায়ী সংগ্রহশালাকে কিভাবে শ্রুতিদর্শনমূলক সাহায্যের মাধ্যমে জনশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায় সেদিকে দৃষ্টিপাতের বদলে তাঁরা সংগ্রহের সংখ্যা বাড়াবার দিকেই নজর দেন বেশী করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ গবেষণার প্রয়োজনে তাদের সংগৃহীত দ্রব্যের আলোকচিত্র প্রদানে যথেষ্ট কার্পণ্য কবে থাকেন। সব

মিলিয়ে সেজন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র ও কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে সংগ্রহশালা চেতনা তেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়ায় শেষ অবধি এইসব সংগ্রহশালাকে সাধারণ মানুষ চিহ্নিত করে শিক্ষিত মানুষদের আখড়া হিসাবে— যা একান্তই দুঃখের।

তবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগ্রহীদের প্রচেষ্টায় বহু ক্ষুদ্র সংগ্রহশালা যে গড়ে উঠেছে এটা একটা সুলক্ষণ বলে ধরা যায়। আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সঙ্গে অতিরিক্ত মিউজিয়াম অধিকারের দায়িত্ব সংযুক্ত করে দেওয়ায় বর্তমান প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম অধিকার এমন বহু ক্ষুদ্র সংগ্রহশালাকে প্রতিবৎসর আর্থিক অনুদান মঞ্জুব করে থাকেন। এছাড়া মিউজিয়ামে সংগৃহীত দ্রব্য সংরক্ষণের বিষয়ে এই অধিকারের পক্ষে এইসব গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র সংগ্রহশালার কর্মীদের নিয়ে সপ্তাহব্যাপী এক ট্রেনিং কোর্সে যথাযথ হাতে কলমে শিক্ষাদানের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালা অধিকার জেলায় জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মূলতঃ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই এইসব জেলা সংগ্রহশালাগুলিকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে রাজ্যসরকারের কাছে এই অধিকারের পক্ষে মালদহ, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই চারটি জেলায় জেলা সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা রয়েছে এবং এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে সংগ্রহশালাব পরিকাঠামো অর্থাৎ ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রার্থনা করে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ সংগ্রহশালাগুলি কিভাবে আরও শ্রীবৃদ্ধিব পথে অগ্রসর হয় তাই এখন লক্ষ্য করার বিষয়।

স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড-এর মিউজিয়াম কেন্দ্রিক বৃত্তিগত শিক্ষাধারা সম্পর্কিত সুপারিশ পত্র ঃ

EMPLOYMENT-ORIENTED VOCATIONAL TRAINING IN MUSEOLOGY IN THE STATE OF WEST BENGAL.

PREAMBLE :

The introduction of suitable museological training with vocational orientation required a survey of the museums and similar institutions in the State of West Bengal the State Planning Board conducted a Survey of Museums in West Bengal. In this survey special stress was laid on the question of employment of museum-trained people —employment potential of museums, their nature and resources and the requirements of schools and colleges in relation to the educational resources of existing museums. In addition to this, opinions and comments of experts and relevant departments were solicited, received and considered.

The above-mentioned survey reveals that barring a few larger museums in the Calcutta Metropolitan area, the majority of museums in West Bengal are suffering from a lack of funds for equipment, educational services and employment of wholetime technical staff. The number of vacant posts, posts proposed etc. in these institutions are not discouraging. The resources of West Bengal museums and museum-like institutions are quite rich and varied. But the basic requirements for the introduction of a vocational course is at present singularly lacking and the suggestions below are made to lay the basis of vocational training in museology in the state. The museologically trained staff are good for employment as curatorial staff of museums, guides to museum, sites and mounments, preservation and conservation staff for museums and libraries and archives, demonstrators, guides and audio-visual staff in museums, zoological gardens, herbarium staff, taxidermists, educational and teaching staff for museum training exhibition and display personnel and guides in reserve forests, national parks and tourist centres and publicity wings of public and private undertakings should be noted with due emphasis.

In view of the above findings the following recommendations are made for fostering vocational training in Museology in the State of West Bengal.

1. ADVISORY BOARD OF MUSEUMS :

That the authorities of the State of West Bengal should establish without delay an Advisory Board of Museums and Museological Training with representatives of educational authorities, museums and the existing academic departments engaged in the training of Museology, departments of Tourism, Public Works, Forest, etc. In this connection, the word 'Museum' is used in the meaning of the well known definition of the word as enunciated and popularised by the International Council of Museums—UNESCO. The word 'Museum' is used here to cover all kinds of collections of historical importance, natural objects, botanical & zoological specimens, scientific and technical objects, rare books & manuscripts collections of live specimens like zoos, aquaria, botanical gardens and herbaria etc. This Advisory Board requires to be empowered to recommend grants-in-aid for recurring and developmental grants to museums and centres of museological training and to advise the Government of West Bengal in matters relating to museums. To start with the sum of Rs. 10 lakhs may be provided for the Fifth Plan period to meet expenditure for museum development and towards the development of vocational training in museology, i.e.Rs. 2 lakhs per year. As there is a serious want of standard texts on Museology the Advisory Board should

allot a specified money for museological publication in the language of the State.

2. <u>MUSEOLOGY IN TEACHER'S TRAINING COURSES :</u>

That the Education Department and the relevant University Authorities should be approached to include 'Educational Use of Museums' as a topic of study in teacher's training or education courses in general paper I (General Principles of Education) In addition to this museology and museum techniques in education should be made the subject of study of a full elective paper of 100 marks. This programme could be implemented in two selected training colleges of the State. It would directly stimulate the development of a greater museum-consciousness among teachers of this State

3. <u>PRACTICAL TRAINING & STIPENDS FOR ADVANCED STUDENTS OF MUSEOLOCY :</u>

That an arrangement should be made for offering practical training for all students who have obtained and completed the Post-graduate Diploma Course in Museology or the recently introduced M.A./M.Sc Degrees in Museology from the University of Calcutta, at the rate of Rs. 250/- per mensen per student for one year in the leading Museums of West Bengal.

4. <u>MUSEOLOGY AS AN ELECTIVE SUBJECT IN B.A./B.SC COURSES :</u>

That arrangements for inclusion of Museology as an elective subject in B.A. and B.Sc courses in this State should be undertaken without delay. At the initial stages undergraduate students of this subject could be placed under the Department of Museology, University of Calcutta for classes and practical assignments. At least one college in Metropolitan Calcutta should be selected for introducing museology as one of the elective subjects of 'pass' level. This would create the basic atmosphere for the study and popularity of this new subject and would facilitate selection for the post-graduate course in Museology.

5. <u>TRAINING FOR STUDENTS FROM EXISTING MUSEUMS :</u>

Many of the existing museums require well-trained and whole-time staff. But as full-scale training would take time to be properly organised, immediate steps should be taken so that at least 6 trainees are sent by rural or outlying museums with an educational standard of school final or higher-secondary levels and/or higher attainments to be trained for 6

months in a scheme of training prepared and conducted by the Advisory Board with the Department or Museology and other relevant institutions. For this a suitable grant should be made for expenditure in training equipment, services and token stipends to the students, the quantum of such grant being determined by the Board.

6. UNIT FOR EDUCATION IN MUSEUMS & SCHOOLS :

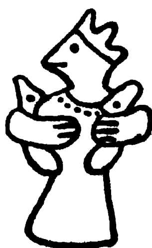
The existing museums and educational institutions suffer from lack of personnel and transport facilities necessary for running fruitful educational programmes. To counteract this situation the Education Department of the State should appoint a central team of staff for guiding students to museums, sites and monuments and for arranging for transport to carry the students and visual aids for class room teaching and demonstration to from museums and educational institutions. The scope of work at the District Inspectorate of Education level should be properly investigated in this regard.

7. NEED FOR RECRUITMENT OF TRAINED STAFF ONLY :

The education and employment authorities of this State should be kept properly informed of their requirements by employers and it must be ensured that only trained staff is recruited in Museums and similar institutions in this State.

8. SUMMARY OF MUSEUMS SURVEY SHOULD BE INCLUDED IN THE REPORT AS A GUIDELINE FOR FUTURE :

That the above observations with necessary details be communicated to relevant authorities and Departments along with a summary of the Survey of Museums in West Bengal etc., for undertaking ecessary action for creating an employment or study and teaching of museology in the State of West Bengal.



ছ. পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে এ রাজ্যের সংগ্রহশালাগুলিও যে এক উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পেরেছে, তা বলাই বাহুল্য। তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আদিতে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় যে মিউজিয়াম স্থাপনের সূত্রপাত ঘটেছিল তারই পূর্ণাঙ্গরূপ গ্রহণ করে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' প্রতিষ্ঠায়। সেদিন এই সব প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে যে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাই আজ শুধু পশ্চিমবাংলা কেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক কালের মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছে। কলকাতায় সেদিনের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ভারতের এক বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ জাতীয় সংগ্রহশালায় পরিণত হবার গৌরব অর্জন করেছে। সুতরাং এর প্রভাবে শুধু পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে যেসব সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তার এক পরিসংখ্যান করলে দেখা যায়, বৃহত্তর কলকাতায় বিভিন্ন বিষযক মিউজিয়াম আছে ৩৩টি এবং রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাম-শহরে আছে ১৯টি। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য বিভাগীয় সংগ্রহশালা আছে আরও প্রায় ২৫টি। সুতরাং দর্শনীয় স্থান হিসেবে পশ্চিমবাংলায় সংগ্রহশালার অবদান একান্তই উল্লেখযোগ্য।

তবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। ২৭. জওহরলাল নেহেরু রোডে অবস্থিত এই সংগ্রহশালার কলা, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং শিল্প বিষয়ক বিভাগগুলিতে প্রদর্শিত অসংখ্য নিদর্শন যে দর্শকদের কাছে এক আশ্চর্য যাদুঘরে পরিণত হয় তা দশনার্থীদের ক্রমাগত ভীড় দেখলেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। সোমবার ও সরকারী ছুটির দিন ছাড়া ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এই মিউজিয়াম খোলা থাকে।

শুধু ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম নয়, এই রাজ্যের কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় আরও যে সব ছোট বড় সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে সেগুলির আকর্ষণও দর্শকদের কাছে কম নয়। এ বিষয়ে কলকাতার জনপ্রিয় সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম'-এর কথা। ১৯এ, গুরুসদয় রোডে অবস্থিত ভারত সরকারের অধীন এ সংগ্রহশালাটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার আবেদন শুধু সাধারণ দর্শকদের কাছেই নয়, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও সমানভাবে আদৃত হয়েছে। বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক নানান যন্ত্রপাতি ও আসল সামগ্রী সংগ্রহ করে সেগুলির উপকারিতা ও কার্যপদ্ধতি দর্শকদের কাছে মডেল, চার্ট ও ডায়রামা সহযোগে যেভাবে নাটকীয় ও চিত্তাকর্ষক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে — তা অতুলনীয়। প্রতি সোমবার ও কয়েকটি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন এই মিউজিয়ামটি সকাল ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিজ্ঞান বিষয়ক মিউজিয়ামের প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে আর একটি দর্শনীয় বিজ্ঞান মিউজিয়াম হল, বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট পরিচালিত 'বিড়লা প্লানেটোরিয়াম'। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ সম্পর্কিত সাধারণের জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ই এই তারামণ্ডলের নির্দিষ্ট প্রদর্শনের মধ্যে জানা যায়। বলা যেতে পারে এটি কলকাতার এক সম্পদ। ৯৬, জওহরলাল নেহেরু রোডে অবস্থিত এই তারামণ্ডল সাধারণতঃ বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা সহযোগে প্রতিদিনই প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

কলকাতায় নবতম সংযোজন হিসাবে আর একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা হ'ল সায়েন্স সিটি (জে বি এস হলডেন এ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০৪৬), যেখানে সংগঠিত হয়েছে মহাকাশ যাত্রা থেকে অতীত কালের বিবর্ধনশীল জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে সচল এক অভিনব প্রদর্শনী। রবিবার ও ছুটির দিন সহ প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

শিশু ও কিশোরদের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় আর একটি সংগ্রহশালা, 'নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম।' ৯৪।১, চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত এই সংগ্রহশালাটি সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

এখানকার উল্লেখ্য প্রদর্শবস্তু হল, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে প্রস্তুত চিত্র-বিচিত্রিত পুতুলের সমারোহ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পোষাক পরিহিত পুতুলের এক সংগ্রহ— যা শিশুদের কাছে পরম আকর্ষণীয়।

কলকাতার আপামর জনসাধারণের কাছে একান্ত দর্শনীয় আর একটি প্রদর্শশালা হল 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম'। ময়দানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ২, কুইনস্‌ওয়ের এক সুরম্য পরিবেশে অবস্থিত এই স্মৃতিসৌধের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে বিদেশী শিল্পীদের আঁকা বিভিন্ন বিষয়ক তৈলচিত্র, ব্রিটিশ শাসনকালীন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, সেকালের রাজন্যবর্গের ব্যবহৃত মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি। সেদিক থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হ'ল মূলত আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ক সংগ্রহশালা। তবে দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই সংগ্রহশালার যে গুরুত্ব সাধারণ মানুষকে কাছে তা উপেক্ষিত। বরং আগ্রায় তাজমহলের মতই মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিবিজড়িত এই বিশাল মার্বেল পাথরে নির্মিত স্থাপত্য-সৌধটি গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষের কাছে রোমাঞ্চ ও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আজও টিকে রয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতই সমপর্যায়ের প্রদর্শবস্তু দেখতে পাওয়া যাবে, ৪৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের 'মার্বেল প্যালেস গ্যালারী অ্যান্ড জু গার্ডেন'-এ। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাটি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানকার সংগ্রহবস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইউরোপীয় চিত্রকলা, মূর্তি-ভাস্কর্য ও সমসাময়িক নানাবিধ শিল্পসম্ভার। এছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত একটি পশুশালাও অন্যতম আকর্ষণ।

কলকাতায় চিত্রশালা পর্যায়ে আর এক প্রতিষ্ঠান হল 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'। এটিও ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের পূর্বদিকে ক্যাথিড্রেল রোডে অবস্থিত। এখানে সমসাময়িক

চিত্রকলা ও নানাবিধ শিল্পের নিদর্শন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত কিছু জিনিস ও চিঠিপত্র এখানকার প্রধান আকর্ষণ। এটিও প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

কলকাতায় এরই সমগোত্রীয় আর এক প্রদর্শশালা হল, ১০৮/৯ সাদার্ন এভেনিউ-এ অবস্থিত 'বিড়লা একাডেমী অফ আর্ট এণ্ড কালচার মিউজিয়াম'— যেখানে বিশেষ করে মধ্যযুগ ও সমসাময়িক কালের বহু চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়েছে। সোমবার বাদে প্রতিদিন ৪টে থেকে ৮টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে।

শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক মিউজিয়মের সংখ্যাও কলকাতাতে কম নয়। এই ধরনের সংগ্রহশালার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত 'আশুতোষ মিউজিয়াম'-এর নাম। ভারত তথা বঙ্গ সংস্কৃতির নানান উপাদানে পূর্ণ যেন এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার এই সংগ্রহশালাটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য এবং তখনকার কালের মিউজিয়ম আন্দোলনের পথিকৃৎ স্যার আশুতোষের নামে এই সংগ্রহশালার নামকরণ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সংগ্রহশালা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, " .... The museum may be regarded, first as an adjunct to the class room and the lecture room, secondly, as a bureau of information and thirdly, as an institution for the culture of the people"। আলোচ্য এ মিউজিয়ামের সংগ্রহ হল, প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন, পোড়ামাটির মূর্তিকা ও ফলক, পাথর, ব্রোঞ্জ ও কাঠের মূর্তি। এছাড়া সংগ্রহের মধ্যে আছে আর এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ বাংলার লোকশিল্পের নিদর্শন, পুতুল, প্রতিমা, পটচিত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং বৈচিত্র্যময় শাড়ি ও কাঁথা প্রভৃতি। বঙ্গ সংস্কৃতিকে চিনতে হলে, জানতে হলে এখানে অতি অবশ্যই আসতে হবে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে।

ঠিক একই পর্যায়ের আর এক সংগ্রহশালা হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহশালা। এখানে সংগৃহীত বস্তুর সমাবেশে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষের ব্যবহৃত নানাবিধ পাথরের হাতিয়ার, অজয় নদের অববাহিকায় পাণ্ডুব গ্রামে খননকাজের ফলে প্রাপ্ত প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেকার নানাবিধ মৃৎভাণ্ড, শীলমোহর ও পোড়ামাটির মূর্তিকা এবং মৌর্য শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের নানাবিধ নিদর্শন। এছাড়াও রয়েছে পাল-সেন আমলের নানাবিধ প্রস্তর-ভাস্কর্য, মন্দির-টেরাকোটা ফলক, কাঠের কাজ, চিত্রিত পুঁথির পাটা, মুর্শিদাবাদেব হাতির দাঁতের কাজ ও বিভিন্ন বিষয়ক পটচিত্র প্রভৃতি। একদা ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে অবস্থিত এ সংগ্রহশালাটি সম্প্রতি বেহালায় বীরেন রায় রোডের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কলকাতায় এই ধরনের আরও একটি সংগ্রহশালা হল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত চিত্রশালা। ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে সাহিত্য পরিষদ ভবনে অবস্থিত এই চিত্রশালায় দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, পুস্তক ও হাতে লেখা পুঁথির মূল্যবান সংগ্রহ ছাড়াও এখানে আরও যেসব বস্তু প্রদর্শিত হয়েছে— তার মধ্যে আছে, বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু দেবদেবীর

পাথরের ও ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্তি, পোড়ামাটির নানাবিধ ফলক, পাল-সেন আমলের তাম্রশাসন, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, চিত্রিত পুঁথির পাটা, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি ও বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি এবং সমসাময়িক কালের হিসেব-পত্র ও দলিল দস্তাবেজ। মূলতঃ পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত এইসব মূল্যবান বস্তু-সম্পদ বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় যে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

তবে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে লোকশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা হল, কলকাতার উপকণ্ঠে ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী গ্রামে অবস্থিত 'গুরুসদয় মিউজিয়াম'। বাস্তবিক পক্ষে সেকালের গ্রাম-বাংলার জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে গেলে এ সংগ্রহশালা অতি অবশ্যই দেখতে হবে। প্রতি বৃহস্পতিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ছাড়া ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এই মিউজিয়াম খোলা থাকে। ব্রতচারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ সংগ্রহশালায় রয়েছে প্রায় দু'হাজার দ্রব্যের এক সংগ্রহ— যার এক বড়ো আকর্ষণ হল, চিত্র-বিচিত্রিত নকশী কাঁথা, জড়ানো পট, চৌকো পট ও কালীঘাটের পট। এছাড়াও নানান জেলার খেলনা-পুতুল, চন্দ্রপুলি ও আমসত্বের ছাঁচ, পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য, কাঠখোদাইয়ের কাজ ও মন্দির-টেরাকোটার সংগ্রহ এই মিউজিয়মের এক সম্পদ। একক প্রচেষ্টায় সংগৃহীত গ্রাম-বাংলার লোকশিল্প সংগ্রহের এই মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার দেখে প্রমাণ হয় সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত ছিলেন সত্যিই বঙ্গ সংস্কৃতির এক সার্থক জহুরী।

কলকাতায় ৪৫, গণেশচন্দ্র এভেনিউ-এর তিনতলায় এই পর্যায়ের আরও যে একটি সংগ্রহশালা আছে সেটার নাম 'গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল মিউজিয়াম।' সাধারণ মানুষের মধ্যে শিল্পাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এ মিউজিয়ামে সংগৃহীত হয়েছে — যন্ত্রপাতি, খেলনা-পুতুল, হস্তশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের নির্দশন ও নানাবিধ বাণিজ্যিক পণ্যের নমুনা। মূলত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রশিল্প ও হস্তশিল্পের ঐতিহ্য ও বর্তমান অগ্রগতির বিবরণ এখানে এলে যেমনটি জানতে পারা যায়— এমন আর কোথাও নেই। সংগ্রহশালাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যকালীন সময় অনুযায়ী খোলা থাকে।

কলকাতায় উল্লিখিত শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে অখিল ভারত হস্তশিল্প পর্যদের অধীন, ৯-১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে আঞ্চলিক নকশা ও কারিগরী উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত আরও একটি সংগ্রহশালা আছে— যেটি পূর্বে আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির প্রদর্শশালা হিসাবে পরিচিত ছিল। এখানেও নকশী কাঁথা, বালুচরী শাড়ি, পট, পুতুল, মুখোশ, হাতির দাঁতের দ্রব্য, অলঙ্কার ও ধাতু নির্মিত মূর্তির এক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে।

লোকশিল্পের নানান নিদর্শন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালে ১, সত্যেন রায় রোডে স্থাপন করা হয়েছে রাজ্য লোকসংস্কৃতি সংগ্রহশালা।

সম্প্রতি বঙ্গসংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে কলকাতার গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে একটি সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে নকশী-কাঁথা, মন্দির গাত্রে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক, কাঠের কাজ,

নানাবিধ জড়ানো পট ও ব্রোঞ্জ নির্মিত দ্রব্যাদি।

কলকাতায় উল্লিখিত বিষয়ের সংগ্রহশালাগুলি ছাড়াও বিখ্যাত মনীষীদের জীবনসাধনা সম্পর্কিত যেসব প্রদর্শশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত 'রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়াম'। এখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট সন্তানদের ব্যবহৃত দ্রব্য, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও চিত্রাবলী যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি সেই সঙ্গে দেখা যাবে রবীন্দ্রানুগ চিত্রকলারও এক প্রদর্শনী। ছুটির দিন বাদে এ মিউজিয়ম সোমবার থেকে শুক্রবার ১০ টা থেকে ৫ টা এবং শনিবার ১০ টা থেকে ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে।

কলকাতার এই পর্যায়ের দ্বিতীয় সংগ্রহশালাটি হল, ৩৮/২, লালা লাজপত রায় সরণিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটায় অবস্থিত 'নেতাজী মিউজিয়াম' — যেখানে এলে দেখা যাবে নেতাজী সম্পর্কিত নানা দ্রষ্টব্য বস্তু, তাঁর লেখা চিঠি-পত্রাদি ও অন্যান্য নথিপত্র।

ঠিক কলকাতা না হলেও কাছাকাছি ২৪ পরগণা জেলার এলাকাধীন বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে এই পর্যায়ের আরও যে দুটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হল, ব্যারাকপুরে ১৪, রিভার সাইড রোডে অবস্থিত 'গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়', যেখানে গান্ধীজীর লেখা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেরিত বিভিন্ন চিঠিপত্র ও তাঁর জীবনী বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। অপরটি হল, নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের একাংশে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত 'ঋষি বঙ্কিম রিসার্চ সেন্টার অ্যান্ড মিউজিয়াম'— যেখানে প্রদর্শিত বস্তুর মধ্যে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্র প্রভৃতি।

সম্প্রতি কলকাতায় আর একটি ভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালার উদ্বোধন হয়েছে, যা হল ডাক বিভাগের অধীন 'ফিলাটেলিক মিউজিয়ম'। জি. পি. ও-র লাগোয়া কয়লাঘাট স্ট্রীটে অবস্থিত এ মিউজিয়ামটি যে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি মানিকতলায় ডি.সি. নর্থের অফিস চৌহদ্দির মধ্যে স্থাপিত হয়েছে পুলিশ মিউজিয়াম, যেখানে প্রদর্শিত হয়েছে অগ্নিযুগের বহু স্মারক, বিপ্লবীদের লেখা গোপন নির্দেশের চিঠি, বোমা ও পিস্তল প্রভৃতি।

এতসব আলোচিত মিউজিয়াম ছাড়াও কলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ, ঐতিহাসিক নথিপত্র ও প্রাচীন পুস্তক-পত্রিকা সংক্রান্ত যে কটি মিউজিয়ম আছে, তার মধ্যে বেলভেডিয়ারে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার, ১ পার্ক স্ট্রিটস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ৬ ভবানী দত্ত লেন-এ অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্টেট্ আর্কাইভস্' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জাহাজ শিল্প ও বন্দর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 'পোর্ট ম্যানেজমেন্ট মিউজিয়ম' (৪০, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, কলিকাতা- ৪৩), পাট শিল্প সংক্রান্ত জুট মিউজিয়ম (১২, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কিত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার মিউজিয়াম (লেক টাউন, পাতিপুকুর, কলিকাতা-৫৫) প্রভৃতি

প্রদর্শশালাগুলিও কলকাতার আকর্ষণের তালিকায় উল্লেখিত হতে পারে।

সম্প্রতি পর্ণশ্রী পল্লীতে স্থাপিত হয়েছে ভুবন মিউজিয়ম অ্যান্ড আর্ট গ্যালারী (পি ৫১২/৩ পর্ণশ্রী পল্লী), যেখানে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত নানাবিধ পুরাবস্তু।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালচার‍্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে ১৯৫৫ সালে স্থাপন করা হয়েছে এথনোগ্রাফিক মিউজিয়ম যা কাঁকুড়গাছিতে অবস্থিত।

এতক্ষণ কলকাতার মিউজিয়াম নিয়ে আলোচনা করা হল। এবার কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেসব সংগ্রহশালা আছে, সংখ্যায় সেগুলিও নেহাত কম নয়। সরকারি সাহায্যপুষ্ট না হয়েও প্রতিটি জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে আমাদের অতীত সম্পদ রক্ষার জন্য যেসব দেশব্রতী সচেষ্ট হয়েছেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা বেসরকারিভাবে অথবা গ্রন্থাগারগৃহে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠাব উদ্যোগ দেখতে পাই।

এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় হাওড়া জেলার কথা। এখানের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা হল 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা'। কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ কি. মি. দূরবর্তী বাগনানের অদূরে ৬, জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত এই গ্রামীণ সংগ্রহশালায় সুন্দর এক প্রদর্শনসজ্জার মধ্যে একদিকে যেমন প্রদর্শিত হয়েছে অতি প্রাচীনকালের মৃৎপাত্র ও মৃৎফলক, মন্দিরে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক, কষ্টি পাথরের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, তেমনি অন্যদিকে প্রদর্শিত হয়েছে লোকশিল্পের নিদর্শন— পুতুল, পট, পুঁথিব পাটা, মুখোস, সন্দেশ ও চন্দ্রপুলির ছাঁচ এবং কাঠখোদাইয়ের নানাবিধ কাজ। বাস্তবিক পক্ষে শহব থেকে দূরে এক নয়নাভিরাম পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই কীর্তিশালার প্রদর্শন কক্ষে এসে দাঁড়ালে মনে হবে এটি যেন পুরানো বাংলার এক জীবন্ত সমাজচিত্র।

হাওড়া জেলার পাশাপাশি হুগলি জেলার সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জাঙ্গীপাড়া থানার এলাকাধীন রাজবলহাট গ্রামের অমূল্য প্রত্নশালা। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্মৃতিরক্ষার্থে এই মিউজিয়ামটি সংগঠিত হয়েছে। পূর্ব রেলপথের তারকেশ্বরগামী ট্রেনে হরিপাল স্টেশনে নেমে বাসে আঁটপুরে হয়ে এখানে আসা যায়। এখানে যেসব সংগ্রহ হয়েছে তার মধ্যে আছে, তিনশোর বেশি প্রাচীন মুদ্রা, পাল-সেন আমলের মূর্তি-ভাস্কর্য, লিপিফলক ও কাঠখোদাইয়ের অপূর্ব নিদর্শন।

এ জেলার চন্দননগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্ট গ্যালারী ইনস্টিটিউট ডি চন্দননগর'। একদা ফরাসী অধিকৃত এই শহরের সংগ্রহশালাটিতে রয়েছে বহু ফরাসী দলিল দস্তাবেজ, স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দোলন সম্পর্কিত মূল্যবান কাগজপত্র প্রভৃতি।

এ জেলার শ্রীরামপুরে, শ্রীরামপুর কলেজে স্থাপিত হয়েছে 'কেরী সংগ্রহশালা'— যেখানে প্রদর্শিত হয়েছে, মহাত্মা কেরীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, শ্রীরামপুর মিশনারীদের চিঠিপত্রাদি, হিসাবের খাতা এবং ভারতে প্রকাশিত অতি দুষ্পাপ্য পুস্তকসমূহ। বলতে গেলে বাংলার মিশনারী সম্প্রদায়ের কার্যাবলীর অতীত ইতিহাস যেন এই সংগ্রহশালায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

হুগলি জেলার শেওড়াফুলিতে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সংগ্রহশালা 'সাবদাচরণ মিউজিয়াম' এ এলেও দেখা যাবে বেশ কিছু প্রাচীন পাথরের মূর্তি, টেরাকোটা-ফলক ও মুদ্রা।

মেদিনীপুর জেলায় যে কটি উল্লেখযোগ্য মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় তমলুক শহরে স্থাপিত 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র'। প্রাচীন বন্দর নগরী তাম্রলিপ্তকে কেন্দ্র করে একদা যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল, সেই কালেরই স্মারকচিহ্ন হিসাবে যে সব প্রত্নবস্তু স্থানীয় উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে তাই এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এইসব প্রদর্শবস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কালের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের পোড়ামাটির মৃৎ ফলক ও মৃৎভাণ্ড, মুদ্রা ও প্রস্তর মূর্তি প্রভৃতি। বর্তমানে তমলুক পৌরসভা ভবনের কক্ষে এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত।

জেলার সদরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা রয়েছে, যেখানে পাল-সেন আমলের বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তি, মুদ্রা, তাম্রশাসন এবং বহু বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় আরও যেসব সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দির (ধারাল, পোঃ শিশু সদন, থানা : রামনগর), পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ সংগ্রহশালা (বাসুদেবপুর, দাসপুর), বিজন- পঞ্চানন সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র (ইন্দা, খড়্গপুর), রাঢ় সংস্কৃতি সংগ্রহশালা (বিদিশা, নারায়ণগড়), কংসাবতী শিলাবতী উপত্যকা সংগ্রহশালা (চন্দ্রকোণা) এবং কোলাঘাট লোকসংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা (কোলাঘাট) প্রভৃতি।

মেদিনীপুরের পর বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত সংগ্রহশালা হল, বিষ্ণুপুরের 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'। এই প্রদর্শশালায় সংগৃহীত হয়েছে রাঢ় বঙ্গের তথা মল্লভূমির প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির অমূল্য সম্ভার। এ সংগ্রহশালায় কর্মীরা গ্রাম ঘুরে সংগ্রহ করেছেন বাঁকুড়া জেলার বহু পুরাবস্তু ও লোকশিল্পের নিদর্শন। মল্লভূমির কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের এই কৃষ্টি সম্পদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে গেলে বিষ্ণুপুরের এই সংগ্রহশালাটি পরিদর্শন করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য।

বাঁকুড়া জেলার পরেই নাম করা যেতে পারে পুরুলিয়া জেলার। পুরুলিয়া শহরের হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে অবস্থিত জেলা সংগ্রহশালাটিতে দেখা যাবে নানাবিধ প্রস্তর ভাস্কর্য, প্রাচীন মুদ্রা, ও পুঁথিপত্রের সংগ্রহ। এছাড়া শহর থেকে প্রায় দু'মাইল পুবে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠেও পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু প্রস্তর মূর্তি ও টেরাকোটা-ভাস্কর্যের নিদর্শন নিয়ে এক সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার পাশাপাশি বর্ধমান জেলায় সংগ্রহশালা বলতে কেবলমাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথি'র উল্লেখ করতে হয়। এখানেও প্রদর্শিত হয়েছে বহু প্রাচীন মূর্তি, মন্দির-টেরাকোটা, কাঠের কাজ, মুদ্রা, পুরাতন পুঁথি ও দলিল-দস্তাবেজ এবং লোকশিল্পের নানাবিধ নিদর্শন। সংগ্রহশালার মূল্যবান

এই সব সংগ্রহ নিয়ে অদূরে ভবিষ্যতে এটি যে এক জীবন্ত জ্ঞানপীঠ হিসাবে গড়ে উঠবে— সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বর্ধমানের লাগোয়া জেলা বীরভূমের শান্তিনিকেতন এলাকায় রবীন্দ্রভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'টেগোর মেমোরিয়াল মিউজিয়াম'। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সংগ্রহবস্তু, পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রাদি ছাড়াও প্রদর্শিত হয়েছে দেশবি .দশ থেকে কবিকে প্রদত্ত নানাবিধ উপঢৌকন। প্রতি বুধবার ছাড়া প্রতিদিন ১০-৩০ মিঃ থেকে ১টা এবং ২ টো থেকে ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকে। মঙ্গলবার অবশ্য বেলা ১টা পর্যন্ত খোলা।

এছাড়া এখানের আর একটি সংগ্রহশালা হল, কলাভবন মিউজিয়াম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও প্রতিমা দেবীর প্রদত্ত দ্রব্যসম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংগ্রহশালা। এঁদের আঁকা নানাবিধ ছবি ছাড়াও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে লোকশিল্পের সামগ্রী, পোড়ামাটি, ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তি এবং নানাবিধ বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, জিয়াগঞ্জে জেলা মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে এবং বহু মূল্যবান পুরাবস্তু সেজন্য সংগৃহীত হয়েছে। তবে সংগ্রহশালা ভবনটি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে এটি যে জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা হিসাবে গড়ে উঠবে সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে বর্তমানে মুর্শিদাবাদে 'হাজার দুয়ারী প্যালেস মিউজিয়ম' যে এ বিষয়ে দর্শক আকর্ষণে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। জাহানকোষা কামান, মুর্শিদকুলী খাঁর স্মৃতি সমন্বিত কাটরা মসজিদ এবং মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত এই ঐতিহাসিক শহর দর্শনে যাঁরা আসেন, তারা এই প্যালেস মিউজিয়ম অতি অবশ্যই দর্শন করেন। এখানে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য দ্রব্যসম্ভার হল অস্ত্রশস্ত্র, মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজ ও পুঁথি পত্র প্রভৃতি।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় দুটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহশালা হল, দিলীপকুমার মৈতের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা (বেঁড়াচাপা) এবং প্রয়াত এম. এ. জব্বার প্রতিষ্ঠিত বালান্দা প্রত্নসংগ্রহশালা (হাড়োয়া), যেখানে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে চন্দ্রকেতুগড় এলাকা থেকে প্রাপ্ত নানাবিধ প্রত্নবস্তু। এছাড়া নৈহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র গবেষণা পরিষদ ও মিউজিয়াম।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় যেসব উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি হল, সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা (বারুইপুর), গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র (কাকদ্বীপ), রামনগর পাঠাগার কালিদাস সংগ্রহশালা (বারুইপুর)। প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা (জয়নগর মজিলপুর), খাঁড়ি ছত্রভোগ সংগ্রহশালা (কাশীনগর), মনসাদ্বীপে (সাগর) রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা, নিমপীঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম সংগ্রহশালা প্রভৃতি।

নদীয়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, যেখানে বিশেষ করে হাতে লেখা পুঁথি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়ে একটি সংগ্রহশালার রূপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, নদীয়ার মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ও অন্যান্য পুরাকীর্তির বিবরণ সম্বলিত একটি সচিত্র পুস্তক 'স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নদীয়া'।

নদীয়া জেলার আর একটি সংগ্রহশালা হ'ল ফুলিয়ায অবস্থিত কৃত্তিবাস সাংস্কৃতিক ভবন তথা সংগ্রহশালা, যেখানে সংগৃহীত হয়েছে বহু সংখ্যক রামায়ণ পুঁথি। এছাড়া, কল্যাণীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় লোকসংস্কৃতি বিভাগীয় সংগ্রহশালা। এবং শান্তিপুরে শান্তিপুর সংগ্রহশালা।

এবার এ রাজ্যের উত্তরাংশের জেলাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা সংগ্রহশালাগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। মালদহ জেলার বিখ্যাত সংগ্রহশালা হল, ইংলিশবাজারে অবস্থিত 'মালদহ মিউজিযাম'। এখানে আছে প্রাচীন গৌড়বঙ্গের নানাবিধ প্রস্তর-ভাস্কর্য, পাঠান ও মোগল আমলের মুদ্রা, আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃতে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও অন্যান্য পুঁথিপত্রাদি— যা গবেষক ও বিদ্যার্থীদের কাছে এক মূল্যবান সম্পদ।

এ জেলার লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক যে দুটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তা একান্তই উল্লেখযোগ্য। অতীতের বরেন্দ্রভূমির শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করতে হলে এখানের বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার সংগ্রহশালা এবং বালুরঘাট কলেজ পরিচালিত সংগ্রহশালায় আসতে হবে। এ দু'টি সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল, পাল-সেন আমলের বহুবিধ প্রস্তর-ভাস্কর্য, মুদ্রা ও টেরাকোটা ফলক। কলেজ মিউজিয়মে সংগৃহীত নয়পালের শিলালেখটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ দুটি সংগ্রহশালা ছাড়াও বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'প্রাচ্য ভারতী'তেও কিছু কিছু মূর্তি ও শিলালিপি সংগৃহীত হয়েছে।

এবার আসছি দার্জিলিং জেলার সংগ্রহশালা প্রসঙ্গে। এখানকার প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহশালাটি হল, শিলিগুড়ির রাজা রামমোহনপুরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা।' এখানে সংগ্রহের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হল প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি, ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, মুদ্রা ও লোকশিল্পের নানাবিধ নিদর্শন প্রভৃতি।

এছাড়া দার্জিলিং শহরে 'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে'র পরিচালিত সংগ্রহশালাটিও একান্ত দর্শনযোগ্য। এখানের সংগৃহীত বস্তুর মধ্যে আছে পর্বাতোরোহণ সংক্রান্ত যাবতীয় বস্তু, সুউচ্চের পাবর্ত্যশিলা ও কীটপতঙ্গের নিদর্শন প্রভৃতি। মঙ্গলবার বাদে ৮-৩০ থেকে ১টা এবং ২টো থেকে ৪-০ পর্যন্ত এই সংগ্রহশালা খোলা থাকে।

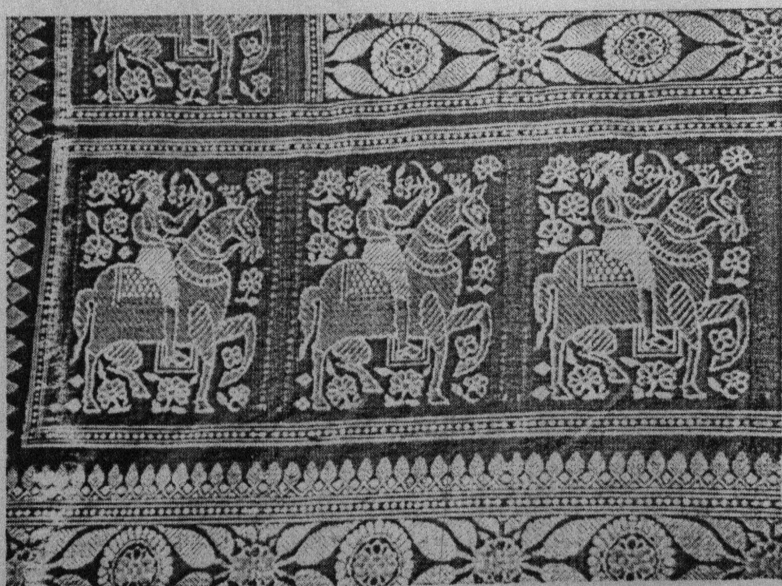
দার্জিলিং-এর আর একটি আকর্ষণ হল, এখানকার 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম'। লয়েড বোটানিক গার্ডেন-এ অবস্থিত এক ভবনে, এই জেলা ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে সংগৃহীত নানাবিধ পাখি ও কীটপতঙ্গের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালা নিয়ে এ পর্যন্ত যা আলোচিত হল তা ছাড়াও, গ্রামে-গঞ্জে ক্লাব-লাইব্রেরিতে স্থানীয় উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় আরও যেসব সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তার বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দেওয়া গেল না। তবে জনশিক্ষার প্রসারে নানাবিধ উপাদান নিয়ে সংগঠিত পশ্চিমবাংলার এইসব ছোটবড় সংগ্রহশালাগুলি শুধু লোকশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেই নয়— সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের এক বড়ো আকর্ষণ হিসাবে যে গড়ে উঠেছে— তা দর্শক সমাজের ব্যাপক উপস্থিতিতেই উপলব্ধি করা যায়। ☐

অনুক্রমণিকা



কাঠখোদাই রাইরাজা ঃ গুরুসদয় মিউজিয়াম



বালুচর শাড়ী ঃ আশুতোষ মিউজিয়াম



কাঠের শুঁড়ো ঃ আশুতোষ মিউজিয়াম



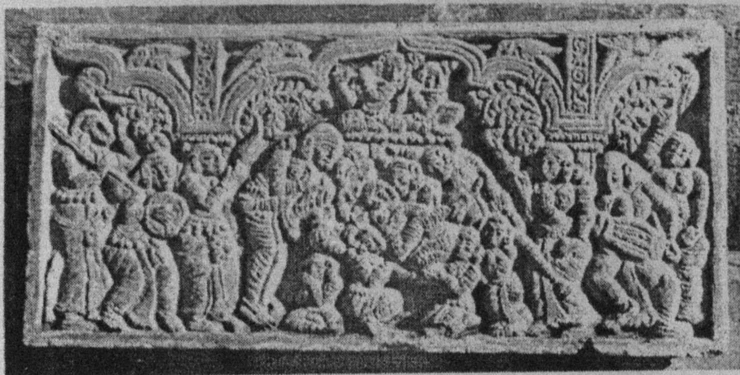
পোড়ামাটির মূর্তি ঃ আশুতোষ মিউজিয়াম



পাথরখোদাই সরস্বতী মূর্তি ঃ আশুতোষ মিউজিয়াম



বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের গায়ে দণ্ডায়মান কবি নজরুল ইসলাম ঃ
যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন



প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ 'নবনারী কুঞ্জর' ঃ যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন



পাথরখোদাই মন্দির লিপি ঃ যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন



পোড়ামাটির ফলকে জৈনমূর্তি ঃ যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন



প্রস্তর খোদাই বিষ্ণুপট্ট ঃ আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা



প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি ঃ আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা



পোড়ামাটির চন্দ্রপুলির ছাঁচ ঃ আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা



নকশী কাঁথা ঃ আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা



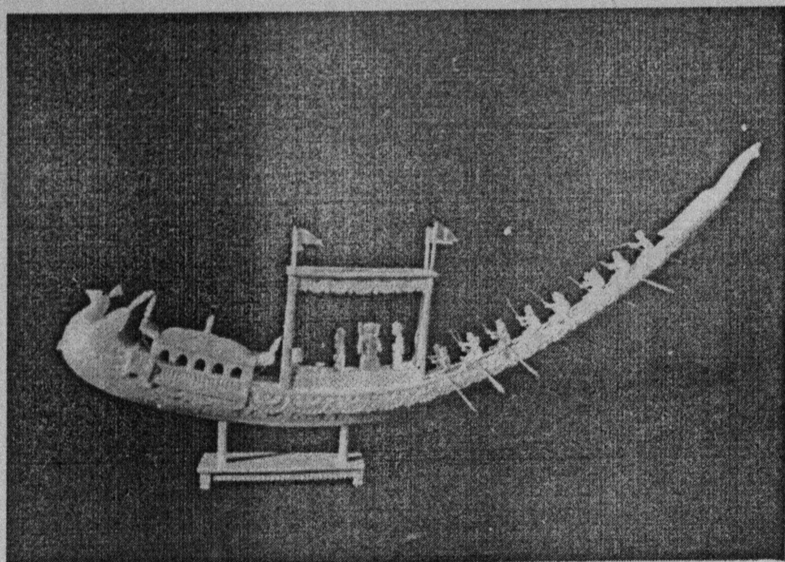
পাথর খোদাই নবগ্রহ ফলকের একাংশ ঃ অমূল্য প্রত্নশালা



কাঠখোদাই দুর্গা মূর্তি ঃ অমূল্য প্রত্নশালা



রথের গায়ে উৎকীর্ণ রঙীন চিত্র ঃ অমূল্য প্রত্নশালা



হাতির দাঁতের উপর খোদাই বজরা ঃ সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা



বালুচর শাড়ীতে উৎকীর্ণ নকশা ঃ সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা



কার্তিকেয় মূর্তি ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সংগ্রহশালা



মারীচি মূর্তি ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সংগ্রহশালা



জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সংগ্রহশালা



প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি ঃ মালদহ জেলা মিউজিয়াম



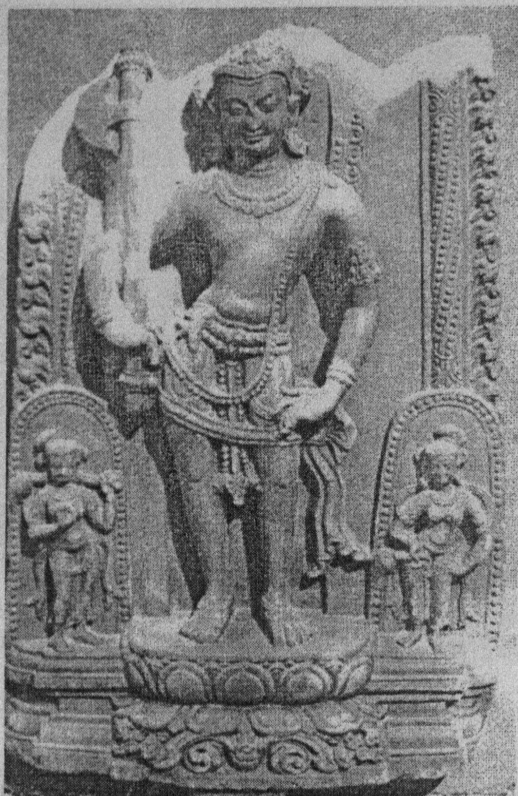
অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ঃ
মালদহ জেলা মিউজিয়াম



মনসা মূর্তি ঃ
মালদহ জেলা মিউজিয়াম



বটুক ভৈরবের প্রস্তর মূর্তি ঃ
বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা



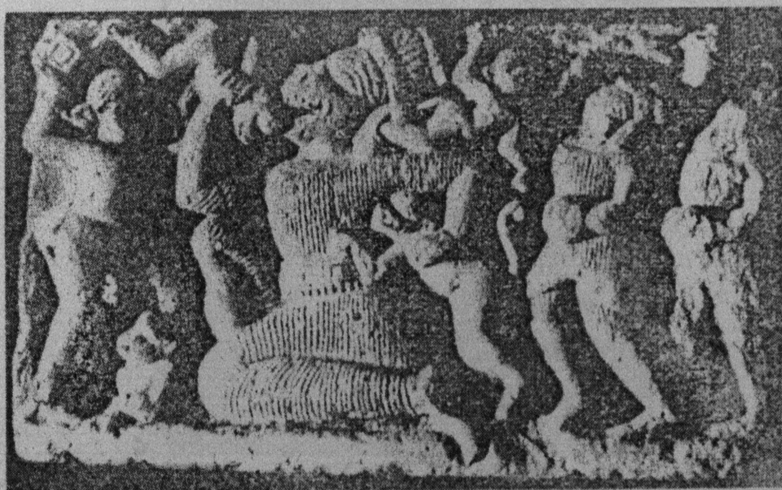
প্রস্তর খোদাই পরশুরাম মূর্তি ঃ
বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা



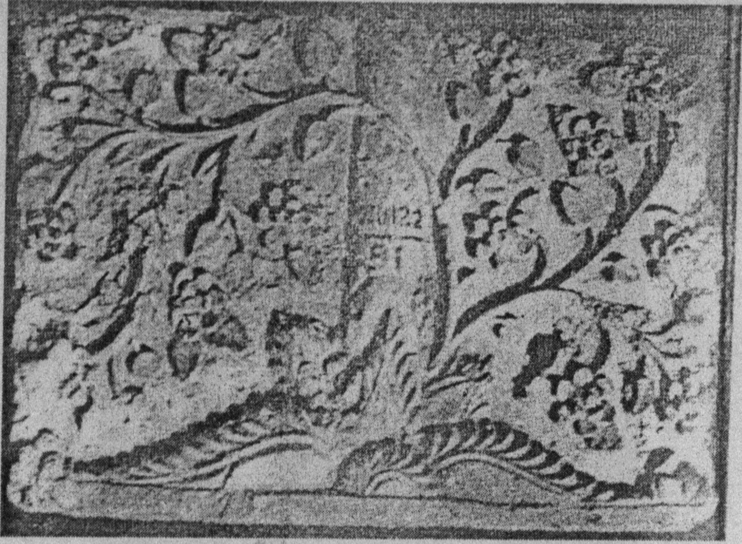
কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ মা ও শিশু ঃ বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়াম



পোড়ামাটির নারীমূর্তি ঃ বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়াম



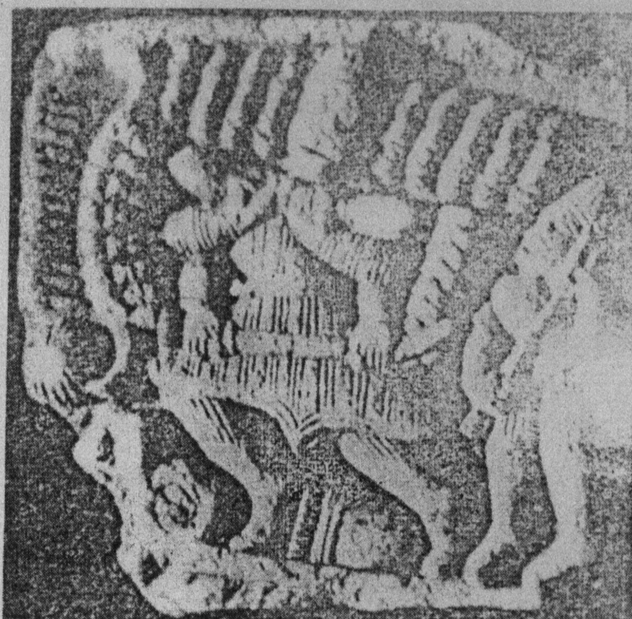
পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রাক্ষস কর্তৃক বানরসেনা ভক্ষনের দৃশ্য ঃ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ



ফুলকারি নকশা সমন্বিত পোড়ামাটির ফলক ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ



মসজিদে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ



পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রাবণ মূর্তি ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ



কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ উমালিঙ্গন মূর্তি ঃ
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা



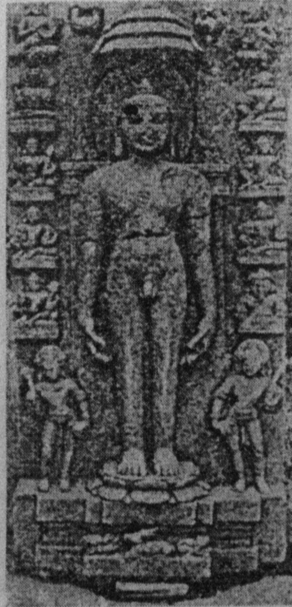
কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ মনসা মূর্তি ঃ
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা



পাথরখোদাই মুণ্ডমূর্তি ঃ পুরুলিয়া জেলা মিউজিয়াম



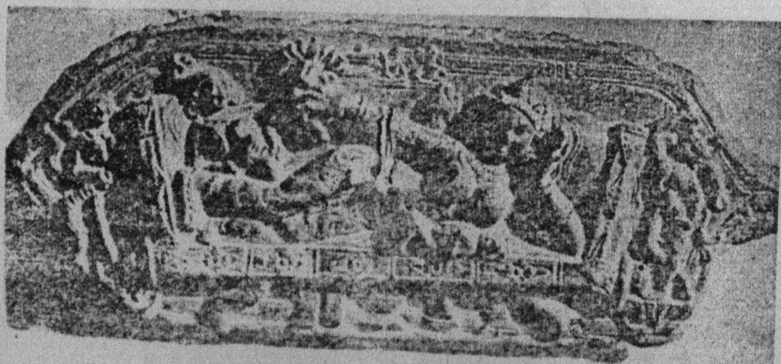
ঋষভনাথ মূর্তি ঃ পুরুলিয়া জেলা মিউজিয়াম



শান্তিনাথ মূর্তি ঃ
পুরুলিয়া জেলা মিউজিয়াম



মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামের সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ



প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ মা ও শিশু ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রবীথি



পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ তবলা বাদিকা ঃ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রবীথি



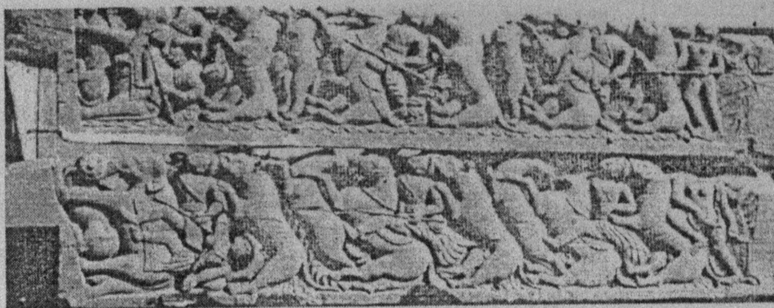
প্রস্তর খোদাই বিষ্ণুমূর্তি ঃ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চিত্রবীথি



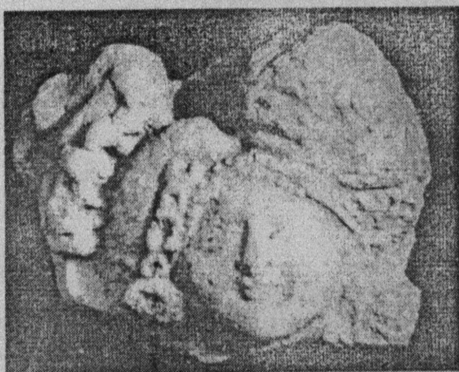
পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ দুই হস্তী আরোহী ঃ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চিত্ররীথি



পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ গুহার চিত্ররূপ ঃ
তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম



রথে ব্যবহৃত কাঠখোদাই ফলক ঃ চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা



পোড়ামাটির ফলকে যক্ষিণী মূর্তি ঃ
চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা



পোড়ামাটির ফলকে যক্ষিণী মূর্তি ঃ
চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা



পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রাক্ষস মূর্তি ঃ
চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা



পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রাক্ষস মূর্তি ঃ
চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা